সংগঠিত শিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পাটশিল্পের সামগ্রিক চিত্র ১৯৮০-২০২০

পি.এইচ.ডি (কলা) উপাধি-র জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্ধর্ভ

গবেষক

বিশ্বরূপ প্রামাণিক

রেজি. নং. : D-7/ISLM/86/16

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ইমনকল্যাণ লাহিড়ী

মানবীবিদ্যা চর্চাকেন্দ্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

CERTIFICATE FROM THE SUPERVISOR/S

This is to certify that the thesis entitled "সংগঠিত শিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পাটশিল্পের সামগ্রিক চিত্র ১৯৮০-২০২০" submitted by Shri/Smt BISWARUP PRAMANIK, who got his/her name registered on ISLM for the award of Ph.D. (Arts.) degree of Jadavpur University is absolutely based upon his/her own work under the supervision of Dr. Imankalyan Lahiri, and that neither his/her thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree/diploma or any other academic award anywhere before.

PROFESSOR
Department of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

1._____
Signature of the Supervisor
and date with Office Seal

2._____
Signature of the Supervisor
and date with Office Seal
(if more than one supervisor)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিকসহ স্নাতক (২০০৮-২০১১) হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণির অধ্যায়নকালে (২০১২-২০১৪) অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী, অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বসু, অধ্যাপিকা সংযুক্তা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শিবাশিস চ্যাটার্জী, অধ্যাপক অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার, অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জি, অধ্যাপিকা কাকলী সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র, অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্তী প্রমুখের কাছে পাঠ-গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁরা একদিকে যেমন আমার জিজ্ঞাসু মনকে তৃপ্ত করেছিলেন, অন্যদিকে বহু নতুন নতুন সমস্যার প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ওই বিদ্যায়তনের 'মানবীবিদ্যা' বিভাগে গবেষণার কাজে যুক্ত হওয়ার পর অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখার্জী, অধ্যাপিকা ঐশিকা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা সুমিতা সেন, অধ্যাপিকা নন্দিতা ধাওয়ান এবং বিশেষ করে অধ্যাপিকা সুমিতা সেন আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ স্যারের হাত দিয়েই আমার গবেষণার অধ্যায় বিভাজন, যা আমার কাজকে বহুগুণ সহজতর করে তুলেছে।

ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ী সকল পর্যায়েই আমার আলোচনা পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত সম্মন্ধে আমাকে অবহিত করেছেন। তার নির্দেশ ও আন্তরিকতা ব্যতীত এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন হতে পারত না।

বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত করার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দীর্ঘদিন ধরে Census Report- এর

বিভিন্ন সিরিজের বিভিন্ন পাঠ, Statistical Handbook, বিভিন্ন সালের "লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল" (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), অন্যান্য নথিপত্র, গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের কাছে আমি ঋণী।

এছাড়াও গবেষণার বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মানববিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগার, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (হুগলী) এবং বিশেষ করে কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মচারী বিশেষ করে নিউজ পেপার সেকশন, মাইক্রোফিল্ম বিভাগের সকল সদস্যের কাছে আমি ঋণী। সমগ্র গবেষণা কার্য তত্ত্বাবধান করেছেন ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ী। আমি ওনার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

এখানে উল্লেখ করতে চাই, শ্রমিক নেতা সম্মানীয় শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী বিশ্বজিৎ মুখার্জী মহাশয়ের সাহায্য ছাড়া আমার এই কাজ সম্পূর্ণ করা সহজ হত না। আমি ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি শ্রী অভিষেক মুখার্জী'দার কাছে।

সর্বোপরি আমার স্নেহের ভাইঝি প্রণীতা ও আমার পরিবারের সকল সদস্য আমার কাজের অনুপ্রেরণা। যাদের আশীর্বাদ ও স্নেহ ছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে এই কাজে ব্রতী হতে পেরেছি, আমার সেই পিতা-মাতাকে শতকোটি প্রণাম।

বিশ্বরূপ প্রামানিক

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	আলাপন	i - ix
প্রথম অধ্যায়:	১. পাট-মজুরের সালতামামি	১০-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়:		৩৬-৭৪
	২.১. পাটশিল্প শ্রমিকদের পরিচিতি সত্ত্বা ও সামাজিক সংহতির ক্ষেত্র	৩৬
	২.২. তিমিরবিনাশী বারে বারে	৪২
	২.৩. ফেরারি ফৌজ: স্থায়ী থেকে অস্থায়ী যাপনের মাঝে পাটশিল্পের মেহনতি	৫৪
তৃতীয় অধ্যায়:		৭৫-১২৩
	৩.১. শ্রম আইন ও পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিক	৭৫
	৩.২. সরকারি কার্যাবলী	১০০
	৩.৩. ট্রেড ইউনিয়ন	১০৫
	৩.৪ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা	১১২

চতুর্থ অধ্যায়:		১২৪-১৮৩
	৪.১. বিশ্বায়ন : পুঁজির সঞ্চয়ন ও নয়া উদারবাদের জয়যাত্রা	১২৪
	৪.২. পরিবেশবান্ধব পাটচাষ ও ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি	১৪০
	৪.৩. প্রসঙ্গ বাংলার পাটশিল্পের শ্রমিক আন্দোলন	১৫৯
পঞ্চম অধ্যায়:	মূল্যায়ন:	১৮৪-২০৭
	পরিশিষ্ট:	২০৮-২৩৭
	গ্রন্থপঞ্জি	২৩৮-২৪৮

সারণী তালিকা

		পৃষ্ঠা
সারণী:-২.১.১	অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০ (পশ্চিমবঙ্গ)	৪৯
সারণী:-২.১.২	অসংগঠিত উৎপাদণী ক্ষেত্র	৫১
সারণী:- ২.১.৩	বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ (পশ্চিমবঙ্গে)	৫২
সারণী:-২.১.৪	অসংগঠিত ক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ)	৫২
সারণী:-২.১.৫	শিশু শ্রমিকের সংখ্যা	৫৩
সারণী:- ২.১.৬	জাতীয় শিশু-শ্রম প্রজেক্টের অনুমোদিত সংখ্যা	৫৩
সারণী:- ২.১.৭	অসংগঠিত ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তায় প্রভিডেন্ট ফান্ড (পশ্চিমবঙ্গ)	৫৪
সারণী- ২.১.৮	মোট জনসংখ্যা ও শ্রমজীবী মানুষ	৬০
সারণী:- ২.১.৯	প্রধান ও প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যা ১৯৯১ ও ২০১১	৬২
সারণী:- ২.১.১০	গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন শ্রমজীবী	৬৩
সারণী:-২.১.১১	জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা ও শ্রমজীবীর পরিসংখ্যান	৬৪
সারণী:- ২.১.১২	দারিদ্রসীমার নীচে জনসংখ্যা ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০	৬৫

সারণী:-২.১.১৩	**কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০**	৬৬
সারণী:- ২.১.১৪	**সংগঠিত শিল্পে কর্মরত মোট শ্রমজীবী ও প্রতিষ্ঠান**	৬৭
সারণী:-২.১.১৫	**বিভিন্ন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী**	৬৮
সারণী:-২.১.১৬	**রেজিষ্টার্ড কারখানার সংখ্যা ও কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা**	৬৯
সারণী:–২.১.১৭	**পশ্চিমবঙ্গে নতুন ও বন্ধ কারখানা**	৭১
সারণী:-২.১.১৮	**শিল্প সংস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান**	৭১
সারণী:- ২.১.১৯	**সারা রাজ্যে কর্ম সংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকরি হয়েছে**	৭২
সারণী:- ২.১.২০	**শিল্পে ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক ২০০০, শতাংশ**	৭২
সারণী:- ৩.১.১	**পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (শতাংশ)**	৮৮
সারণী:- ৩.১.২	**ভারতে নারী শ্রমিক বৃদ্ধির হার**	৮৯
সারণী:- ৩.১.৩	**ভারতের ফ্যাক্টরি, খনি ও বাগিচা শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিক**	৮৯
সারণী:- ৩.১.৪	**ভারতে সংগঠিত শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিক (৩১/০৩/১৯৯৯ পর্যন্ত)**	৯০
সারণী:- ৩.১.৫	**সংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ)**	৯০

সারণী:- ৩.১.৬	অসংগঠিত শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ)	৯১
সারণী:- ৩.১.৭	অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের শ্রেণীবিভাগ (১৯৯৯-২০০০)	৯১
সারণী:- ৩.১.৮	বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ)	৯২
সারণী:- ৩.১.৯	সারা ভারতে এবং পূর্বাঞ্চলে সংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক (হাজার) ৩১/০৩/১৯৯৯	৯৩
সারণী:- ৩.১.১০	পশ্চিমবঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন যে সব নারী	৯৩
সারণী:- ৩.১.১১	রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার নারী (পশ্চিমবঙ্গ)	৯৪
সারণী:- ৩.১.১২	নারীদের সংরক্ষিত আইনি ব্যবস্থা	৯৬-৯৯
সারণী:- ৩.১.১৩	লক আউট-ধর্মঘট-শ্রম বিরোধ	১০৪
সারণী:- ৪.১	লক আউট-ধর্মঘট-শ্রমবিরোধ	১৩৭
সারণী:- ৪.২	ধর্মঘট ও লক আউটে বন্ধ হয়ে থাকা কারখানার সংখ্যা, কর্মহীন শ্রমিক ও নষ্ট শ্রমদিবস ও মোট শ্রম বিরোধ	১৩৮
সারণী:- ৪.৩	ভারতে ক্লোজার ও ছাঁটাই	১৩৯
সারণী:- ৪.৪	পশ্চিমবঙ্গে ছাঁটাই ও লে-অফ	১৩৯

সারণী:- ৪.৫	**পশ্চিমবঙ্গের শ্রম কমিশনারের কাছে মোট যত বিরোধ এসেছিল এবং যতগুলি নিষ্পত্তি হয়েছে**	১৪০
সারণী :- ৫.১	**রাজ্য ভিত্তিক প্রতি পাঁচ বছরের হেক্টর প্রতি উৎপাদিত কাঁচা পাট**	১৮৫
সারণী :- ৫.২	**রাজ্য ভিত্তিক উৎপাদিত কাঁচা পাট ০০/ লাখ বেল**	১৮৭

মানচিত্র ও চিত্র তালিকা

		পৃষ্ঠা নং
মানচিত্র নং ১	হুগলী জেলা মানচিত্র	১৬
মানচিত্র নং ২	**Map Showing the Location of Jute Mills in Bengal**	১৯
মানচিত্র নং ৩	**Map Showing the Location in Hooghly River**	৩২

		পৃষ্ঠা নং
চিত্র নং – ১	পানীয় জলের কল এবং নিকাশী ব্যবস্থা	৩৮
চিত্র নং – ২	শ্রমিক লাইন ভদ্রেশ্বর	৪১
চিত্র নং – ৩	শ্রমিক বাসস্থানের অন্দরমহল	৪৯
চিত্র নং – ৪	কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন	৬০
চিত্র নং – ৫	শ্রমিকদের বসতি এবং পানিয় জলের ব্যবস্থা	১৯২
চিত্র নং – ৬	শ্রমিক বসতির সার্বোজনিন শৌচালয়	১৯৩

সংক্ষেপীকরণ

IJMA:	Indian Jute Mills Association
IDBI:	The Industrial Development Corporation
NSIC:	National Small Industries Corporation
NIDC:	National Industries Development Corporation
SFC:	State Finance Corporation
IFCI:	Industrial Financial Corporation of India
UTI:	Unit Trust of India
IRC:	Industrial Reconstruction Corporation
BCC:	Bengal Chamber of Commerce
SIDC:	State Industrial Development Corporation
IFCL:	Indian Factory Labour Commission
OZ:	Ounce
Ibs:	Pound
CJDA:	Calcutta Jute Dealers Association
CBJA:	Calcutta Baled Jute Association
JBA:	Jute Balers Association
GTA:	Gunny Trades Association
AITUC:	All India Trade Union Congress
INTUC:	Indian National Trade Union Congress
HMS:	Hind Mazdoor Sabha
UTUC:	United Trade Union Congress

CITU:	Center of Indian Trade union
LIC:	Labor Investigation Committee
ICICI:	Industrial Credit and Investment Corporation
SICA:	Sick Industrial Companies Act.
BIFR:	Board For Industrial and Financial Reconstruction
JTCC:	Jute Textile Consultation Council
ESOP:	Employee Stock Ownership Plan
RCMU:	Rashtriya Chatkal Mazdoor Union
JWF:	Jute Workers Federation
FCMU:	Federation of Chatkal Mazdoor Union
JTWU:	Jute Textile Workers Union
BJMWU:	Bengal Jute Mill Workers Union
BPCMU:	Bengal Provincial Chatkal Mazdoor Union
PBCMF:	Paschim Banga Chatkal Mazdoor Federation
AIJTWF:	All India Jute Textile Workers Federation
BJMS:	Bharatiya Jute Mazdoor Sangha
NUJW:	National Union of Jute Workers
BCMU:	Bengal Chatkal Mazdoor Union

আলাপন

শ্রমিক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক জীবন নিয়ে চর্চা এবং অনুসন্ধানের আগ্রহ নতুন ব্যাপার নয়। আমার আলোচ্য বিষয় 'সংগঠিত শিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পাটশিল্পের সামগ্রিক চিত্র ১৯৮০-২০০০'। প্রাচীন ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস করে আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্প গড়ে ওঠে। পুরনো কারিগর ও শিল্পীরা তাদের শিল্প দক্ষতা নিয়ে আর পরবর্তীকালে তাঁরা আধুনিক কারখানায় প্রবেশ করতে পারে নি। অন্যদিকে ওতপ্রোতভাবে কৃষিজীবনের সাথে যুক্ত থেকে যে মানুষেরা আধুনিক কারখানায় প্রবেশ করল তাঁরা কৃষিজীবনের নানাবিধ সমস্যা এবং কুসংস্কারগুলিকে সঙ্গে বহন করেই শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হল। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ক্ষতিকর প্রভাব যেমন ভারতের সমাজজীবনের জাতিভেদ, বর্নভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ এই মানুষেরা আজও পায়নি। এই সবকিছুকেই সঙ্গে বহন করেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণির উত্থান হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এবং প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক ভাবে তথ্য বাজেটের নথীতে, বাৎসরিক রিপোর্টে পাওয়া যায়। রেজিষ্টার্ড সংস্থার ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর রিপোর্টে পাওয়া যায়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোন তথ্য ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায় না বা তথ্য ধারাবাহিক ভাবে কোন আইনি প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হলেও তা রাখা হয় না। এই সমস্যা কতটা তীব্র তার প্রকৃষ্ট প্রমান পাওয়া গেল দুই বছর আগে মহামারীর পর্যায়ে যখন লক্ষ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক কাজ হারিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে আসছিলেন তখন দেখা গেল কেন্দ্র ও রাজ্য কোন সরকারের কাছেই তাঁদের কোন উপযুক্ত তথ্য নেই। ভারতের শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে অসংখ্য মানুষ। সেন্সাস পরিসংখ্যানের হিসেবে সংগঠিত ক্ষেত্রে যেখানে নিযুক্ত আছে ১১ শতাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা ৮৯ শতাংশ যার

মধ্যে আবার একটু বড় সংখ্যা হলো নারী শ্রমিক। নিয়মিত স্থায়ী রোজগারের নিশ্চয়তা ছাড়াই এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত সুবিপুল মানুষ। নারী শ্রমিকদের জীবন-ধারণের জন্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে নানা ধরণের অর্থনৈতিক কাজকর্ম করতে হয়।

প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যের লক্ষ্য ও সম্ভাবনা

মানুষের শ্রমই সভ্যতার চালিকা শক্তি একথা নতুন নয়। সংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা কি পাচ্ছেন তাদের পূর্ণমর্যাদা? পুরুষ শ্রমিকরা যদিও নিজেদের মর্যাদা ও অধিকারের যৎসামান্য আদায় করতে পেরেছেন, নারী শ্রমিকরা কি তা পারছেন? শ্রমিকদের লুঠ হয়ে যাওয়া মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকারের ভগ্ন-অংশটুকু কে রক্ষা করেন? কারাই বা লুঠে নিচ্ছেন শ্রমিকদের মুনাফা? মুনাফা লুঠের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে পারছেন? সংঘবদ্ধ আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণি কবে থেকে শুরু করল? শ্রম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন কারা? এই আন্দোলনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কেমন ছিল? একই সাথে দেখানো হয়েছে এই সময় পর্বে চটকল শিল্পের মূলধন কারা যোগাচ্ছেন? মিলগুলির মালিকরা কারা আছেন? মিলগুলি থেকে কী কী পণ্য দ্রব্য তৈরি হয়? মিলগুলির আধুনিকীকরণের কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? মিলগুলি কী কী সংকটের মধ্যে রয়েছে? বর্তমান শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতি কেমন রয়েছে মিলগুলিতে? মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক কেমন? ট্রেড ইউনিয়নগুলির জঙ্গি আন্দোলন মিলগুলির পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে কিনা, হলে কীভাবে? পাটশিল্পের সংকটের পিছনে শুধুই কি শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, দল, পুঁজি, আধুনিকীকরণের অভাব দায়ী, না পাটের কোনো বিকল্প দ্রব্য এই শিল্পের সংকটকে প্রকট করে তুলেছে তার কারণ খুঁজে বের করা ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন। এই সব

প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগ হয়ে উঠেছে আজকের দিনের গবেষকরা। প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণে যে গবেষণা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে তা বাঙালি পাঠকের কাছে পরিবেশিত হচ্ছে? হচ্ছে-না বলাই যেতে পারে। এই অভাববোধ থেকেই বর্তমান গবেষণার উপস্থাপনা। ছোট ছোট অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে গবেষণা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার মুল উদ্দেশ্য।

পূর্ববর্তী গবেষণা কার্যগুলির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

প্রথমদিকে অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তুলনায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের কাজের অবস্থা, খাদ্য-বাসস্থান ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাই প্রধানত অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখনও ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেনি। এই সময়ে ইতিহাসবিদের গবেষণাগুলির মধ্যে 'Slavery in British Dominion' লিখেছেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি। 'Plantation Labour in India' এবং 'Labour Movement in India' নিয়ে গবেষণা করেছেন রজনীকান্ত দাস। এই গবেষণাগুলি কুড়ির দশকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সত্তরের দশকে প্রকাশিত সুকোমল সেনের 'Working Class of India (1977) এবং ড. পঞ্চানন সাহার 'History of Working Class of Bengal' (1978)। এছাড়াও রজনীপাম দত্তের 'India Today' প্রথম প্রকাশ : 1940 এবং (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ 1947) গবেষণাটিতে শ্রমিক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সংগ্রাম সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি হল এ সম্পর্কে প্রথম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। 'The Indian Working Class' (1951) গবেষণাটি এই ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন রাধাকমল মুখার্জি। 'A Scio-Economic Survey of Jute Labour' (কলকাতা ১৯৫২) সালে প্রকাশিত কে. পি চট্টোপাধ্যায়ের

অবদান বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'ট্রেড ইন রিয়াল ওয়েজ ইন দ্য জুট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ ফর্ম ১৯৫১' কে. এম মুখার্জির অবদান অনস্বীকার্য।

দীপেশ চক্রবর্তী তার মূল্যবান গবেষণায় 'Rethingking Working Class History : 1890-1940' বইটিতে শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা এবং সামর্থ্য নিয়েই বহু মূল্যবান প্রসঙ্গের আলোচনা তুলেছেন। তিনি তার গবেষণার নামের মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণির ও শ্রমজীবীদের নিয়ে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে Rethingking অথবা পুনর্ভাবনার কথা তুলেছেন।

এছাড়া অমিয়কুমার বাগচীর 'Private Investment in India : 1900-1939' (1972) গবেষণাটির শ্রমিক সম্পর্কিত পঞ্চম অধ্যায়ে; শশীভূষণ উপাধ্যায়ের 'Cotton Mill Workers in Bombay' (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ২৮ শে জুলাই ১৯৯০); রাধা কুমারের 'City Lives : Worker's Housing & Rent in Bombay' (25 july 1987); শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং সুরঞ্জন দাস (সম্পাদিত) 'Caste and Communal Politics in South Asia' (কলকাতা ১৯৯৩); পরিমল ঘোষের 'Communalism and Colonial Labour : experience of Calcutta Jute Mill Workers : 1880-1930' (কলকাতা ১৯৯০) অথবা সুমিত সরকারের 'Modern India 1885-1947' (১৯৮৩); নির্বান বসুর 'The Working Class Movement' (কলকাতা ১৯৯৪); অমল দাসের 'Urban Politics in an Industrial Area (Aspects of Municipal and Labour Politics in Howrah – West Bengal 1850-1920' (কলকাতা ২৫ মে ১৯৯৪) শ্রমিক শ্রেণির চর্চার ক্ষেত্রে আরও একটা মূল্যবান সংযোজন। এছাড়াও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী' (কলকাতা

– ১৯৮৪) গ্রন্থটিতে রয়েছে বাংলা তথা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম নেত্রীর জীবন ও কর্মের কথা। ইতিহাস সংসদের বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে পেশ করা একাধিক প্রবন্ধেও বাংলাভাষায় শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন দিক তুলে ধরা হয়েছে। যা আমরা ইতিহাস অনুসন্ধান নামক বইটি থেকে পেয়ে থাকি। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, শ্রমিক আন্দোলনের সামগ্রিক আলোচনা আমার গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। আমার আলোচ্য বিষয় পাটশিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবনের বর্তমান অবস্থার কারণগুলি অনুসন্ধান করা। তার প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন যেমন আমার আলোচনার বাইরে নয়; আবার আমি এ-ও দেখাতে চেষ্টা করব যে, এই সময় পর্বে পাটশিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের বস্তুকেন্দ্রিক সমস্যাগুলো যেমন- বেতন ও ভাতা, বাসস্থান, খাদ্য, কাজের সময় ও পরিবেশ, তাদের মানসিক জগৎ, শিক্ষা, অবকাশ বিনোদন, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়বোধ, পারিবারিক জীবন, তাদের পারিপার্শ্ব ও পরিবেশ এবং শ্রমিক সংঘ বা মহল্লা গুলির অবস্থান, যা আজ সমাজ বিজ্ঞানীরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিবিধ গবেষণা কার্যাবলী অসম্পূর্ণতা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর অর্থাৎ বিগত ৭৩ বছরেরও বেশি সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা থাকলেও বিশ্বায়নের পর এই সময়ের কোন সামগ্রিক বিবরণ এখনও অনুপস্থিত। বিশেষত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি, রেল, ব্যাংক, বিমা ও সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীরা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে শুরু করলেও এই সব নিয়ে অনেক গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে। আর বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের দিনমজুর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, দোকান

কর্মচারী, গৃহভৃত্য, নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, ঝাড়ুদার প্রভৃতি এখনও অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টির বাইরে। নারী শ্রমিক কর্মচারীরাও বিশেষ ও পৃথক আলোচনার দাবি রাখেন। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধে সর্বোচ্চ স্তরের মহিলা নেত্রীদের যাদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ-তাদের কথা আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে অল্প কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে একেবারে তৃণমূল স্তরের নারীশ্রমিকের কথা। যেমন- সুমিতা সেনের লেখায় বাংলার চটকলের নারীশ্রমিকদের বৃত্তান্ত (উইমেন ওয়াকার্স ইন দ্য বেঙ্গল জুট ইন্ডাস্ট্রি ১৮৯০-১৯৪০ : মাইগ্রেশন, মাদারহুড অ্যান্ড মিলিটেন্সী) কেমব্রিজ, ১৯৯৯ এবং রাখি রায়চৌধুরীর লেখায় 'বাংলা বিহারের মেয়ে খনি শ্রমিকের কাহিনী' (জেন্ডার অ্যান্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া: দি কামিন্স অব ইস্টার্ন কোল মাইন্স ১৯০০-১৯৪০) কলকাতা, ১৯৯৬। অন্যান্যদের লেখাগুলির মধ্যেও অধিকাংশ ঝোঁক ছিল মূলত মুখ্যত দুটো দিকের ওপর। তাদের একটি হল প্রধানত শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিবর্তনের অন্য পর্যায়ের কালানুক্রমিক বিবরণ। আর একটি দিক ছিল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ইতিবৃত্ত।

কাজেই 'শ্রমিক'কে প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে শুধুমাত্র জঙ্গি আন্দোলনের মুহূর্তগুলিই যথেষ্ট নয়, শ্রমিক চর্চা করতে হবে সামগ্রিকভাবে তাদের উদ্ভব, নতুন শিল্পজীবনে প্রবেশ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তুকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি নিয়ে। তবে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে লেখা-লেখি হলেও শ্রমিকরা পশ্চিমবঙ্গে যে 'বৃহৎ শিল্প' পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে সম্পর্কে নির্বাণ বসু 'The Working class movement', অমল দাসের 'Urban politics in an Industrial area : Aspects of municipal and labour politics in Howrah West Bengal

1850-1920' এবং অর্জন ডি হান (Arjan De Haan)-এর 'Unsettled Settlers' গ্রন্থে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে চটকলের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস থাকলেও, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার পর এই শিল্পের অবক্ষয়ের সামগ্রিক আলোচনা অনুপস্থিত। এই অভাববোধ থেকেই বর্তমান গবেষণার উপস্থাপনা।

প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যের অধ্যায় বিভাজন

গবেষণাকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায় - পাট-মজুরের সালতামামি আলোচনা করতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যে নতুন শিল্পনীতি নেওয়া হয়েছে তার ফলে পাটের উৎপাদন বাড়া বা কমার উপরে সরাসরি বাংলার শ্রমিকদের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। নারীশ্রমিকের বর্তমান অবস্থা, পাটকলের কাজ থেকে তাদের কমে যাওয়ার ইতিহাস এবং তৃণমূল স্তরের শ্রমিকদের নানা যন্ত্রনার তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট, নিরন্তর আপসহীন সংগ্রাম, বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - পাটকল শ্রমিকদের পরিচিতি সত্ত্বা ও সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রগুলিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তিমিরবিনাশী বারে বারে, ফেরারি ফৌজ: স্থায়ী থেকে অস্থায়ী যাপনের মাঝে জুটমিলের মেহনতি, পাটশিল্পের শ্রমিকদের অসংগঠিত করন এবং এই ৪০ বছরের উত্থান পত্তন উপ-অধ্যায়ের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় - শ্রম আইন ও পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিক, সরকারি কার্যাবলীর বিবরণ, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ও ট্রেড ইউনিয়নে গিয়ে আলোচনার গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছে। নারীশ্রমিকের আইনি অধিকার, বিবিধ বছরের অনুপাত এবং সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বিস্তারিত আলোচনা উঠে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায় – বিশ্বায়ন-পুঁজির সঞ্চয়ন ও নয়া উদারবাদের জয়যাত্রা বাংলার পাটশিল্পের ওপর যে প্রভাব ফেলেছে এবং নতুন শিল্পনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বায়নের সূচনা পর্যায় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 'Joseph Stiglitz' -এর সুবিখ্যাত রচনা 'Globalisation and Its Discontents' গ্রন্থটির প্রসঙ্গ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবেশবান্ধব পাটচাষ ও ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বাংলার পাটশিল্পে শ্রমিক আন্দোলন আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় - সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান খোঁজার পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের মান, অবসর, আনন্দ, খোশগল্প ও এককথায় শ্রমিক মননে সংস্কৃতির প্রশ্নটি উঠে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রে। বর্তমান নতুন সরকার বাংলায় শাসন ক্ষমতা নেওয়ার পর পাটশিল্পকে নতুন উদ্যোগের সাথে যে পদক্ষেপ নিয়েছে গুরুত্ব পেয়েছে সে আলোচনাও।

গবেষণাকার্যের পদ্ধতি

গবেষণাকার্যের পদ্ধতি হিসেবে ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্র নিয়ে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে এই গবেষণাকার্যের তথ্যানুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে প্রাইমারি উৎস হিসেবে Census Report, Statistical Handbook, Gazette, Archival Report, বিভিন্ন সময়ের পত্র-পত্রিকা,

এছাড়া সংবাদপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শিক্ষক মহাশয়, সহকর্মী এবং হুগলী জেলার গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বর চটকল শ্রমিকদের মৌখিক সাক্ষাৎকার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ইংরেজি এবং বাংলাভাষায় রচিত বিবিধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বসূরি গবেষক ও লেখকবৃন্দের আলোচনা পদ্ধতি আমাকে অংশত সাহায্য করলেও, পথ নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহন করেছেন অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকারা।

প্রথম অধ্যায়

১. পাট-মজুরের সালতামামি

স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বাংলায় পাটশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যা দশকের পর দশক জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানকে একসময় সুনিশ্চিত করেছিল পরিবেশবান্ধব হিসেবে পাটের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না এবং সেজন্যই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতবর্ষ ছাড়াও নেপাল, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ-মায়ানমার সহ বিভিন্ন দেশে এই শিল্পের বিস্তার ঘটে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীব্যাপী পাটশিল্পের সাথে যুক্ত আনুমানিক প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে প্রত্যক্ষ শ্রমিক ছাড়াও রয়েছেন পাটচাষি এবং জুট কেন্দ্রিক অনুসারী শিল্পের সাথে যুক্ত থাকা অসংখ্য মানুষ। ভারতবর্ষ পাটজাত দ্রব্যের সারা দুনিয়া জুড়ে সর্ববৃহৎ উৎপাদক। ৭০% উৎপাদন এই উপমহাদেশেরই ফসল।[১]

১৯৯৬ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষের জুটমিলের সংখ্যা ৯৯টি যার মধ্যে ৫৯টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। জুট কমিশনারেটের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন থেকেছে বার্ষিক প্রায় ১৫৪৬.৮২ হাজার মেট্রিকটন। রপ্তানি বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। ২০১৪-২০১৫ সালে পাটশিল্পকে কেন্দ্র করে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮১৩.৮ কোটি টাকা।[২] আন্তর্জাতিক বাজারের পতন সত্ত্বেও চটশিল্প তার ধারাবাহিকতা রেখেছে মূলত অভ্যন্তরীণ বাজারকে কেন্দ্র করে। যদিও এই অভ্যন্তরীণ বাজারের বৃদ্ধিতে সরকারের দাক্ষিণ্য অনেকটাই। ১৯৪৯-১৯৫০-এ পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল ১০%। নব্বইয়ের দশকে এই পরিমাণ পৌঁছায় ৮৬.২৭ শতাংশ। পরিমাণের দিক থেকে ১৯৪৮-এ অভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল ১,৩১,০০০ টন। ১৯৯৭-১৯৯৮-তে এর পরিমাণ বেড়ে

হয়েছে ১,৩,৮৭,০০০ টন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় দেশের শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের প্রসারণ ও প্যাকেজিং আইটেম হিসেবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ বাজারের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সরকার। এফ.সি.আই. কেনে 'বিটুইন' ব্যাগ, 'পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ' কেনে 'জুট টোয়াইন' ও অন্যান্য ব্যাগ। একসময়ে 'ফার্টিলাইজার অফ সিমেন্ট' শিল্প অনেক জুট ব্যাগ কিনত। কিন্তু এখন তার পরিমাণ দ্রুত কমছে।[৩]

সস্তাশ্রম এবং সুলভ কাঁচামালের সূত্রে ব্রিটিশরাই মূলত ১৯৪৭ এর পূর্ব পর্যন্ত পাটশিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল। কলকাতার অদূরে রিষড়াতে ভারতবর্ষের প্রথম জুটমিল স্থাপিত হয়। কোনো ধরনের শ্রম আইন এবং সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত না থাকায় পাটশিল্প এক দ্রুত লাভজনক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৪ সালে পাটশিল্পের মালিকরা পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ও নিজেদের সংগঠিত করার মাধ্যম হিসেবে 'ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলে। এই সংগঠনই ১৯০২ সালে ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৩১ সালে ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট এর মাধ্যমে তা নথিবদ্ধ হয়। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ মালিকানাধীন পাটশিল্পের হস্তান্তর ঘটে এবং মূলত ভারতীয়রা এই শিল্প উদ্যোগ এর সাথে যুক্ত হয়।[৪] মূলত দুটি কারণ এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রথমত: যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সূত্রে মুনাফা, দুর্নীতি ও মজুতদারির মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: ব্রিটিশ অর্থনীতি ও ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের অনিশ্চয়তা এই শিল্পে ভারতীয়দের প্রবেশকে সুগম করে। যদিও এরা কেউই স্বাধীন শিল্পপতি ছিলেন না, ছিলেন পাট ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের ভাগ্যান্বেষী ও মধ্যস্বত্বভোগী অতি দ্রুত লাভের ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে যারা

পাটশিল্পকে দেখতে শুরু করে। পাটশিল্পে শ্রমিক সংখ্যার ক্রমাবনতির সূচনা পর্যায় এই সময়ই। বঙ্গ বিভাজনের ফলশ্রুতিতে বিপুল পরিমাণে পাট চাষের এলাকা পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ায় এক বড় সঙ্কট সামনে এল।

পাটশিল্প স্থাপনের একেবারে শুরুর পর্যায়ে বাঙালি শ্রমিকদের আধিক্য থাকলেও শিল্প সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে ভিড় করতে লাগলেন তারা যারা বেশিরভাগই মূলত বিহার উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত; গ্রামে যাদের একখণ্ড জমি রয়েছে এবং একইসাথে কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত ও উদ্বৃত্ত না হওয়ায় বাধ্য হয়ে যারা যোগ দিয়েছিলেন পাটশিল্পে। ১৯২৯ সালের যে হিসেবে আমরা পাই তাতে দেখা যায় মোট শ্রমিকের ২৪ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ, ৩৩ শতাংশ বিহার, ২৩ শতাংশ উত্তরপ্রদেশ, ১০ শতাংশ উড়িষ্যা, ৪ শতাংশ তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ ৩.৩ শতাংশ; অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছেন। সত্তরের দশক পর্যন্ত যে হিসাব দেখা যায় তাতে এই শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। বর্তমানে যদিও পাটশিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা এক হাজারেরও কম।[৫]

ঔপনিবেশিক বাংলায় চটকল শ্রমিকদের নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। "Rethinking Working class History : Bengal 1890 - 1940" (১৯৮৯সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে দীপেশ চক্রবর্তী কার্যত সামাজিক ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন মূলত দুটি প্রশ্নকে সামনে রেখে। প্রথমত: পাটশিল্পে জঙ্গী আন্দোলনের ঐতিহ্য সত্ত্বেও ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন এত দুর্বল থেকে গেল কেন? এবং দ্বিতীয়ত: শ্রমিক সংগঠনে বহিরাগতদের প্রভাব কেন ক্রমান্বয়ে স্থায়ী হল? এই প্রশ্নগুলি আপাত অভিনব না হলেও অধ্যাপক চক্রবর্তী তার গবেষণায় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন গভীরে গিয়ে। তুলে ধরেছেন চটকল শ্রমিকদের 'সংস্কৃতি' ও 'চৈতন্য'

এর প্রসঙ্গ। চটকল নেতাদের উচ্চ সামাজিক পটভূমি, ধবধবে পোশাক, গাড়ি থেকে নামা, নিখুঁত ইংরেজি অবলীলায় বলতে পারা সাহেব মিল মালিক বা ম্যানেজারের সাথে সমান তালে কথা চালানো থেকে তার ব্যক্তিগত জীবনের ত্যাগ স্বীকারের নানা গল্প সবকিছুই শ্রমিকদের কাছে এই নেতাদের যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলতো তা সংগঠন ছাড়িয়ে কিভাবে এক অন্য আনুগত্যের জন্ম দিয়েছিল, উঠে এসেছে সে আলোচনা; যুগিয়েছে নতুন চিন্তার খোরাক।[৬]

কলকাতার চটকল শ্রমিকদের উপর তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেন পরিমল ঘোষ। কলকাতার চট শ্রমিকদের ইতিহাস যে আসলে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর বিবর্তনের ইতিহাসেরই প্রতিচ্ছবি, যাকে কোনও বাঁধাধরা তাত্ত্বিক কাঠামোয় মুড়ে ফেলা যায় না, সে কথাই ফুটে উঠেছে "*Colonialism, Class and History of the Calcutta Jute Millhands 1880-1930*" (২০০০সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে। তাঁর মতে ইউরোপের মতো আলাদা একটি শ্রেণী হিসেবে নয় ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝতে গেলে আমাদের গ্রামীণ ভারতের কৃষি-কাঠামোতে ফিরে যেতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে কিভাবে ক্ষুদ্র কৃষক আর ভাগচাষী জমি হারিয়ে মজুরে পরিণত হয়েছিল এবং অনেকেই অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে ক্ষেত মজুরের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল চটকলে।[৭] আমাদের কি মনে পড়ে যাচ্ছে শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পের আমিনার হাত ধরে ফুলবেড়ের পথে পাড়ি দেওয়া গফুর জোলার কথা?

আশির দশকে বাংলার চটশিল্পের মালিকরা খুব ভেবেচিন্তে যৌথভাবে একটা কৌশল নিয়েছিল। 'জুটমিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এরই কৌশল ছিল সেটা। কৌশলটা এক কথায় ছিল রোটেশনাল লকআউট বা আজ এখানে তো কাল সেখানে লক আউট। সংগঠিত মালিক শ্রেণী 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে সমগ্র চটশিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের

জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল এই কৌশলে। বছরের সবসময়ই একটা দুটো চটকল বন্ধই থাকতো। আবার সেগুলো খুলে গেলে আরও একটা দুটো বন্ধ হতো। লকআউট হবার পরের মুহূর্ত থেকেই মালিকদের পেটোয়া দালালরা আর মান্যতা প্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতারা (বলা ভালো ঝানু মিডলম্যানরা) সমস্বরে একটা বাতাবরণ তৈরি করত যে কারখানায় লোকসান হচ্ছে, কিছু লোক না কমলে মালিক আর কারখানা খুলবে না। সব শ্রমিকেরই পেটে লাথি মারা হবে। শেষ পর্যন্ত প্রচুর স্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাই বা স্বেচ্ছা-অবসর আর অবশিষ্ট শ্রমিকদের দিয়ে একেক জনকে একটার জায়গায় দুটো বা দুটোর বদলে চারটে মেশিন একসঙ্গে চালানোর চুক্তি করে কারখানা খুলত। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা পরবর্তী মালিক তৈরি হত তার কারখানা বন্ধ করার জন্য। কয়েক বছরের মধ্যেই এর ফলে গোটা চটশিল্পেই একটা বাতাবরণ তৈরি হয়ে গেল, যে কোনও কারখানা যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হল। মালিকদের দালালরা গুজবও ছড়ালো বিস্তর। শুরু হল শ্রমিক বিরোধী কালা চুক্তির হিড়িক। এমনকি সমগ্র মিলের জন্য করা ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকেও পাশ কাটিয়ে এক একটা কারখানায় আলাদা আলাদা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার হিড়িক পড়ে গেল।

বিশ্ব অর্থনীতিতে সেটা ছিল ‘রিগানোমিকস’ আর ‘থ্যাচারিজিম’-এর যুগ। সত্তরের দশক থেকেই বিশ্ব অর্থনীতিতে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল। সংকট এসেছিল, কিন্তু মালিকদের মুনাফায় টান পড়েনি। মালিকরা সংকটের বোঝাটা শ্রমিক আর শ্রমজীবী মানুষের জীবনে চালান করে দিতে পারছিলো। আশির দশক ছিল তারই যুগ। বিশ্বজুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো পুঁজিপতি কোম্পানিগুলো আরও উন্নত প্রযুক্তি আনলে শিল্পে। লোক ছাঁটাই হল, আর কাজের বোঝা বাড়ল। আনুষঙ্গিক আর অনুসারী কাজগুলো প্রথমে অস্থায়ী শ্রমিক, স্বনিয়োজিত সংস্থা, ঘরে বসে কাজ করা

শ্রমজীবী মানুষ আর কম মজুরির নারী শ্রমিকদের ভাগে পড়লো, আর তারও পরে সেগুলো চালান করা হল দেশের বাইরে, আমাদের মত গরীব দেশে। আমেরিকায় যেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন অনেক দুর্বল সেখানে শ্রমিকদের এই সমস্যায় কাজের কাজ কিছু করতে ব্যর্থ হয়ে ইউনিয়নগুলো অনেকটাই পাততাড়ি গোটালো আর ইউরোপে যেখানে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের বয়স অনেক পুরনো সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের মোকাবিলা করে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়নকে মধ্যস্থ রেখেই চলল এ কাহিনী। বিশ্বায়নের জন্য জমি তৈরির সময় ছিল সেটা।

আবার দেশে ফিরে আসা যাক। চটশিল্পে একদিকে স্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক কমে গেল আর তার পাশাপাশি বেড়ে চলল অস্থায়ী, ক্যাজুয়াল আর বদলি শ্রমিক। স্থায়ী আর অস্থায়ী শ্রমিকের অনুপাত রীতিমতো বদলে গেল। স্থায়ী শ্রমিকের ভাগ কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকের গুরুত্ব আর অনিবার্যতাও অনেক কমে গেল। এবার শুরু হল অর্জিত অধিকার একটা একটা করে কেড়ে নেওয়ার অধ্যায়। পি.এফ-এর জমা টাকা, অবসর-কালীন গ্র্যাচুইটি, ই.এস.আই. আইন অনুযায়ী মালিকপক্ষের দেওয়া টাকা একতরফা ভাবে মালিকদের পক্ষ থেকে এসব বকেয়া ফেলে রাখার ঘটনা আস্তে আস্তে আম রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো। সরকারে থাকা দল, দলীয় ইউনিয়ন, বিশেষ করে সিটু আর তাদের নেতাদের ভাগে ফি-কমিশন চাঁদার খাতে অবশ্য জমা পড়তে থাকল নিয়মিত।

বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিক কর্মচারীদের সামগ্রিক গঠনের চিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো, আশির দশকেই যার লক্ষণগুলো দেখতে পাওয়া গেছে। চূড়ায় থেকেছে তথ্যপ্রযুক্তির মতো অভিজাত শ্রমিকদের একটা ছোট্ট অংশ, যা নৈবেদ্য-এর উপরে কলার মত, যাদের বেতন আর ভোগবিলাস সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের থেকে সম্পূর্ণ

আলাদা। সত্যিকারের শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হবে কম, আর অস্থায়ী ক্যাজুয়াল ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা হবে অনেক অনেক বেশী। এছাড়াও তাদের চারপাশে থাকবে শ্রমজীবী জনতার এক বিশাল বেষ্টনী, যারা জঘন্য শর্তে স্বনিযুক্ত ভাবে বা ক্ষুদ্র শিল্পে অথবা নিজেদের ঘরে বসে সংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পের আনুষঙ্গিক কাজগুলো করবে।

হুগলী জেলা মানচিত্র - ১

Hooghly District Map

বর্তমানে গোটা রাজ্যে পিএফ গ্র্যাচুইটি বাবদ মিল মালিকদের বকেয়া ৪৫০ কোটি টাকা।[৮] এটি যেমন একদিকের চিত্র তেমনিই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে যে এলাকাকে আমি বেছে নিয়েছি সেই শিল্পাঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা গোন্দলপাড়া জুটমিল। এখানে একসময় স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে ছিল ৫০০০, আজ সেখানে নথিবদ্ধ স্থায়ী শ্রমিক মাত্র ৯৬ জন।[৯] স্পেশাল বদলি, ভাগাওয়ালা, জিরো

নাম্বার, ভাউচার শ্রমিক, ট্রেনি ও কন্টাক্ট লেবার সহ অসংগঠিত শ্রমিকের যে সুবিপুল জাল এই কারখানায় ছড়িয়ে আছে তা সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যে পাট শিল্পের বর্তমান চিত্র। নিরন্তর কাজের বোঝা বাড়িয়ে শ্রমিকের শ্রম চুরি করে একে একে অর্জিত অধিকার ধারাবাহিকভাবে বদল করার যে রেওয়াজ ইতিমধ্যে চালু ছিল তাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য এসেছে নতুন শ্রম আইন। গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলার অন্যতম সোনালী শিল্প পাটশিল্প যা কয়লাখনি ইস্পাত ইত্যাদির মতো সংগঠিত শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই শিল্পের সংগঠিত শ্রমিকদের পরিমাণ পরিকল্পিতভাবে হ্রাস করে অসংগঠিত শ্রমিকদের কিভাবে আইনী ও বে-আইনী বৈধতা দেওয়া হয়েছে তাই এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

পাটশিল্পের ইতিহাস ও জুটশ্রমিকদের আন্দোলনকে মোটামুটি ভাবে কতগুলি কাল পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়- ১৮৫০-৫৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ যে পর্যায়ে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে একের পর এক পাটকল গড়ে উঠতে থাকে এবং মূলত চারটি ক্লাস্টার এলাকা, হুগলি নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চল, হাওড়া এলাকা এবং বজবজ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে জুটশিল্প বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ উদ্যোগপতিদের পাশাপাশি বেশকিছু স্থানীয় জমিদার ও পৃষ্ঠপোষকরাও জুটশিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন। যেমন রিষড়ায় স্থাপিত প্রথম পাটকল স্থাপনে অর্থানুকূল্য ছিল শ্রী বিশ্বম্ভর সেন মহাশয়ের। দ্বিতীয় পর্যায় মূলত ১৯০০-১৯৪৭ এর পর্যায়।[১০] এই পর্যায়ে ও দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের কারণে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিরন্ন অসহায় ভাগচাষী বা প্রান্তিক কৃষক সব হারিয়ে শেষ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল এই শিল্পে শ্রম বিক্রির পেশা। এই পর্যায় হল সেই পর্যায় যে সময় জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ শ্রমিকশ্রেণীকে স্পর্শ করে। তার উত্তাপ এসে পড়ে পাটকলে। ট্রেড

ইউনিয়নের চেতনা তৈরি হয় এবং সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জুটশ্রমিক। তৃতীয় পর্যায় ১৯৪৭-১৯৮০ এর দশক যে সময়ে স্থায়ী চাকরি ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাবোধ জারিত হয় প্রায় সমস্ত সংগঠিত শিল্পে এবং একইসাথে এই পর্যায়ে অন্যান্য শিল্পের মত জুটশিল্পও জঙ্গী অর্থনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রাখে। চতুর্থ পর্যায় বিশ্বায়নের যুগ। যে পর্যায়ে চাকুরীর নিরাপত্তা আর নিশ্চিত বেতন পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করছে আর অন্যদিকে বেড়ে চলেছে ঠিকা অসংগঠিত মজুরের সংখ্যা। তাদের সংগ্রহ করা হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের মাধ্যমে বা গ্রাম থেকে গ্রামীণ যোগাযোগ অথবা জাতপাতের সূত্র ধরে যেমন অতীতে মালিকদের আমলে কয়লা খনিতে ছিল গোরখপুরিয়া শ্রমিক। সবচেয়ে বড়কথা জুট শিল্পে সংগঠিত শ্রমিকদের শুধুই সংখ্যা কমেছে তাই নয়, এই শিল্পে তাঁদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে এবং সংগঠিত শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের পক্ষে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার্যকরী আঘাত হানার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। এক বিপুল বেকার মজুত বাহিনী যা নিরন্তর জুটশিল্পে খন্ডে খণ্ডে বিভক্ত অসংগঠিত শ্রমিক সরবরাহ করে চলেছে তা শুধুমাত্র হুগলী শিল্পাঞ্চল নয় সমগ্র রাজ্যেই আজ সাধারণ চেহারা।[১১]

লক্ষণীয় বিষয় হল বড় শিল্পপতি ও পুঁজির মালিকদের প্রায় কেউই জুটমিলে লগ্নি করেনি। মূলত: বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ছাড়া! এর প্রধান কারণ প্রথমত: পাটশিল্প শ্রমনিবিড় শিল্প এবং তাছাড়া মালিকানা সম্পর্কিত জটিলতা দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহার অন্যতম প্রধান কারণ। বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে মূলধন নিবিড় প্রায় প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যেখানে বিপুল যান্ত্রিকীকরণ ও উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে সেখানে বেশির ভাগ পাটকল চলছে আবহমান কালের প্রযুক্তিকে সঙ্গী করেই।

মানচিত্র - ২[১২]

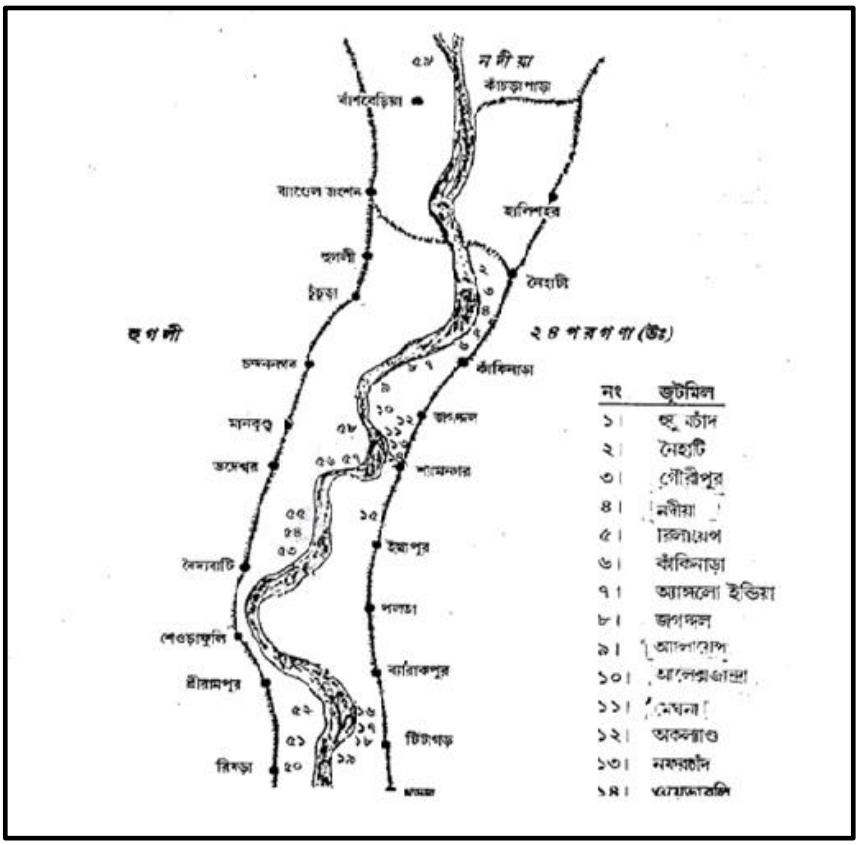

Map Showing the Location of Jute Mills in Bengal

দীপেশ চক্রবর্তী-র লেখায় যে সর্দারদের উল্লেখ আমরা পাই তাঁদের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৭-সাল পরবর্তী সময়েই বেশ কিছু শ্রমআইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মিলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও মজুরী-শ্রম সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে লড়াই সংগ্রাম গুলি গড়ে ওঠে সেই সংগ্রামের সূতিকাগৃহ থেকেই উঠে আসে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা; সমরেশ বসু-র বিখ্যাত উপন্যাস ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’-র নায়করা যারাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একাধারে মিডলম্যান ও অন্যদিকে প্রাক্তন কুলি সর্দারদের ভূমিকা নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় জুট এলাকায় সংসদীয় রাজনৈতিক

দলগুলির প্রবেশ এবং এই দলীয় নেতাদের হাত ধরে আজকের মাফিয়াচক্র ও খয়রাতি সমৃদ্ধ এক লুম্পেন অর্থনীতির উত্থান।

এতকাল ব্যতিক্রম বা বিরল নজিরগুলো বাদ দিলে সংগঠিত ক্ষেত্রের স্থায়ী শ্রমিকের সঙ্গে সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের অস্থায়ী-ঠিকা শ্রমিকের কোনও রকম নিয়মিত মানসিক সম্পর্ক ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর এই দুই অংশ ছিল দুই মানসিক দুনিয়ায়। তাঁদের চাওয়া-পাওয়া, দাবি-দাওয়া সবই ছিল আলাদা। এই দুই অংশেরই নিজ নিজ সংগ্রাম সম্বন্ধে অপর অংশ বেশ নির্বিকারই থাকতো।[১৩] উপরন্তু স্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যেও ছিল মূষিকবৃদ্ধি-গজক্ষয় বিভেদ। অর্থাৎ যারা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে কারখানায় চাকরি পেয়ে বর্তে গিয়েছে, আর যারা অবস্থার গতিকে কারখানায় চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে, এই দুই অংশের মধ্যেও ছিল মানসিক বিভেদ আর টানাপোড়েন। সংগঠিত ক্ষেত্রের স্থায়ী শ্রমিকরা কারখানা আর কলোনির এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নিঃশ্বাস নিতো। চাকরির নিরাপত্তা আর নিশ্চিত মজুরীর নিয়মিততার মাত্রাভেদের ওপরেই নির্ভর করত বিচ্ছিন্নতার মাত্রাভেদ। তাঁদের কাজ, অবসর, খোশগল্প, আবেগ, শ্রেণীঘৃণা- সবই সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। একদিকে মালিক বা ম্যানেজমেন্টর সঙ্গে প্রতি ঘন্টার প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, অন্যদিকে চাকরির এই আকালে বাজারে হাতে এসে যাওয়া বিরল সুযোগটাকে এক সৌভাগ্য হিসাবে দেখে অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করে ভাবা, এই দুই মানসিকতার এক বিমিশ্র জটিল সম্পর্কের মধ্যে দিন কাটাত তারা। দীর্ঘ দশকের পর দশক ধরে নিছক অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের সংস্কৃতিও এই মানসিক জটিলতাকে স্থায়ী রূপ দিতে সাহায্য করেছিল।[১৪]

জুটমিল এলাকার আর্থ-সামাজিক এই যে বনিয়াদ তার ভিত্তির উপরেই প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে বাঁচা অসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থার সার্বিক চিত্রটি

বোঝা দরকার। যে অবর্ণনীয় পরিবেশে তারা প্রতিদিন জীবনযাপন করেন, স্বাস্থ্যসচেতনতার ন্যূনতম পাঠ যেখানে পৌঁছায় না, গালিগালাজ হুমকি লাল চোখ ও হুকুমবরদারিকে সঙ্গী করে অত্যন্ত কম মজুরিতে যেখানে তাদের দিনাতিপাত করতে হয়; কারখানা বন্ধ হলে বা সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর সময় ন্যূনতম সঞ্চয় বলে যেখানে কিছুই থাকে না, যেখানে শ্রমদপ্তরের ঘোষণা করা শ্রমিকস্বার্থে সরকারি প্রকল্প নেহাতই কথার ফানুস হয়ে থেকে যায় সেই পরিস্থিতিই চলেছে বিগত কয়েকটি দশক জুড়ে। সাম্প্রতিক লকডাউন পরিস্থিতিতে হুগলী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের আমরা দেখেছি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে দাঁড়াতে। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর কোন স্তরে তারা দাঁড়িয়ে আছেন এবং বিশ্বকর্মা হয়েও এই বিশ্বায়িত উন্নয়নের কতটুকু সুফল তারা ভোগ করছেন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলিতে আমরা দৃষ্টান্ত রাখব।

পাটশিল্পের সংগঠিত শ্রমিকের ধারাবাহিক ভাবে অসংগঠিত হয়ে ওঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই ঋণস্বীকার করতে হয় সেই সকল গবেষণা, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, তথ্যপঞ্জি ও এই শিল্পের শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক উত্থান পতনের সাথে যুক্ত অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের বহু মূল্যবান সারসংকলনের কাজের কাছে যা এই গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছে ও সুনির্দিষ্ট দিশা দেখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে দীপেশ চক্রবর্তী'র সুবিখ্যাত গবেষণা "Rethinking Working-Class History : Bengal 1890-1940" গ্রন্থটির কথা যা গোটা ঔপনিবেশিক কাল পর্যায় জুড়ে জুট শ্রমিকের চৈতন্য ও তার সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রশ্নটিকে ধরার চেষ্টা করেছে কোনো আদর্শগত বাইনারিকে উপেক্ষা করে। এ প্রসঙ্গে তাঁরই গ্রন্থ থেকে উল্লেখিত কয়েকটি অংশ বোধহয় অসঙ্গত হবে না। দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন...

"THE PARADOX of "strong militancy but weak organization" has usually been resolved by an implicit or explicit argument about the workers' lack of education. Organization was weak, or so the argument has run, because the structural and other features of the workers' conditions deprived them of any opportunity to acquire an understanding of trade union discipline and functioning. The effort, therefore, has been to understand why the workers remained "ignorant", and persistently so, in spite of two or three decades of attempts to educate and organize them.Depending on their convictions,various authors have emphasized different factors--economic, social, or political--to explain this "ignorance".Obviously,the answers differ in terms of their ideological contents and emphases, but one broad fundamental agreement runs through the entire body of the existing discourse on jute workers' organization: that to organize was to educate".[১৫]

জঙ্গী আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য সত্বেও পাটশিল্পে ট্রেডইউনিয়ন গঠন ও তার সংহত হওয়ার প্রশ্নটি কেন দুর্বল থেকে গেল সে আলোচনাই এসেছে এই গবেষণার মধ্যে। এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে যখন একের পর এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মোড়কে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল পাটশিল্পে এবং অর্জিত অধিকার হারানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিক তখন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ব্যাপী ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে শ্রমিকদের শিক্ষিতকরণ ও সচেতন করার প্রক্রিয়ায় কোথায় ঘাটতি ছিল সে প্রশ্নটিও অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। একই সাথে মিশ্র জনবসতিসম্পৃক্ত শ্রমিকবস্তিতে ভাষাগত বিভিন্নতা কিভাবে পার্থক্যসূচক ও প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন...

"The linguistic separation of the majority of workers from the surrounding Bengali community, for instance, was indeed a problem that trade unionists had to reckon with. Abdul Momin writes in his reminiscences of the 1929 general strike that even when the strike spread from Alambazar to Titaghur with "Lightning Speed" and several people volunteered to help in the organization of the strike, language remained an important problem:Not all aur volunteers could speak Hindi and in no other language could propaganda in favor of the strike be carried out in most of the (mill) areas".[১৬]

উপরে বর্ণিত আলোচ্য বিষয়কেই নিজস্ব মননশীলতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুষ্ট করেছেন পরিমল ঘোষ তাঁর "Colonialism, Class and a History of the Calcutta Jute Millhands 1880-1930"–গ্রন্থে। জুটশ্রমিকের চৈতন্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিমল ঘোষ লিখেছেন...

"Marxist writers did have an extra offering to make: they dutifully ascribed a revolutionary zeal to the actions of the factory worker. Invariably, they projected the impression that the proletariat grew from strength to strength, marching forward to fulfil its historic duty to stage a revolution. Researchers who undertook labour studies, with the exception of some overseas scholars, were typically old trade union hands of a liberal persuasion. It is surprising, given their field experience, that little or no attempt was made to understand or analyse class connotations with reference to India's industrial labour force. Certain assumptions were almost inbuilt in this kind of writing. Masses of Indians worked in factories and it was therefore assumed that India had a 'working class' with its own distinct class consciousness. However, alongside this assumption, there was also the awareness that the working class

in India exhibited features that did not exactly reflect class cohesion, or even class formation. There were far too many instances of conflicts within the working class itself. Hindu-Muslim and other types of communal eruptions caused a worker's class identity to become submerged in the rising tide of loyalty expressed towards community, which was frequently religious. The understanding was that these were signs of backwardness, a by-product of colonial rule, which had ensured that the agricultural hinterland should primarily remain feudal in its orientation. As a matter of routine, industrial labour in india was never completely depeasantised; it was therefore understood that the communal loyalties of the labour force were almost organic in nature. However, it was also assumed, perhaps as a result of the confidence generated by the freedom struggle and the attainment of independence, that with time, this backwardness would be overcome. Briefly, there was a basic faith in the existence of an entity called the working class which occurred in the history of a country as long as there were industries; they also understood that in some countries, because of special circumstances, it took longer to appear than in others".[১৭]

অসম বিকাশ ও কৃষিভিত্তিক সমাজের ফলে ইউরোপের শ্রমিক ও আমাদের দেশের কারখানার শ্রমিকের মধ্যে যে বহু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে, মার্ক্সিয় ঐতিহাসিকরা বহু ক্ষেত্রে তা এড়িয়ে যান এবং তাদের এই নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা সামাজিক সংকটকে বহু সময়েই সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি বলে পরিমল ঘোষ মনে করেন। ঔপনিবেশিকতার সন্তান হিসাবে ধর্মীয়সত্ত্বা কিভাবে জুট শ্রমিকের জীবনে প্রবেশ করেছে এবং তাদের শ্রেণীসত্ত্বাকে খণ্ডিত করেছে তা পরিমল ঘোষ বিস্তৃত ভাবে

উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়েঃ "Workers' Struggles I-Pan-Islamism and Communal Riots"-পর্বটিতে।[১৮] বছরে দুবার জুটমিল বন্ধ হলে আজও যে জুট শ্রমিক বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িষা সহ তার নিজের রাজ্যে ফিরে যায় ও সেখানকার গোষ্ঠী ও গ্রামীণ রাজনীতির সাথে যে মিথষ্ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকে তার কারণ শ্রমিক হলেও কৃষি ও জমি তার রক্তে অবস্থান করে। ঐতিহাসিক ভাবে দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ থাকলেও সেই সংগ্রামে এক পৃথক শ্রেণীসত্ত্বা হিসাবে নিজেকে বিকশিত না করতে পারা উল্লিখিত কারণ সমূহের ফলশ্রুতি বলেই পরিমল ঘোষ মনে করেন।[১৯]

রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠক ও প্রখ্যাত গবেষক সুনীতি কুমার ঘোষের "বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি ও রাজনীতি" গ্রন্থটিও এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ণে পৌঁছতে আমায় সাহায্য করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে বাঙালী উদ্যোগপতি ও বণিকেরা কেন টিকে থাকতে পারল না এবং বাংলার পাটকারখানা সহ অন্যান্য শিল্প মানচিত্রে ধীরে ধীরে মারোয়াড়ী পুঁজি কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল তার আনুপুর্বিক ইতিহাস আছে এই গ্রন্থে।[২০] এই ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কারণ গবেষণার কাজে চটকলে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখি জুটশ্রমিকনেতা বলেন পাটশিল্পের ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ হল দেশভাগ ও বাংলাবিভাজন এর ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমে পড়ে রইল পাটকল আর পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ধলেশ্বরী কোল ঘেঁষে থেকে গেল বিস্তীর্ণ পাটচাষের ক্ষেত্রগুলি। এই বিভাজন যদি না হতো যদি ফড়ে-লিজমালিকের পরিবর্তে প্রকৃত উদ্যোগপতি বণিক ও শিল্পপতিরা পাটশিল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তবে বাঙালীর ভাগ্যাকাশে হয়তো এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতো এই পরিবেশবান্ধব শিল্পটির উত্থান।

দীপেশ চক্রবর্তী'র এই গবেষণাই আরও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার উপর সঙ্কলিত হয়েছে ২০১৩ সালে প্রকাশিত নির্বাণ বসু'র সম্পাদিত "অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস" গ্রন্থটিতে যেখানে বিভিন্ন শিল্পে সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিকদের কালানুক্রমিক জীবনবৃত্তান্তের সাথেই এসেছে চট শ্রমিকদের কথা, এসেছে ঔপনিবেশিক কালে সর্দারদের প্রশ্ন জুটশ্রমিক এলাকায়, যে সর্দার ও শ্রমিকের সম্পর্ক পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয়েছে এবং ৪৭-উত্তর সময়কালে কিভাবে এক নতুন মিডলম্যান শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। এই গ্রন্থে "চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারি প্রভাব" প্রবন্ধে অমল দাস লিখেছেন "সর্দারি এই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চটকলে অধিবাসী শ্রমিকের জীবনের ছন্দ ও ধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা হত তার একটা সুস্পষ্ট ছবি দিয়েছেন তদানীন্তন বাংলার লেবার ইন্টেলিজেন্স অফিসার জি.এন.গিলব্রিস্ট।[২১] তার বর্ণনা থেকে জানা যায়...

"সর্দার তাকে (শ্রমিককে) তার নিজের থেকে ভাড়া দিয়ে বাধিত করে এবং পথে খাবার কেনার জন্য সামান্য অর্থ দেয়। সর্দার তাকে আরও কিছু টাকা অগ্রিম দেয় কারণ আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকের চাকরী নাও জুটতে পারে। সে তাকে বিশেষ কোন স্থানে থাকবে সে ব্যপারে নির্দেশ দিতে পারে এবং বিশেষ কোন দোকান থেকে চাল ও খাদ্যসামগ্রী কিনবে এ ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়। যে দিনে কোন কাজ খালি থাকে এবং সে শ্রমিক সর্দার কর্তৃক কাজ পায়; সর্দার তখন তাকে বলে মিলের পাওনা বইতে তোমার মাসে ১২ টাকা অনাদায়ী পড়েছে।[২২] কিন্তু এর সঙ্গে তোমার জন্য আমি (সর্দার) কিছু টাকা খরচ করেছি। সাধারণত যখন আমি তোমাকে কোন কাজ দেব, তখন আমাকে তুমি একটাকা এবং একসঙ্গে মাসে একটাকা করে দুই-বছর দিয়ে যাবে। যেহেতু টাকা একসঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি

তোমার জন্য কাজের ব্যবস্থা রাখতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত মাসে দুই-টাকা করে আমাকে দিয়ে যাবে। যদি এই শর্তে তুমি রাজী না থাক তবে তোমার চাকরী কতদিন থাকবে তা আমি জানি না'। বিনয়ী শ্রমিক যুবক বিনয়ের সঙ্গে এই শর্ত মেনে নেয়। এই শ্রমিক তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দেখে যে, যে ঘরে সে আরও ছয়-জনের সঙ্গে থাকে সে বাড়ীর মালিক তার এই সর্দার। তাছাড়া যে দোকান থেকে সে চাল কেনে সেই দোকানটিও এই সর্দারের সম্পত্তি"।[২৩]

কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের এই যে পরম্পরা ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে চলে এসেছে তাই পরবর্তী কালে বিবর্তিত হয়ে জুট এলাকায় মিডলম্যান নির্ভর এক সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে। রাজনৈতিক মদতপুষ্ট, নেতানির্ভর পাইয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি এরই পরবর্তী রূপের প্রতিচ্ছবি। এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সাংস্কৃতিক 'হেজিমনি' শ্রেণী হিসাবে জুটশ্রমিকের পরিচয়কে সংকীর্ণ করেছে ও সংগঠিত আন্দোলন ও ট্রেডইউনিয়ন গঠনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ কাজ করেছে।[২৪]

গবেষণার কাজে বহুল সহায়তা করেছে পাট শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার সাথে কয়েক দশক ধরে যুক্ত থাকা বর্ষীয়ান ট্রেডইউনিয়ন নেতা, কানোরিয়া জুটমিল আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মাননীয় শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ ও রচনা সংকলনের ক্ষেত্রগুলি। সমবায়কে কেন্দ্র করে এক বিকল্প শ্রমিক সমাবেশের যে অভিজ্ঞতা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার তুল্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে উঠে এসেছে সংকটের প্রশ্নটিও। প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখেছেন-'পাটের সঙ্কটমোচন তথা সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, এর পথে যত যা বাধা আছে তাকে চূর্ণ করে এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য একদিকে ফড়ে-ফাটকাবাজদের দুষ্টচক্রকে ভাঙবার আর অন্যদিকে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির পেট্রোলিয়াম লবির হামলাকে মোকাবিলা করার মত অপরিহার্য দুটি

কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।[২৫] স্পষ্টতই এর জন্য প্রয়োজন এক বিরাট সংগ্রাম, যে সংগ্রামের মূল শক্তি হয়ে উঠতে হবে জুটশ্রমিক ও পাটচাষীকে। কারণ পাটের সংকট তাঁদেরই জীবন জীবিকাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি এবং সংকটমুক্ত, পুনরুজ্জীবিত ও নতুন ভাবে বিকশিত পাটক্ষেত্র তাঁদের জীবনেই সর্বাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবে। অতএব আজ সবার আগে প্রয়োজন জুট শ্রমিকের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে ওঠা, পাশাপাশি পাটচাষীদেরও নামতে হবে ক্রমশ সংগঠিত লড়াইয়ে। আবার জুট শ্রমিক ও পাটচাষীর জোটবদ্ধ শক্তিরও লড়াইয়ের ময়দানে এসে দাঁড়ানো চাই। না, পাটের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে শুধু এই জোটই যথেষ্ট নয়, শ্রমিক কৃষক জোটের চারপাশে অতি অবশ্যই চাই অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী, আধা-শ্রমজীবী, কৃষক সমাজের অন্যান্য অংশ, ছোট-মাঝারি শিল্পোদ্যোগী, ও ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীসমাজ সহ মধ্যশ্রেনীর প্রায় সমস্ত অংশের মানুষের ব্যাপক সমাবেশ। এককথায়, পাট আন্দোলনের সপক্ষে আজ চাই একটি ব্যাপকতম জনমোর্চা, যা বিরাট গণআন্দোলন তথা সামাজিক আন্দোলন হয়ে আছড়ে পড়বে আজকের পশ্চিমবঙ্গের বুকে।[২৬]

প্রসঙ্গত, একটি জরুরী কথা। এতবড় একটা গণআন্দোলন গড়ে ওঠার আবশ্যিক শর্ত এই যে, পাটচাষী ও জুটশ্রমিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার ব্যাপক প্রসার এবং নিজস্ব গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক লড়াইয়ে তাঁদের সামনের সারিতে উঠে আসা। তাই,সত্যিকার অর্থে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠতে হলে যে ব্যাপক ও গভীর ঐক্য প্রয়োজন তার জন্য জাত-পাত, ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলার প্রয়াসও জরুরী। এই ভাবে জনসাধারণের সকল অংশের সম্মিলিত শক্তি যখন সত্যই সামাজিক সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করবে এবং পরিণামে

সংগ্রাম যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকবে, তখনই পাটের সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লড়াইয়ের শক্তি ক্রমশ দুর্জয় হয়ে উঠবে। বর্তমানে জাতপাতকে কেন্দ্র করে ভয়ংকর সংঘর্ষ, হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদ ও তজ্জনিত হানাহানি, খুন, জখম এবং জাতিগত সংঘাতের ব্যাপক বিস্তার ও ক্রমবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই লড়াই কার্যকর এক শক্তি হিসেবে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে"। এই ক্ষমতায়নের পথে বাধাস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্র রয়েছে সে সম্পর্কিত উপলব্ধি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমিতা সেন রচিত, "Women and Labour in Late Colonial India : The Bengal Jute Industry" (Cambridge University Press, 2004) গ্রন্থটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে যা এই গবেষণার কাজকে পুষ্ট করেছে। অধ্যাপক সেন তাঁর আলোচনা শুরুই করেছেন হুগলী শিল্পাঞ্চলের যে এলাকা বর্তমান গবেষকের তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র সেই শিল্পাঞ্চলেই নব্বইয়ের দশকের অন্যতম সাড়া জাগানো ঘটনা ভিক্টোরিয়া জুটমিলের শ্রমিক ভিখারি পাসওয়ানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটিকে সামনে এনে।[২৭] তৎকালীন শাসকদল ও সরকারি মদতপুষ্ট গুন্ডা বাহিনীর হাতে প্রতিবাদী শ্রমিক নেতা ভিখারি পাসওয়ানের মৃত্যু যেমন এক অন্ধকার দিক উন্মোচিত করে তেমনই এই মৃত্যু পরবর্তীকালে শুধুমাত্র বৈধ বিবাহের সার্টিফিকেটটুকু না থাকার ফলে ভিখারি পাসওয়ানের স্ত্রীকে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদমনের ও অমর্যাদার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা একজন নারীশ্রমিকের শ্রমিক পরিচয়টিকেও হত্যা করে একই সাথে। জুটমিলের মহিলা শ্রমিকদের সেই ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে যে অমানবীয় পরিবেশে কাজ করতে হত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় তা শুধু বহাল থাকেনি বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। আজ পাটশিল্পে নারী শ্রমিকের অনুপাত যে কোন শতাংশেও আসে না তার সুনির্দিষ্ট কারণগুলি এক বস্তুনিষ্ঠ মুনশিয়ানায় উন্মোচন করেছেন অধ্যাপক সেন।

জাতি ধর্ম পরিচিতির সাথে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিকতা ও মধ্যযুগীয় লিঙ্গ বৈষম্য কীভাবে শ্রমিক পরিচিতিকে খর্ব করেছে তা এক উল্লেখযোগ্য আলোচনার দাবী রাখে।[২৮]

অধ্যাপক অজিত নারায়ণ বসু এককালে রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ "পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতি" বইটি বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থানকে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে। বিশেষত নব্বইয়ের দশকের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের হাত ধরে যে "Structural Adjustment Program" ও "উন্নয়ন" –এর কর্মসূচী তা সামগ্রিকভাবে শ্রমসম্পদ ও শ্রমজীবী মেহনতির জীবনে কী পরিবর্তন ও সংকট এনেছে তা অধ্যাপক বসু আলোচনা করেছেন নির্মোহ মহিমায়।[২৯] একই সাথে এই যুগেও মানবিক ও স্বেচ্ছা মূলক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রকৃত উন্নয়নের কাজ কীভাবে সুনিপুণ ভাবে করা যায় তাও দেখিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার ও আশির দশক পরবর্তীকালে সুকৌশলী পরিকল্পনায় সেই অধিকারগুলি একে একে হারানোর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নিরলস ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজ করে চলেছেন নাগরিক মঞ্চের কর্মীরা। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য এই সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত "মানুষের অধিকার চলমান সংগ্রাম" গ্রন্থটি যা শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকারগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। যে এলাকা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র সেই এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নাগরিক মঞ্চের কর্ণধার নব দত্ত লিখেছেন : "প্রদীপকুমার দাস একজন জুটমিলের শ্রমিক, থাকেন তেলেনিপাড়া, হুগলীতে। বুক এবং লিভারের অসুখে ভুগছেন। ই.এস.আই অন্তর্ভুক্ত বিমাকারী। নিজের চিকিৎসা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার প্রাপ্য অধিকার নিয়ে সরব ও সক্রিয় প্রদীপ ডাক্তার ও কর্মচারীদের কাছে বেশ

পরিচিত। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার চিকিৎসায় ভর্তি থেকেছেন একাধিক ই.এস.আই হাসপাতালে। এই ব্যবস্থার বিমাকারী শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ ও সুবিধা কি; অসচ্ছল এই মানুষটি নিজের অর্থে ইএসআই সম্পর্কিত আইন কানুন, অধিকারের বইপত্র কিনে, সংগ্রহ করে তা শ্রমিকদের জানান বোঝান। তাঁদের হয়ে ইএসআই দপ্তরে ঘুরে বেড়ান। অসংখ্য শ্রমিককে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি যারা প্রদীপ দাসকে জানেন এবং বিশ্বাস করেন, ইএসআই নিয়ে সমস্যা হলে প্রদীপকে তাঁরা পরামর্শদাতা হিসাবে পাবেন। ওঁর আক্ষেপ ই.এস.আই ব্যবস্থায় শ্রমিক কী কী পেতে পারেন জানার পরেও ট্রেড ইউনিয়ন কেন সক্রিয় হয় না"।[৩০] শিক্ষিত সচেতন প্রদীপ দাসের যন্ত্রণার ক্ষেত্র যদি ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয়তা নিয়ে হয় তবে খুব সহজেই অনুমেয় আইনী পরিষেবার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত অসংগঠিত শ্রমিক খাদের কোন কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। পি-এফ, ই.এস.আই, গ্র্যাচুয়িটির টাকা না পাওয়া জুট মিলের শ্রমিকদের কাছে একটি বড় সমস্যা হিসেবে আছে। বকেয়া পি-এফ-এর পরিমাণ ২৫৭.৬৫ কোটি টাকা (৩১/০৩/২০০৪ পর্যন্ত), বকেয়া ই.এস.আই –এর পরিমাণ ৫৮.৫৫ কোটি টাকা ও বকেয়া গ্র্যাচুয়িটির পরিমাণ ২৫০ কোটিরও বেশি। অর্থাৎ পি-এফ, ই.এস.আই-গ্র্যাচুয়িটি খাতে মোট বকেয়ার পরিমাণ ৫৬৬.২০ কোটি টাকার বেশি। এ ছাড়াও শ্রমিকদের ডি.এ বাবদ আগস্ট ২০০১ থেকে এপ্রিল ২০০৬ পর্যন্ত মোট বকেয়ার পরিমাণ ১৮৭.৫ কোটি টাকা।[৩১] এমন বঞ্চনার দিনলিপি এই গবেষণায় এসেছে পরতে পরতে।

বর্তমান গবেষণার অন্যতম আলোচ্যবিন্দু পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিক। পাটশিল্পের মত একটি সংগঠিত শিল্পে অসংগঠিত শ্রমিকের যে নতুন চেহারা আমরা এই বিগত ৪০ বছরে দেখতে পাই স্বাধীনতা-উত্তর পরবর্তী দশকগুলিতে তা নিশ্চিত ভাবেই ছিল না। আবার অর্জিত অধিকার হারানোর যে ক্ষেত্রবিন্দুতে বর্তমানে

পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে নিশ্চিত ভাবেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় দীপেশ চক্রবর্তীর গবেষণা কার্যের সময়কালের। যদিও কর্তৃত্ব আনুগত্য, শ্রমিকমনন ও সংস্কৃতির যে চেহারা আজকের সময়ে বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতির হাত ধরে এক জটিল বিমিশ্র সম্পর্কে উপনীত হয়েছে তা আগের যে কোনো সময়ের থেকে ভিন্ন ও বহুমাত্রিক। এই "Discourse" এর প্রতিটি ক্ষেত্রকে সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করা এবং অসংগঠিত শ্রমিকের বর্তমান আর্থ-সামাজিক চিত্রটিকে উপস্থিত করাই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

মানচিত্র– ৩

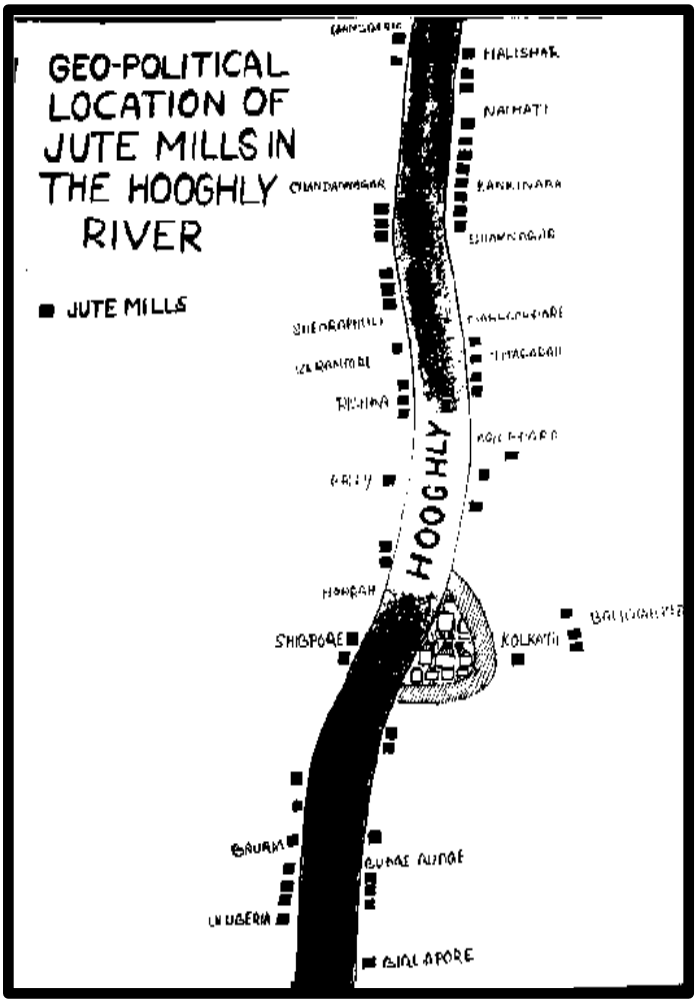

Map Showing the Location in Hooghly River

তথ্যসূত্রঃ

১. "Statistics World Production of Jute Fibers from 2004 / 2005 to 2010 / 2011" International Jute Study Group (IJSG). 2013.11.19

২. Kumari, Kalpana; S.R, Deve Gowda et. all (2018). "Trend analysis of area production and productivity of jute in India". The pharma innovation journal. 7(12); p- 394, 399

৩. WEBSITE - http://www.jutecomm.gov.in, Worldjute.com, 2018.10.17

৪. "Wellcome to the world of jute and kenaf". 26 May 2008. Archived from the original on 26 May 2008, Retrieved 27 April 2019

৫. Dipesh Chakrabarty, "Rethinking Working-Class History Bengal 1890-1940", Princeton University Press, 1989

৬. তদেব, পৃ. ১০৫

৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "মহেশ", শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ খন্ড ১, কলকাতা ১৯৮৮

৮. কোমল সেন, "ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস" (১৮৩০-২০০০), এন.বি.এ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৩

৯. চক্রবর্তী, অনাদি। ২০০৩-২০০৪। "শাসক শ্রেণীর আক্রমণ ও শ্রমিক আন্দোলন সমস্যা" কুলিশ, ১:৪। কলকাতা

১০. সুকোমল সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১১. অমিয়কুমার বাগচী, ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন (১৯০০-১৯৩৯), কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ২৮৯

১২. সমরেশ বসু, 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৯, ১৯৮৮

১৩. তদেব, পৃ. ৪

১৪. তদেব, পৃ. ৫

১৫. দিপেশ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

১৬. তদেব, পৃ. ১৩০

১৭. Parimal Ghosh, "Colonialism, Class and a History of the Calcutta Jute Millhands 1880-1930", Orient Longman Limited, 2000, পৃ. ২, ৩

১৮. তদেব, পৃ. ১৬৪

১৯. তদেব, পৃ. ১৬৫

২০. সুনীতি কুমার ঘোষ, "বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি ও রাজনীতি" জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২৫৩/২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ১২০৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৫৩, ৫৮, ৫৫, ৫৬

২১. অমল দাস, "চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারী প্রভাব ১৮৮৫-১৯২০", ইতিহাস অনুসন্ধান-১, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৭৬

২২. তদেব, পৃ. ৭৭

২৩. তদেব, পৃ. ৭৮

২৪. প্রফুল্য চক্রবর্তী, "কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন সমবায় ভাবনা" ১৯৯৪। কানোরিয়াঃ জীবনের জয়গান। ফুলেশ্বরঃ কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন।

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা. ৭১

২৬. নির্বাণ বসু, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭৮

২৭. অধ্যাপক সুমিতা সেন, "Women and Labour in Late Colonial India : The Bengal Jute Industry" Cambridge University Press, 2004

২৮. তদেব, পৃ. ৯

২৯. অজিত নারায়ণ বসু, "পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি", নাগরিক মঞ্চ (প্রকাশক) পরিবেশক সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৩

৩০. নব দত্ত, "পাটশিল্প" নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, ২০০১

৩১. পরিমল রায়, "পাট শিল্প : পশ্চিম বাংলার শ্রমিক সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" পুরাতনী মুখপত্র : উত্তর চব্বিশ পরগনা ইতিহাস পরিগম, আগস্ট ২০১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. পাটশিল্প শ্রমিকদের পরিচিতি সত্ত্বা ও সামাজিক সংহতির ক্ষেত্র

প্রায় ৭০ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত সুধীর কুমার মিত্রের রচনা 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে সেই সময়ের যে খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় আজও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সুধীর কুমার লিখেছেন সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে "মিল এলাকা ছাড়া অন্য স্থানগুলি খুব পরিষ্কার রাখা হয় না বলিয়া মধ্যে মধ্যে অসুখের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রধান রাস্তা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড। রাস্তার গা দিয়া যেসব শাখা রাস্তাগুলি আছে সেই গুলি অপ্রশস্ত এবং ধূলি ধূসরিত। এই সব রাস্তার দুই ধারে গভীর কাঁচা অপরিষ্কার নর্দমা পৌরসভার কলঙ্ক। পরিমার্জনের অভাবে নর্দমা হইতে দুর্গন্ধ ও জল নিষ্কাসনের অব্যবস্থার জন্য পেটের অসুখের প্রাদুর্ভাব এই স্থানে প্রায়ই হয়"।[১]

হুগলী জেলায় গোন্দলপড়া জুটমিল, ভিক্টোরিয়া, নর্থব্রুক জুটমিল অধ্যুষিত তেলিনিপাড়া এলাকায় চটশিল্প ও অন্য কারখানায় কাজ করতে আসা হিন্দি ও উর্দুভাষী মানুষ এসেছেন মূলত ব্রিটিশ শাসনকালে। তেলিনিপাড়ার মিশ্র জনবস্তিতে উক্ত দুই ভাষাভাষী মানুষ আছেন বহুলাংশে। এছাড়া ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালটি এলাকায় উড়িয়া তেলেগু ইত্যাদি ভাষার মানুষ আছেন। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে দগ্ধ হয়েছেন এখানকার মানুষ। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দিভাষী বনাম উর্দুভাষী এই সমীকরণ উঠে এসেছে।

তবে সাম্প্রতিক অতীতে গোন্দলপাড়া-তেলিনিপাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাম্প্রদায়িক হিংসার যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। এবারের তেলিনিপাড়ার বিশেষত্ব হল দাঙ্গার বিস্তৃতি; এলাকা ও জনগোষ্ঠীর নিরিখে।

বাংলাভাষীরাও সাম্প্রদায়িক হিংসায় যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। সংগঠিত ও বহিরাগত দাঙ্গাবাজ এনে সুপরিকল্পিত ভাবে হিংসার চাষ হয়েছে এই পর্যায়ে।

ভিক্টোরিয়া বা গোন্দলপাড়া জুটমিল সংলগ্ন এলাকায় কুড়মালি, ভোজপুরির মতো আঞ্চলিক হিন্দি ভাষী গরীব মানুষ, ঐতিহ্যগত ভাবে উর্দুভাষী (অধুনা হিন্দি ভাষী) সম্পন্ন মুসলিমরা,বা দরিদ্র হিন্দি ভাষী মুসলিম, ঘাটাল ব্যবসায়ে যুক্ত থাকা বড় সংখ্যার হিন্দিভাষী গোয়ালা, দর্জীর কাজে যুক্ত বা ছোট অস্থায়ী চাকরী করা হিন্দু বা মুসলিম মানুষ যারা প্রায় অধিকাংশই তিন প্রজন্মের বেশি এখানে কাটিয়ে ফেলেছেন। মহল্লা অনুযায়ী স্থানীয় মানুষের মধ্যে যেমন একটি বিভাজন চালু আছে হিন্দু মুসলিম আর বাঙালী। শ্রমিক মহল্লার বাইরে গ্রান্ডট্যাঙ্ক রোডের উপরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চাকুরিজীবী বাঙলা ভাষীরাই বাঙ্গালী। তাঁরা অতীত থেকেই হিন্দি ভাষী দলিত হিন্দুদের থেকে এক পৃথক সত্তা হিসেবে রয়ে গেছেন। এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক হিংসার হেতু খুঁজতে গেলে জনবিন্যাস আর সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে উপলব্ধি না করলে অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বাংলার মুসলিম আমলে বড়ো অংশ অবাঙালী মুসলিম প্রথমে ভদ্রেশ্বর ও পরে অনান্য অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। স্বাধীনতার আগে ও পরে এলাকার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে করায়ত্ত করে সাহু, তিয়ারী, আগরওয়ালরা। জলপথে কাঁচামাল পরিবহণের সুবিধার জন্যে অবিভক্ত নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাটের উপর ভরসা করে গড়ে ওঠে চটকলগুলি। শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে গরীব ও দলিত মানুষরা আসেন দলে দলে; নদীর তীরবর্তী মিল লাগোয়া অঞ্চলে বসতি, শ্রমিক মহল্লা গড়ে ওঠে এখানে যাকে ‘লাইন’ বলা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাম শ্রমিক আন্দোলনের অনেক সক্রিয়তার সাক্ষী হুগলী নদীর দুই তীরের

জুটমিলগুলো। কিন্তু সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হিংসার পরে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে শ্রমিক মহল্লার ন্যূনতম জীবনধারণের সুবিধাগুলোর দিকে ট্রেডইউনিয়নও যেমন একদিকে ভূমিকা পালন করেনি তেমনই পৌরপরিষেবা অবহেলিত থেকেছে। পানীয় জলের সমস্যা দুর্বিষহ নিকাশি ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের মত বিষয়ের সুরক্ষার কথা উঠলে ধর্মনির্বিশেষে মহল্লার বাসিন্দারা ক্ষোভ জানিয়েছেন কিন্তু প্রতিকার সূত্র মেলেনি।

চিত্র - ১[২]

পানীয় জলের কল এবং নিকাশি ব্যবস্থা

সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গার একটা প্যাটার্ন ধাঁচা বা ছক খুঁজতে চেয়ে যা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে তা হল 'পলিটিক্যাল রিলিজিয়ন' বা রাজনৈতিক ধর্মের রিভাইভ্যাল বা পুনরুত্থান যা গোটা দেশে গত এক দশকে পালাবদলেরই সমান্তরাল। ফলশ্রুতিতে হিন্দু আরও হিন্দু হয়েছে, মুসলমান আরও মুসলিম। এতদিন দলিত হিন্দু আর গরীব মুসলিম পাশাপাশি থেকেছে পার্থক্য নিয়েই আবার রুটিরুজির নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যায় তা

থিতিয়েও গেছে। কিন্তু লাগাতার রাজনৈতিক ইন্ধন সাম্প্রতিক ছবিটায় নতুন কিছু উপাদান যোগ করেছে যাকে এক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিসেবেও দেখা যেতে পারে। ফলত অসহিষ্ণুতার যুক্তি যেমন সহাবস্থানের যুক্তিকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে তেমনই প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও বহুক্ষেত্রে প্রশাসনেরও পক্ষপাতমূলক অবস্থান এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অসংগঠিত শ্রমিক মেহনতির রাজনৈতিক শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। বহু মানুষ যেমন একদিকে মনে করছেন যে এলাকা ছেড়ে হয়তো সত্যি চলে যেতে হবে; বহু মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় যেমন দিন গুনছেন তেমনই আগ্রাসী ধর্ম এক কাল্পনিক 'অপর'কে চিহ্নিত করে নিজের অনুগামীদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে সফল হয়েছে যে এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণই তাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দেবে এবং রুটিরুজির জীবিকার সমস্যাগুলির সমাধান করবে। বাংলাদেশে শরিয়তি ইসলামের সামাজিকীকরণ যেমন সম্পূর্ণ হয়েছে তেমনই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ধর্ম হিশেবে হিন্দুত্বের বিস্তার এবং সমাজের অন্য অংশের মতই অসংগঠিত শ্রমিক শ্রমজীবীকেও তার প্রভাবে নিয়ে আসার কাজ পুরোদমে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে পলিটিক্যাল রিলিজিয়ানের সামাজিক আঁতুড়ঘর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৫৭ সালে বিনয় ঘোষ তাঁর সুবিখ্যাত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে যে ভাষ্য উপস্থিত করেছেন এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ করা একটু দীর্ঘায়িত হলেও একদমই অত্যুক্তি হবে না। বিনয় ঘোষ লিখেছেন "পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষের একই জীবনবৃত্তে অবস্থান। কোনো বহিরাগত উপাদান-কারণ (material cause) অথবা ভাবগত-কারণ (ideological cause) এই জীবনবৃত্ত থেকে তাদের বিকেন্দ্রিত করতে পারেনি, অথবা এই বৃত্তের পরিধিও তেমন প্রসারিত করতে পারেনি। তাই একই সংস্কৃতিবৃত্তে

চক্রাকারে আবর্তন এবং দীর্ঘকাল আবর্তনের ফলে জীবনবৃত্তের নিয়ন্ত্রক হিসেবে অনেক বেশি প্রভাবশালী সংস্কৃতিবৃত্ত। আমাদের দেশে ইয়োরোপ-আমেরিকার মতো Urbanization অথবা Proletarianization হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা সমগ্র সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করার দিক থেকে সামান্য বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে তার বিকাশ আরও উৎকট হয়েছে। বাঙালী শ্রমিক কারখানার বাইরে গৃহস্থ অথবা চাষী, আধা-চাষী, গ্রামের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো জেলার যে-কোনো কারখানার বাঙালী শ্রমিকের জীবনবৃত্ত পর্যালোচনা করলে এ সত্য উদঘাটিত হবে। সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনা মানসতা আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বেশ দৃঢ়মূল হয়েছে, এমনকি কবচ মাদুলিধারী (গ্রহ রত্ন তো বটেই) বাঙালী বায়োকেমিস্ট ফিজিসিস্টদের মধ্যেও। তাই কারখানার চৌহদ্দির মধ্যে অথবা ময়দানে যে বাঙালী হিন্দু মজুর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মার্ক্স-লেনিনের নামে বিপ্লবের স্লোগান দেয়, সেই বাঙালী মজুর নিজের ঘরে ফিরে এসে (মজুরের কোয়ার্টারে নয়) হাতজোড় করে নারায়ণশিলার পূজো করে, গ্রামে লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরে গিয়ে মজুরি বৃদ্ধির জন্য মানত করে। এটা কিন্তু মার্ক্সীয় অর্থে মোটেই Contradiction নয়, কারণ এরকম আচরণ হল ঘরে ফিরে এসে অফিসের পোশাক ছেড়ে ফেলার মতো, অর্থাৎ মার্ক্স-লেনিন, ফিজিক্স-কেমেস্ট্রি, এগুলি আজও আমাদের কাছে অফিসের পোশাকের মতো, ঘরোয়া পরিবেশে অস্বস্তিকর, তাই পরিত্যাজ্য। আদতে এটা হল সংস্কৃতিবৃত্তের পূর্ণগ্রাস জীবনবৃত্তকে। সংস্কৃতিবৃত্তকে ideological superstructure এবং জীবনবৃত্তকে material base বলা যায়। সংস্কৃতিবৃত্তের প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক এবং জনসাধারণের জীবনবৃত্তকে তা যে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে তাতে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। গোড়াতে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা গত পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে, একই গ্রামে একই

অঞ্চলে একাধিকবার গিয়ে, একই উৎসব একই মেলা একই অনুষ্ঠানকর্ম আচরণ-বিশ্বাস-দেবদেবী-মন্দির দেখে দেখে একেবারে দূর হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃতিবৃত্ত নিয়ন্ত্রণ (control) করছে জীবনবৃত্তকে এবং জীবনবৃত্তের অর্থনীতিকেও। সংস্কৃতিবৃত্ত এখানে 'manipulation' জীবনবৃত্ত তার দ্বারা 'conditioned'। কাজেই এমন যদি কাম্য হয় যে জীবনবৃত্তকে স্থির শান্ত রাখতে হবে, মধ্যে মধ্যে তার মধ্যে ঘূর্ণাবতের সৃষ্টি হলে তাকে প্রশমিত করতে হবে, তাহলে সংস্কৃতিকে 'ম্যানিপুলেট' করে তা সহজেই করা সম্ভব হতে পারে। মার্ক্সইজমকে যারা 'Dogma' বা বদ্ধসংস্কার মনে করেন, বিজ্ঞান মনে করেন না তাদের কাছে এরকম কথা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। বিভ্রমের কুয়াশায় বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে রাখার এটা একটা বড়ো কৌশল এবং আমাদের সংস্কৃতিবৃত্তের বিভ্রম রচনার এই কৌশল কত বিচিত্র ও সমৃদ্ধ তা রীতিমতো অনুধাবনের বিষয়"।[৩] সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক ধর্মের বিস্তার সুকৌশলে সামাজিক সংহতির ক্ষেত্র গুলিকে যেভাবে খণ্ড-বিখন্ড করে চলেছে তাতে প্রায় ৭০ বছর পূর্বে বিনয় ঘোষের এই মূল্যায়ন আজও তাৎপর্যপূর্ণ।

চিত্র - ২[৪]

উপরে চিত্র হল হুগলী জেলার, চন্দননগর, গোন্দলপাড়া এবং ভদ্রেশ্বর শ্রমিক বসতি

২.২ তিমিরবিনাশী বারে বারে

প্রথমেই বলা যাক অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯৪৫)-এর কথা। পেশাগতভাবে সফল ব্যারিস্টার নদিয়ার এই মানুষটির অন্যতম পরিচয় বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের জন্মদাতা রূপে। ঔপনিবেশিক আমলে ১৯০৫ সাল থেকে তিনি চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। কলকাতা থেকে বজবজ পর্যন্ত সমস্ত চটশ্রমিকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন পঞ্চাশ হাজার সদস্য বিশিষ্ট 'ইন্ডিয়ান মিল-হ্যান্ডস ইউনিয়ন' ১৯০৯ থেকে যা পরিচিত হয় 'ইন্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন' নামে। প্রতি মাসেই মিল অঞ্চলে শ্রমিকদের মাঝে তিনি তুলে ধরতেন সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা। ফোর্ট গ্লস্টার, ব্রিটিশ ক্লাউড, ন্যাশনাল ও বেলভেডিয়ার জুটমিলের শ্রমিক সংগঠনের মাঝেও ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত।

চটকল ইউনিয়ন গড়ার কাজে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী (১৮৭৮-১৯২১)। ১৯০৬এর ১৯-শে আগস্ট চটকল শ্রমিকদের 'ইন্ডিয়ান মিল-হ্যান্ডস ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হলে প্রভাতকুসুম হন সম্পাদক, অশ্বিনীকুমার হন সভাপতি। ১৯১০–এর জানুয়ারি মাসে চব্বিশ পরগনায় অনুষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রভাতকুসুম চটকলে রাত্রিবেলা কাজ নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। বজবজের চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে আমৃত্যু তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২১-এ যে বছর তিনি অকালে প্রয়াত হন, সে বছরও চটকল শ্রমিকদের একটি সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।[৫]

১৯২০–র দশকে হাওড়ার বাউড়িয়া এবং চেঙ্গাইলে চটকল শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কথা সংক্ষেপে বলা যাক। ১৯২৭–এ চেঙ্গাইলে ধর্মঘটরত চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (১৮৯৭-১৯৬১)।[৬] চেঙ্গাইলের লাডলো জুটমিলের দশহাজার শ্রমিকের ইউনিয়নে তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে সংসদীয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে শ্রমিকদের কথা তুলে ধরেন। ১৯২৬-এ আসানসোলের শ্রমিক কেন্দ্র থেকে তিনি বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। সে-অর্থে তিনিই ছিলেন আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য।[৭]

১৯২৮-এ বাউড়িয়া চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কিশোরীলাল ঘোষ (১৮৯১-১৯৩১)। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে, কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় তিনি বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়ন নেতার যৌথস্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বাউড়িয়া মিলের চটকল শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। সরকার এই ধর্মঘট ভাঙার বহু চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। কারণ ধর্মঘটী শ্রমিকেরা অসীম সাহসের সঙ্গে ধর্মঘট ভাঙার সেই চেষ্টা প্রতিহত করেন। জঙ্গি শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। আইনজীবী কিশোরীলাল কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই শ্রমিকদের হয়ে মামলা লড়তেন। 'বাউড়িয়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এর সম্পাদক ছিলেন রাধারমণ মিত্র (১৮৯৭-১৯৯২)। বাউড়িয়া জুটমিল শ্রমিকদের দীর্ঘ ছ'মাসব্যাপী ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৮]

১৯২৭-১৯২৮ এ চেঙ্গাইল এবং বাউড়িয়ায় চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটে মিলমালিকরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারও বিচলিত হয়ে ওঠে। ১৯২৯-এর জুলাই-আগস্ট মাসে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আব্দুল মোমিন (১৯০৬-১৯৮৩)। তিনি ছিলেন 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এর সভাপতি। শ্রমের সময় ও কাজের চাপ বাড়ানো এবং দু' শিফটের জায়গায় এক শিফট চালু করে ষাট হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে চটকল শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন। বাড়তি কাজের জন্য

উপযুক্ত মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটে জগদ্দল, ভাটপাড়া এবং কাঁকিনাড়ার চটকলগুলি অচল হয়ে গিয়েছিল। ধর্মঘটে থেমে যায় কলকাতা থেকে হালিশহর পর্যন্ত সমস্ত চটকলের কাজ। ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার। শত শত শ্রমিক, ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী কর্মীতে রূপান্তরিত হন পরে ১৯৩৭-এ চটকল শ্রমিকদের দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘটে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৮-এ তিনি 'বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন' এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৯]

১৯৩৭ এর বাংলার চটশ্রমিকদের দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘটের আর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন রজনী মুখার্জি। তিনি ছিলেন 'সারা বাংলা চটশ্রমিক কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি'র প্রচার সচিবের দায়িত্বে। পরে ১৯৪১-এ গঠিত 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার' –এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। আর একজনের কথাও উল্লেখ্য যিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণে। তিনি বাংলার 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজ্যান্ট পার্টি'র অন্যতম সংগঠক বিপ্লবী ধরণী গোস্বামী (১৮৯৮-১৯৮৮)।[১০] বাউড়িয়ায় চটকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের পুরোভাগে ছিলেন তিনি। সামলেছিলেন 'ভাটপাড়া বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সংগঠন' এর সহ-সভাপতির দায়িত্বও। চটকল শ্রমিকদের জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন ধরণী। আর ধরণী গোস্বামীর সহযোগী গোপেন চক্রবর্তী (১৮৯৮-১৯৯৪) ছিলেন 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এর ভাটপাড়া এবং হাজিনগর শাখার সম্পাদক।[১১] ১৯২৮-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে শ্রমিকদের বিশাল মিছিলের পেছনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক।

চটকল শ্রমিক আন্দোলনে আর এক ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী। শ্রমিকদের পত্রিকা 'নয়া মজদুর'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর এবং কখনও বা অন্যদের বলিষ্ঠ কলমে চটশ্রমিকদের জীবনসংগ্রামের চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে সেখানে।

ব্যারাকপুর অঞ্চলের চটকল শ্রমিকদের প্রধান সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওপার বাংলার কুষ্টিয়া জেলায় 'মোহিনী মিল' শ্রমিকদের ধর্মঘটী আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।[১২] শ্রমদরদী এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব রূপে শ্রমজীবী সমাবেশে আশ্চর্য পোশাকে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গান গেয়ে লোক জমায়েতের চেষ্টা করতেন নিত্যানন্দ চৌধুরী।

এই তালিকায় কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় করা হবে। চটশ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন বিমলপ্রতিভা দেবী (১৯০১-১৯৭৮)। যুক্ত ছিলেন তাঁদের ট্রেডইউনিয়নের সঙ্গে।[১৩] সুধা রায়ও (১৯১১-১৯৮৭) যুক্ত ছিলেন চটশিল্প শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে। ব্রিটিশ আমলে চটশ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তিনি 'চটকল মজদুর ইউনিয়ন' এর সম্পাদকও হন।[১৪] 'সারা বাংলা চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন'-এ যোগদানের মধ্য দিয়েই প্রভাবতী দাসগুপ্ত (১৮৯২-১৯৭৬) চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন এই ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি।[১৫] ১৯২৯-এ ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘট পরিচালনায় প্রভাবতী অর্থ এবং সামর্থ্য দিয়ে পাশে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বে ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের একটা নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু তার পরেও অনেক মিল কর্তৃপক্ষ শর্ত লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের প্রতারণা করায় নতুন করে সমস্যা দেখা দেয়, যা আবার নতুন ধর্মঘটের জন্ম দেয়। ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে প্রভাবতী টিটাগড় চটকলে ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন।[১৬]

তবে চটশ্রমিকদের মধ্যে প্রথম যে নেত্রী কাজ করেছিলেন তিনি বোধহয় সন্তোষকুমারী দেবী (১৮৯৭-১৯৮৯)। ১৯২২ সালে তিনি গৌরীপুর জুটমিলে প্রথম

শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন সেখানকার সাহেব ম্যানেজারের জুলুমের বিরুদ্ধে।[১৭] তিনি চব্বিশ পরগনায় নৈহাটির কাছে গরিফায়, তাঁর পৈতৃক বাড়ির কাছে চটকল শ্রমিকদের সংগঠন 'গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি' গড়ে তোলেন।[১৮] তিনিই ছিলেন সংগঠনের সভাপতি। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কামারহাটি থেকে বজবজ, বাউড়িয়া থেকে গৌরীপুর প্রধানত চটকল শ্রমিকদের মধ্যে তিনি সভা করেছেন, ইউনিয়ন গড়েছেন, ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছেন, নৈশ বিদ্যালয় খুলেছেন, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় 'শ্রমিক' নামে এক পয়সা দামের পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।[১৯]

শুধু বহিরাগত নেতৃত্ব নয়, চটশ্রমিক রূপে জীবন শুরু করে তাঁদেরই লড়াইয়ের মুখ হয়ে উঠেছিলেন এক নারী। তিনি দুখমৎ দিদি। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর থেকে জীবনের যাত্রা শুরু করে তিনি মিশে গিয়েছিলেন বরানগরের চটকল শ্রমজীবীদের জীবনস্রোতে। ১৯৩৭-এর বাংলার চট শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে বরানগরের প্রায় সাতশো মহিলা শ্রমিককে সংগঠিত করেছিলেন তিনি।[২০] ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে দুখমৎ কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের মাঝে শুরু করেন তাঁর সক্রিয় কার্যকলাপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর সহজ অথচ জ্বলাময়ী বক্তব্য মেয়েদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৬ সালে কয়েকজন শ্রমিক বন্ধুর সাহায্যে তিনি বরানগর চটকলেই গড়ে তোলেন ইউনিয়ন। পরবর্তী কালে ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে কলকাতায় চটকল মালিকদের দপ্তর ঘেরাওয়ের পুরোভাগে ছিলেন দুখমৎ দিদি।[২১] জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের খাওয়া-পরা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। শ্রমিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা দুখমৎ দিদির এই চোয়াল-চাপা অদম্য সংগ্রামের কাহিনী আমরা ক'জন জানি?

চাকরির সুরক্ষার পরোয়া না করে ও বহু ক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করেও যে ট্রেডইউনিয়ন নেতা ও নেত্রীরা এক ঐতিহাসিক সময় জুড়ে জুটমিল আন্দোলনের পুরো ভাগে থেকেছেন সেই তিমিরবিনাশী মানুষেরাই উঠে এসেছেন সমসাময়িক শিল্প সাহিত্য, নাটক, সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে। জুটমিলের অগ্নিগর্ভ জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের দিনগুলির পটভূমিকাতেই ৭০ দশকের শেষ পর্যায়ে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর কালজয়ী চলচিত্র 'চোখ'।[২২] ট্রেডইউনিয়ন নেতা যদুনাথের চোখ দিয়ে উৎপলেন্দু একদিকে দেখিয়েছেন হার না মানা শ্রমিকের রণজয়ী ইতিহাস, সমাজের মধ্যবর্গের দোদুল্যমানতা আর অন্যদিকে কারখানার মালিকের শ্রেণীঘৃণা যা তার সমস্ত আদিমতা নিয়ে বয়ে চলেছে এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বুকে। কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর সুবিখ্যাত রচনা 'গান্ধীনগরে এক রাত্রি'তে সেই সময়ের এক অপূর্ব দলিল হিসাবে গেঁথে রাখেন চটকলের ছকুমিঞার আগ্নেয় বয়ান যার ভাষা শৈলী আবেদন সব কিছুই ছাপিয়ে যায় মধ্যচিত্ত সীমারেখা।[২৩] গ্রাম ছেড়ে ঘর ছেড়ে সব হারিয়ে নিরন্ন ভাগচাষীর শহরে একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে থেকেছে জুটমিল আর তাই স্বাভাবিক ভাবে সমসাময়িক শিল্প সাহিত্য নাটক ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিটি ক্ষেত্রই হয়ে উঠেছে পাট মজুরের যন্ত্রণার চালচিত্র। গুরুদাস পালের একাধিক গানে সেই বেদনার ভাষ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে বারবার;[২৪] সমরেশ বসুর একাধিক রচনার পরিপ্রেক্ষিত হয়ে উঠেছে মিশ্র জাত ও ধর্মসমন্বিত চটকলের বস্তি। বারবার যে বস্তি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন আগুনে আবার সেই আগুনের শিখা ভেদ করে নিজের শ্রেণীর গরীব মানুষের পাশেই সংহত হয়েছে চটকলের সন্তান; সমস্ত ধর্মীয় উস্কানিকে পরাস্ত করে চিনেছে তার প্রকৃত শত্রু ও বন্ধুকে।[২৫] শুধু সেকালে নয় একালেও জুটশ্রমিকের আন্দোলনের সংহতিতে ঝলসে উঠেছে বুদ্ধিজীবীর কলম। কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিক বস্তিতে

কানোরিয়ার শ্রমিকের পাশে নতজানু হয়ে গান ধরেছেন কবীর সুমন।[২৬] এক শতাব্দী ধরে হুগলী নদীর দুই পাড় ধরে বেড়ে ওঠা অসংখ্য জুটমিল ও তার আলোহীন শ্রমিক বস্তি ঘিরে কখনো ধারাবাহিক আবার কখনো বা হঠাৎ-ই ঝলসে ওঠা লড়াই ও যন্ত্রণার ইতিকথা বাংলার সাংস্কৃতিক বীক্ষাকে পথ দেখিয়েছে বারবার; যে পথে আলো জ্বেলে কখনো বা দাঁড়িয়ে আছে ভিখারী পাশোয়ান কখনো অন্য কেউ।

যতদূর জানা যায় পাটকল শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৮৫৪ সাল থেকে। একশত পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন অগণিত শ্রমিক। কিন্তু সেই পরিবেশ কী অধুনা পশ্চিমবঙ্গে আছে? শ্বেত শুভ্র চাপা সন্ত্রাস আজ সর্বত্র। সন্ত্রাসের বলির কয়েকটি নমুনা...

১৯৯০ সালে ২১ সেপ্টেম্বর গৌরীশংকর জুট মিলে বকেয়া গ্র্যাচুয়িটির দাবিতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের আন্দোলন চলাকালীন শ্রমিক রাজেশ্বর রাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১৯৯৩ সালের ২১ অক্টোবর ভিক্টোরিয়া জুট মিলে শ্রমিক বিক্ষোভের পর থেকে নিখোঁজ ভিখারী পাশোয়ান। ২০০০ সালের ২০ জুন গ্যাঞ্জেস জুট মিলে সোমেশ্বর রাও আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ২০০১ সালের ১৩ জানুয়ারি বরানগর জুট মিলে কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত বন্দুকের গুলিতে নিহত ভোলা দাস।[২৭]

চিত্র - ৩[২৮]

উপরের চিত্র গোন্দলপাড়া শ্রমিক বাসস্থানের অন্দরমহল

তালিকা – ১[২৯]

অসংগঠিত শ্রমজীবী

সারণী:-২.১.১ **অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০ (পশ্চিমবঙ্গ)**

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০ (পশ্চিমবঙ্গ)									
	গ্রাম			শহর			মোট		
উদ্যোগ ও কর্মসংসংস্থান	গ্রাম স্বনিয়োজিত প্রকল্প	প্রতিষ্ঠান	মোট	গ্রাম স্বনিয়োজিত প্রকল্প	প্রতিষ্ঠান	মোট	স্বনিয়োজিত প্রকল্প	প্রতিষ্ঠান	মোট
উদ্যোগ (লক্ষ)	৩৩.১৩	১.১১	৩৪.২৪	১৩.২৫	৩.১৭	১৬.৪২	৪৬.৩৮	৪.২৮	৫০.৬৬
কর্মসংস্থান (লক্ষ)	৪৫.৯৪	৪.৫২	৫০.৪৬	১৭.৭০	১২.৭৩	৩০.৪৩	৬৩.৬৪	১৭.২৪	৮০.৮৮

সূত্র: জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড

সংগঠিত ক্ষেত্র: ভারতবর্ষে সংগঠিত ক্ষেত্র বলতে বোঝায় যে ক্ষেত্রের বা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক তথ্য বাজেটের নথীতে, বাৎসরিক রিপোর্টে পাওয়া যায়। রেজিষ্টার্ড সংস্থার ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাষ্ট্রিজ- এর রিপোর্টে পাওয়া যায়।

অসংগঠিত ক্ষেত্র: অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোন তথ্য ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায় না বা তথ্য ধারাবাহিক ভাবে কোন আইনি প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হলেও তা রাখা হয় না।

উদ্যোগ: যে উদ্যোগে উৎপাদন, বণ্টন বা পরিষেবা প্রধান উদ্দেশ্য (নিজ প্রয়োজনে নয়) তাকে প্রতিষ্ঠান বলা হচ্ছে।

পরিবার ভিত্তিক উদ্যোগ: যেখানে উৎপাদনে শুধুমাত্র একটা পরিবারের শ্রম নিয়োজিত হচ্ছে।

তালিকা– ২[৩০]

সারণী: - ২.১.২ অসংগঠিত উৎপাদনী ক্ষেত্র

অসংগঠিত উৎপাদনী ক্ষেত্র													
		গ্রাম				শহর				মোট			
রাজ্য/ দেশ সাল	উদ্যোগ কর্মী	স্বনির্ভরপ্রকল্প (লাখ)	ছয় জনের কম কর্মী কাজ করে (লাখ)	ছয় জনের বেশী কাজ করে (লাখ)	মোট (লাখ)	স্বনির্ভরপ্রকল্প (লাখ)	ছয় জনের কম কর্মী কাজ করে (লাখ)	ছয় জনের বেশী কাজ করে (লাখ)	মোট (লাখ)	স্বনির্ভর প্রকল্প (লাখ)	ছয় জনের কম কর্মী কাজ করে (লাখ)	ছয় জনের বেশী কাজ করে (লাখ)	মোট (লাখ)
পশ্চিমবঙ্গ ২০০০-০১	উদ্যোগ	২০.০০	০.৯১	০.৩৩	২১.২৪	৪.৮৫	১.২৩	০.৪০	৬.৪৮	২৪.৮৫	২.১৪	০.৭২	২৭.৭১
	কর্মী	৩৭.৬৮	২.৮৬	৩.৬২	৪৪.১৬	৬.৯৫	৪.০০	৩.৫৭	১৪.৫২	৪৪.৬৩	৬.৮৫	৭.২০	৫৮.৬৮
১৯৯৪-৯৫	উদ্যোগ	১৪.২৫	০.৮৪	০.২২	১৫.৩১	২.৩৯	১.০৭	০.৩২	৩.৭৮	১৬.৬৪	১.৯১	০.৫৪	১৯.০৯
	কর্মী	২৮.৯৩	২.৫০	২.২৬	৩৩.৭০	৪.১৭	৩.৩৮	২.৫৪	১০.১০	৩৩.১০	৫.৮৮	৪.৮০	৪৩.৮০
ভারত ২০০০-০১	উদ্যোগ	১১০.৫৮	৬.৩	২.৪৭	১১৯.৩৫	৩৬.০৭	১০.৮২	৪.০০	৫০.৯০	১৪৬.৬৫	১৭.১২	৬.৪৭	১৭০.২৪
	কর্মী	১৯১.৪৭	১৯.৩৩	২৯.০৬	২৩৯.৮৬	৫৯.১৪	৩৬.২৯	৩৫.৫২	১৩০.৯৫	২৫০.৫১	৫৫.৬২	৬৪.৫৮	৩৭০.৮১
১৯৯৪-৯৫	উদ্যোগ	৯৫.৩৫	৬.৬৮	২.৯৪	১০৪.৯৭	২৭.১৫	৯.৩০	৩.৬০	৪০.০৭	১২২.৫০	১৫.৯৮	৬.৫৪	১৪৫.০৪
	কর্মী	১৭৮.৪৫	১৮.২৫	২৪.৫২	২২১.২৬	৪৮.১৭	৩০.৫৭	৩২.০৩	১১০.৭৭	২২৬.৬২	৪৮.৮২	৫৬.৫৫	৩৩২.০৩

সূত্র: জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫১ তম এবং ৫৬ তম রাউন্ড ১৯৯৪-৯৫, ২০০০-০১

তালিকা– ৩[৩১]

সারণী:- ২.১.৩ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ (পশ্চিমবঙ্গে)

বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ (পশ্চিমবঙ্গে)			
	মোট উদ্যোগের শতকরা হিসেবে		
বিভাগ	গ্রাম	শহর	মোট
হিসাব নিয়মিত বজায় রাখে	২.৬	৬.৩	৩.৮
অন্য কোন এজেন্সির সাথে সম্পর্কিত (রেজিষ্টার্ড)	৫.৯	৩২.১	১৪.৪
চুক্তিতে কাজ করে	৩০.২	১৮.৬	২৬.৪
মহিলাদের মালিকানায় চলে	২২.৫	৮.৯	১৮.১
বছরে একটা নির্দিষ্ট মরসুমে কাজ হয়	৩.৫	১.১	২.৭
বাড়ির মধ্যেই অবস্থিত	৫৭.১	২৮.৩	৪৭.৮

সূত্র: জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড ১৯৯৯, ২০০০

তালিকা– ৪[৩২]

সারণী: -২.১.৪ অসংগঠিত ক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ)

অসংগঠিত ক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ)		
ক্ষেত্র	মোট কর্মসংস্থান (লাখ)	উদ্যোগের সংখ্যা (লাখ)
উৎপাদণী ক্ষেত্র	৩৯.৫৩	২০.৬৬
নির্মান	২.০৩	১.৫০
ব্যবসা ও রিপেয়ারিং সার্ভিস	২৪.১৮	১৭.২৪
হোটেল	২.৮৭	১.৫২
পরিবহণ, স্টোরেজ এবং যোগাযোগ	৬.৬৯	৫.৮৬
আর্থিক পরিষেবা	০.১৩	০.১২
জমি বাড়ির বিক্রি ও ব্যবসা	০.৯৫	০.৫৪
শিক্ষা	১.৫৫	০.৯২
স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা	০.৯০	০.৭৫
অন্যান্য	২.০৫	১.৫০
মোট	৮০.৮৮	৫০.৬৬

সূত্র: জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড, ১৯৯৯-২০০০

তালিকা– ৫[৩৩]

সারণী:- ২.১.৫ শিশু শ্রমিকের সংখ্যা

শিশু শ্রমিকের সংখ্যা		
রাজ্য	১৯৮১ (লাখ)	১৯৯১ (লাখ)
পশ্চিমবঙ্গ	৬.০৫	৭.১২
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৯.৫১	১৬.৬২
বিহার	১১.০২	৯.৪২
গুজরাট	৬.১৭	৫.২৪
কর্ণাটক	১১.৩২	৯.৭৬
কেরালা	.৯৩	.৩৫
মধ্যপ্রদেশ	১.৭০	১৩.৫২
মহারাষ্ট্র	১৫.৫৮	১০.৬৮
উড়িষ্যা	৭.০২	৪.৫২
উত্তর প্রদেশ	১৪.৩৫	১৪.১০

সূত্র: শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট, ২০০০

তালিকা– ৬[৩৪]

সারণী:- ২.১.৬ জাতীয় শিশু-শ্রম প্রজেক্টের অনুমোদিত সংখ্যা

জাতীয় শিশু-শ্রম প্রজেক্টের অনুমোদিত সংখ্যা				
ক্ষেত্র	স্কুল	শিশু	স্কুল	শিশু
১. অন্ধ্র প্রদেশ (২২)	৯৭৫	৬১০৫০	৯৮৪	৬৩৯৯১
২. এবং ৩.ঝাড়খন্ড যুক্ত বিহার (৪)	১৯৪	১২২০০	১৮৭	১১২৬৮
৪. কর্ণাটক (৩)	১১০	৫৫০০	৬৯	৩০১৮
৫. এবং ৬. ছত্তিশগড় যুক্ত, মধ্যপ্রদেশ (৪)	২৩৭	১৪৫০০	১১৯	৬৩০৯
৭. মহারাষ্ট্র (২)	৭৪	৩৭০০	৬১	৩১৮৪
৮. উড়িষ্যা (১৮)	৬১৪	৩৬৭৫০	৫৮০	৩৪৬২০
৯. রাজস্থান (৬)	১৮০	৯০০০	১৩৬	৬৮০০
১০. তামিলনাড়ু (৯)	৪২৫	২১৯০০	৪০৭	২০৯৮৬
১১. উত্তর প্রদেশ (১১)	৩৭০	২২৫০০	২৭০	১৬৯৮৭
১২. পশ্চিমবঙ্গ (৮)	৩৪৬	১৭৩৫০	২৭৭	১৩৮৪১
১৩. পাঞ্জাব	২৭	১৩৫০	০	০
মোট	৩৫৫২	২০৫৮০০	৩০৯০	১৮১০০৪

সূত্র: বার্ষিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রক, ২০০০-২০০১

তালিকা– ৭[৩৫]

সারণী:- ২.১.৭ **অসংগঠিত ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তায় প্রভিডেন্ড ফান্ড (পশ্চিমবঙ্গ)**

অসংগঠিত ক্ষেত্রে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত (লাখে)	মোট আবেদন জমা পড়েছে অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত	মোট নথিভুক্ত সুবিধা প্রাপ্তদের সংখ্যা অক্টোবর ২০০২	মোট টাকা জমা পড়েছে অক্টোবর ২০০২ (লাখে)	২০০২ এর মধ্যে আবেদন জমা নেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা (লাখ)	মোট অসংগঠিত শ্রমিকদের সুবিধা প্রাপ্তদের শতাংশ
৮০.৮৮	৪.১৮	৩.২৮	২৫৬.২৬	৫.৫৯	৪.০৬%

সূত্র: সার্ভে রিপোর্ট নিজস্ব

২.৩ ফেরারি ফৌজ*:* স্থায়ী থেকে অস্থায়ী যাপনের মাঝে জুটমিলের মেহনতি

চটকল লাগোয়া শ্রমিক বস্তি গুলো যেন অন্য ভুবন। আলোহীন, বাতাসহীন, কোথাও কোথাও জলহীন, শ্রীহীন এই বস্তিগুলোতে কর্মহীন অথবা অধিক কর্মে শ্রমিকরা ধুঁকছে, ধুঁকছে তাদের পরিবার। অন্ধকারে ডুবে থাকা এই শ্রমিকদের ইতিহাস এক উজ্জ্বলতা থেকে অন্ধকারে যাবার ইতিবৃত্ত নয়, অন্ধকার থেকে যেন আরও অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার ইতিহাস।[৩৬]

একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে এই চটশিল্পে বৈভব এসেছে, প্রাচুর্য এসেছে, শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু শ্রমিকের দুর্দশা ও সংকট যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে চটকলগুলির শ্রমিকদের গড় বেতন ছিল ১৫ টাকা দুইপয়সা। তুলনায় বোম্বে ও আমেদাবাদের সুতা কলের শ্রমিকদের গড় বেতন ছিল যথাক্রমে ২৩ টাকা ৭১ পয়সা এবং ২৩ টাকা ২১পয়সা।[৩৭]

স্বাধীনতার ঠিক পরে ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন আমরা দেখি ৪৬ টাকা (১৮টাকা বেসিক + ২৮ টাকা ডি.এ.)। এই শিল্পে প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় ১৯৪৮ সালে। এই ট্রাইব্যুনাল অভিমত দেয় লিভিং ইনডেক্স ৩২৫ ধরে, চটকল শ্রমিকদের মাইনে চাওয়া উচিৎ ৭১ টাকা। মালিকদের সংগঠন (আই.জে.এম.এ.) এটা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত মাইনে নির্ধারিত হয় ৫৮ টাকা (২৬টাকা মূল বেতন + ৩২ টাকা মহার্ঘ্যভাতা)।[৩৮] তবে মেনে নিতে হল সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার কাজকে। সাপ্তাহিক কাজের সময় যেই নামিয়ে আনা হল ৪২ ঘন্টায়, বেতন নেমে এলো ৫২টাকা ১২ পয়সায়।

১৯৫১ সালে গঠিত দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল ৬৩ টাকা ৬০ পয়সা বেতন দেবার জন্যে সুপারিশও করে। এই সুপারিশও মালিকরা যথারীতি মেনে নেয় না। মাইনে রফা হয় ৫৬টাকা।[৩৯]

এই ট্রাইব্যুনাল গুলির অভিমত অনুযায়ী যে ন্যূনতম বেতন কার্যকরী হয় তা কেবল মাত্র স্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। যে সব শ্রমিক উইন্ডিং, উইভিং, বীমিং এবং সিউয়িং বিভাগে কাজ করে পিস রেটে তাদের ক্ষেত্রে কোনো নতুন বেতনক্রম চালু হয় না। ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বেতন নির্ধারণের এই যে রীতি তা শেষ হয় ১৯৬৩ সালে, "জুট ওয়েজেস বোর্ড" (jute wages board) গঠনের মাধ্যমে।[৪০] ট্রাইব্যুনালের সুপারিশে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটা মালিকপক্ষ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত যে বেতন নির্ধারিত হচ্ছিল তা সুপারিশের পরিমাণের থেকে কম।

১৯৬৮ সালে চটশিল্পের সংকটের ওপর একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চটকলের মালিকরা প্রায় সকলেই শ্রমিকদের বেতনের পরিমাণে তাদের আপত্তির কথা জানান,

এই শিল্পের সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে শ্রমিকদের অতিরিক্ত বেতনকে অনেকেই চিহ্নিত করেন। মালিকদের এই বেতন দিতে অনীহার জন্য শ্রমিকদের লড়াই করেই সব আদায় করতে হয়েছে।[৪১]

লক্ষণীয় হল ১৯৯৬ তে জুটশিল্পে শেষ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। এবং চুক্তির পরে স্বাক্ষরকারী এমন মিলগুলিতেও নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হয় না। চুক্তির মেয়াদ শেষে জুটমিল কর্তৃপক্ষ এবং আই.জে.এম.এ-র পক্ষে জানানো হলো তাঁরা শিল্পভিত্তিক চুক্তিতে আর রাজী নন এবার তাঁরা উৎপাদন ভিত্তিক (শ্রমিক পিছু) বেতন কাঠামো করতে চান। মিলভিত্তিক চুক্তির সপক্ষে স্থানীয় স্তরে শ্রমিক সংগঠন ভাঙ্গা-গড়ার মাধ্যমে সমর্থন/বিরোধিতার এক নৈরাজ্য পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হল। চটশিল্পে বাণিজ্যিক সংকট যত বাড়ল, ততোই কমেছে শ্রমিকের লড়াইয়ের তীব্রতা, বেড়েছে মালিকের বঞ্চনা আর শোষণ।[৪২] আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা উল্লেখ করেছি যে চটশিল্পের বাণিজ্যিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার যে সব বিকল্প সম্ভাবনাগুলি মালিকদের সামনে ছিল, যেমন শিল্পের আধুনিকীকরণ, শুধুমাত্র এক ধরনের উৎপাদন তৈরি না করে আরও ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন তৈরি করে নতুন নতুন বাজারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো ইত্যাদি- মালিকরা সে পথে না গিয়ে কিন্তু বেছে নিলো সবচেয়ে সহজ পথটিই- শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারে থাবা বসিয়ে সংকট থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা।[৪৩]

আশির দশকের প্রথম দিকে চটশিল্পে সংকটের মোকাবিলার নামে সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃপক্ষ বেছে নিয়েছিল সহজ উপায়- শ্রমিকের মজুরী সংকোচন। নব্বই-এর দশক জুড়ে শুরু হল সংকটের ধুয়ো তুলে মিল বন্ধ করে চাপ সৃষ্টি করে কাজের বোঝা বাড়ানো। ১৯৫১ থেকে ১৯৯১ এই ৪০ বছরে কাজের বোঝা বেড়েছিল ১৫০%, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এই পাঁচ বছরে কাজের বোঝা বেড়েছে ৬০০% শতাংশ।[৪৪] এমনকি ট্রেনি

নাম দিয়ে বিনা মজুরীর মজুর নিয়োগ চলতে থাকল। পাশাপাশি চটের সেলাই বিভাগে বা কাঁচা পাট বাছাই করার কাজে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মচারী হটিয়ে কম টাকায় কন্ট্র্যাক্ট প্রথায় শ্রমিক নিয়োগ চললো। স্থায়ী শ্রমিকদের যেহেতু বেতন, সামাজিক নিরাপত্তার অনেক কিছুই চুক্তিসাপেক্ষ এবং অবশ্য পালনীয়, তাই মালিকরা সচেষ্ট হল চটকলগুলিতে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দিতে।[৪৫] স্থায়ী শ্রমিকদের বদলে চটকল গুলি ভর্তি হয়ে উঠতে লাগল বিচিত্র সব নামের শ্রমিক দিয়ে যেমন-

স্পেশাল বদলী– ২২০ দিন কাজ পেতে পরে। বেতন ছাড়া শুধুমাত্র পি.এফ-এর সুযোগ পায়। স্থায়ী শ্রমিকদের মতো আর কোনো সুযোগ পায় না।

ভাউচার শ্রমিক - নিয়মিত পে রোলে এদের নাম নেই। সমস্ত বেতনটাই ভাউচারে হয়। পি.এফ ও ই.এস.আই. এবং অন্যান্য সুযোগ পায় না।

জিরো নাম্বার- অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পি.এফ. এর টাকা, গ্র্যাচুইটি টাকা না পেয়ে প্রতিদিনের রুটিরুজির সংস্থানে নাম লেখায় জিরো নাম্বারে। শুধুমাত্র দৈনিক বেতনই এদের ভরসা। ই.এস.আই. বা পি.এফ. অথবা অন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা এরা একদমই পায় না। এদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম। বরানগর চটকলে চুক্তির ধারা অনুযায়ী এদের বলা হয় ৪বি। জিরো নাম্বার ওয়ার্কার বলতে অনেকেই শুধু বোঝেন শ্রমিক বঞ্চনার বিষয়টি। পাশাপাশি তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে এই জিরো নাম্বার ওয়ার্কার যে উৎপাদন করে তার কোন রেকর্ড থাকে না। একই ভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচা পাটের হিসেবও হিসাব বহির্ভূত থেকে যায়। বঞ্চনা শুধু শ্রমিকের নয়, এটা শুধু শ্রম আইন না মানার ঘটনা নয়, সরকার ও নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ রাজস্ব কর আদায় এই কায়দায় ফাঁকি পড়ে। গড়ে ওঠে কালো টাকাকে ঘিরে সমান্তরাল এক আর্থিক অনাচারের ব্যবস্থা।

ভাগাওয়ালা- চটকল ছাড়া এই ভাগাওয়ালা প্রথা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ বাড়ছে, বিশেষ করে জিরো নাম্বার শ্রমিকদের কাছে এই কাজের চাপ অসহনীয়। নিজের বেতন থেকে সামান্য কিছু দিয়ে শ্রমিকরাই নিজের বরাদ্দ কাজটি তুলে নেবার চেষ্টা করে। ভাগাওয়ালা শ্রমিকদের যেহেতু অফিস রেকর্ডে বেতন স্বীকৃতি নেই তাই কোন রকম দুর্ঘটনা বা বিপদের দায় থেকে মালিকেরা নিজেদের মুক্ত করে রেখেছে।

ট্রেনী- এই সব ধরণের শ্রমিক ছাড়াও আরেক ধরণের শ্রমিক ট্রেনী নাম দিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। পাঁচ বছরের চুক্তিতে সত্তর টাকা রোজে (যেমন হুকুমচাঁদ, বরানগর, হনুমানে)।

কন্ট্রাক্ট লেবার- এদের সংখ্যা চটশিল্পে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এদের শুধুমাত্র ইএসআই দিলেই হয়।

মোট উৎপাদনের ব্যয়ে মজুরীর অংশ ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে ছিল ৫১%, ১৯৯২-১৯৯৩ সালে ৩৯%, ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে ২৭%।[৪৬] চটশিল্পে মজুরীর প্রশ্নে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য মোড় নিয়েছে ১৯৯২ সালে। এই সময়ে চটশিল্পে যে ধর্মঘট হয় সেই ধর্মঘটে মিলভিত্তিক স্থানীয়ভাবে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়, সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে 'কাটাউতি' নামে নতুন প্রথা চালু হয়। চটকলগুলি লোকসানে চলছে এই অজুহাতে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে একটা অংশ কেটে রাখা হতে থাকে।

আমরা যে সর্বগ্রাসী অন্ধকার শব্দটি ব্যবহার করেছি তা শুধুমাত্র শব্দের অলঙ্কার নয়। নিষ্করুণ সত্য। চটকল লাগোয়া যে বস্তি (যাকে কোয়ার্টার বলা হয়) তার চারিপাশে একটু ঘোরাফেরা করলেই বোঝা যায় এই কথাটা কতটা বাস্তব। বেশীরভাগ শ্রমিক বস্তিতে পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা শোচনীয়, হাজার মানুষের প্রতিদিনের মলমূত্র ত্যাগের কাজ

চলে নামমাত্র কয়েকটি পায়খানায়। তাও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। চটকলগুলি লকআউট বা ধর্মঘটে বন্ধ থাকলে এগুলো পরিষ্কারই হয় না। নৈহাটির কাছে ক্যাভেন্ডার জুটমিল বন্ধ থাকার সময়ে দেখেছি শ্রমিক বস্তি থেকে মলমূত্রের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। না আছে মালিকের হুঁশ, না পৌর কর্তৃপক্ষের হুঁশ। বরানগর চটকলে গিয়ে দেখেছি বর্ষাকালে বিশুদ্ধ জলের অভাবে পেটের ভয়ঙ্কর অসুখ সম্বৎসরে নিয়ম। ময়লা, ড্রেনের পচা জল, মলমূত্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে প্রতিদিন হাজার মানুষ; শিশুরাও বেড়ে উঠছে এই পরিবেশে। এ এক নরক দর্শন! মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা যেমন শ্রমিকরা ক্রমশ হারাচ্ছে তেমনই হারাচ্ছে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারকেও।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শ্রমিকদের মধ্যে অসচেতনতার অভাবও এই নারকীয় পরিবেশের জন্যে অনেকটাই দায়ী। ইউনিয়নগুলির কর্মসূচীর মধ্যে মজুরী বৃদ্ধির কথা যেভাবে এসেছে সেভাবে উঠে আসেনি সুস্থ পরিবেশে বাঁচার অধিকারের কথা (অবশ্য এই সমস্যাটি শুধুমাত্র চটকলেই নয় অন্যান্য শিল্পেও শুধুমাত্র মজুরী প্রশ্ন ছাড়া স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বা বিষয় খুব একটা গুরুত্ব পায়নি)। এর সাথে পাটশিল্পে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক অশিক্ষা যার জন্য গড়ে ওঠেনি কোনো রকম স্বাস্থ্য সচেতনতা। এছাড়া চটকল শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশ ভিন রাজ্যের হওয়ায়, তারা বছরের একটা বড় সময় দেশে থাকে ক্ষেতি-জমিতে চাষ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কুলী লাইনের বাসস্থান হয়ে পড়ে তার এক অস্থায়ী ঠিকানা যেখানে সে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় দিনগত পাপক্ষয় করে কাটিয়ে দেয়। ফলতঃ বাসস্থানের স্বাস্থ্য বিষয়টি তার কাছে হয়ে পড়ে গৌণ।

চিত্র- ৪[৪৭]

তালিকা- ৮[৪৮]

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা / শ্রমিক ও কর্মসংস্থান

সারণী-২.১.৮ **মোট জনসংখ্যা ও শ্রমজীবী মানুষ**

মোট জনসংখ্যা ও শ্রমজীবী মানুষ						
বিষয়		সাল				
	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	বৃদ্ধির হার (%) ১৯৮১ থেকে ১৯৯১	বৃদ্ধির হার (%) ১৯৯১ থেকে ২০০১
মোট জনসংখ্যা (লাখ)	৫৪৫.৮১	৬৮০.৭৮	৮০২.২১	৯১২.৭৬	২৪.৭৩	১৭.৪৮
মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা	১৬৪.৬৫	২১৯.১৫	২৯৫.০৩	৩৪৭.৫৬	৩৩.১০	৩৪.৬২
অনুপাত মোট জনসংখ্যায় (লাখ)	৩০.১৭%	৩২.২০%	৩৬.৭৭%			
মোট মুখ্য শ্রমজীবীর সংখ্যা (লাখ)	১৫৪.২৫	২০৫.৮১	২৩০.৬৪	২৫৬.৮৬	৩৩.৪২	১২.০৬
অনুপাত মোট জনসংখ্যায়	২৪.২৬%	৩০.২৩%	২৮.৭৫%			
প্রান্তিক শ্রমজীবীর সংখ্যা (লাখ)	১০.৪০	১৩.৩৪	৬৪.৩৯	৯০.৬৯	২৮.২৭	৪১২.৬৭
অনুপাত মোট জনসংখ্যায়	১.৯১%	১.৯৭%	৮.০৩%			
কৃষক (লাখ)	৪৫.৯১*	৬৪.০০	৫৬.১৩	৪২.০৩	৩৯.৪	(-) ১২.৩
অনুপাত মোট শ্রমজীবী সংখ্যায়	২৯.৭৬%*	২৯.২%	১৯.০২%			
কৃ্ষি শ্রমিক (লাখ)	৩৮.৯২*	৫৫.০০	৭৩.৫১	৫৮.৬৯	৪১.৩	৩৩.৬
অনুপাত মোট শ্রমজীবী সংখ্যায়	২৫.২৩%*	২৫.০১%	২৪.৯২%			
কুটির শিল্পী (লাখ)	৫.৪২*	৯.০০	২১.৫৩	১৫.১৮	৬৬.১	১৩৯.২
অনুপাত মোট শ্রমজীবী সংখ্যায়	৩.৫১%*	৪.১%	৭.৩০%			
অন্যান্য শ্রমজীবী (লাখ)	৬৩.৯৯*	৯১.০০	১৪৩.৬৮	১৪০.৯৫	৪২.২	৫৮.১
অনুপাত মোট শ্রমজীবী সংখ্যায়	৪১.৪৮%*	৪১.৬%	৪৮.৭৬%			

সূত্র: সেন্সাস-২০০১১

*শুধুমাত্র মুখ্য শ্রমজীবী ধরা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য –

মুখ্য শ্রমজীবী-

যারা বছরে ১৮৩ দিনের বেশী কাজ পায় তাদের মুখ্য শ্রমজীবী বলা হয়।

প্রান্তিক শ্রমজীবী-

যারা বছরে ১৮৩ দিনের কম কাজ পায় তাদের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ বলা হয়।

* মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এ যে হারে বেড়েছে তার থেকে বেশী হারে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালে বেড়েছে।

* মুখ্য শ্রমজীবীর অনুপাত ১৯৮১ থেকে ১৯৯১–এ বাড়লেও ১৯৯১ থেকে ২০০১-এ জনসংখ্যার অনুপাত কমে গেছে। সেখানে মোট জনসংখ্যায় প্রান্তিক মানুষের অনুপাত অনেক বেশী বেড়েছে।

* মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা কৃষকের অনুপাত কমে গেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে, কিন্তু কৃষিশ্রমিকের অনুপাত বেড়েছে। কুটির শিল্প বা বাড়ির কারখানায় শ্রমজীবীর সংখ্যা বেড়েছে এবং অন্য শ্রমজীবীর সংখ্যা কমেছে। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে শিল্প থেকে শ্রমজীবী মানুষ চলে আসছে কৃষি ক্ষেত্রে।

তালিকা– ৯[৪৯]

সারণী:- ২.১.৯ প্রধান ও প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যা ১৯৯১ ও ২০১১

প্রধান ও প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যা ১৯৯১ ও ২০১১						
			১৯৯১			২০০১
	কর্মীদের ভাগ ও তাদের স্থিতি	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
প্রধান কর্মী (লাখ)	গ্রাম	১৩০.০	২১.০	১৫১.০	১৩৬.০	২৫.০
	শহর	৫০.০	৫.০	৫৫.০	৬০.০	৯.০
	মোট	১৮০.০	২৬.০	২০৬.০	১৯৬.০	৩৪.০
প্রান্তিক কর্মী (লাখ)	গ্রাম	২.৩	১০.৩	১২.৬	২৪.৬	৩৩.২
	শহর	০.৩	০.৮	০.৭	৪.১	২.৫
	মোট	২.৬	১০.৭	১৩.৩	২৮.৭	৩৫.৭

সূত্র: সেনসাস- ২০১১ ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতি, পরিবর্ধিত সংস্করণ

শহরে মহিলা শ্রমজীবী সংখ্যা গ্রামের থেকে বেশী হারে বেড়েছে।

তালিকা– ১০[৫০]

সারণী:- ২.১.১০ **গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন শ্রমজীবী**

গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন শ্রমজীবী											
			কুর্মীদের সংখ্যা (লাখ)					কুর্মীদের শতকরা ভাগ			
বছর এবং স্থিতি ও লিঙ্গ			কৃষক	ক্ষেত মজুর	কুটির শিল্পকর্মী	অন্যান্য	মোট	কৃষক	ক্ষেত মজুর	কুটির শিল্পকর্মী	অন্যান্য
১৯৯১	গ্রাম	ছেলে	৫৪.০	৪০.০	৪.০	৩৫.০	১৩৩.০	৪০.৬	৩০.১	৩.০	২৬.৩
		মেয়ে	৯.০	১৩.০	৩.০	৬.০	৩১.০	২৯.৯	৪১.৯	৯.৭	১৯.৪
		মোট	৬৩.০	৫৩.০	৭.০	৪১.০	১৬৪.০	৩৮.৪	৩২.৩	৪.৩	২৫.০
	শহর	ছেলে	১.০	২.০	১.২	৪৬.০	৫০.২	২.০	৪.০	২.৪	৯১.৬
		মেয়ে	-	--	০.৬	৪.০	৪.৬	---	---	১৩.০	৮৭.০
		মোট	১.০	২.০	১.৮	৫০.০	৫৪.৮	১.৮	৩.৬	৩.৩	৯১.৩
	সব মিলিয়ে	ছেলে	৫৫.০	৪২.০	৫.০	৮১.০	১৮৩.০	৩০.০	২৩.০	২.৭	৪৪.৩
		মেয়ে	৯.০	১৩.০	৪.০	১০.০	৩৬.০	২৫.০	৩৬.১	১১.১	২৭.৮
		মোট	৬৪.০	৫৫.০	৯.০	৯১.০	২১৯.০	২৯.২	২৫.১	৪.১	৪১.৬
২০০১	গ্রাম	ছেলে	৪৬.০	৫০.০	৬.৫	৫৮.০	১৬০.৫	২৮.৭	৩১.২	৪.০	৩৬.১
		মেয়ে	৯.০	২২.০	১০.৬	১৬.০	৫৭.৬	১৫.৬	৩৮.২	১৮.৪	২৭.৮
		মোট	৫৫.০	৭২.০	৭১.১	৭৪.০	২১৮.১	২৫.২	৩৩.০	৭.৯	৩৩.৯
	শহর	ছেলে	০.৫৫	১.০	২.৫	৬০.০	৬৪.০	০.৮	১.৫	৩.৯	৯৩.৮
		মেয়ে	০.০৫	--	২.০	১০.০	১২.০	০.৪	----	১৬.৬	৮৩.০
		মোট	০.৬০	১.০	৪.৫	৭০.০	৭৬.০	০.৮	১.৩	৫.৯	৯২.০
	সব মিলয়ে	ছেলে	৪৭.০	৫১.০	৯.০	১১৮.০	২২৫.০	২০.৯	২২.৭	৪.০	৫২.৪
		মেয়ে	৯.০	২২.০	১২.৬	২৬.০	৬৯.৬	১২.৯	৩১.৬	১৮.১	৩৭.৪
		মোট	৫৬.০	৭৩.০	২১.৬	১৪৪.০	২৯৪.৬	১৯.০	২৪.৮	৭.৩	৪৮.৯

সূত্র: সেনসাস- ২০১১ ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতি, পরিবর্ধিত সংস্কর

তালিকা– ১১[৫১]

সারণী:- ২.১.১১ জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা ও শ্রমজীবীর পরিসংখ্যান

জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা ও শ্রমজীবীর পরিসংখ্যান													
							মোট জনসংখ্যায় শ্রমজীবীর অনুপাত ১৯৯১				মোট জনসংখ্যায় শ্রমজীবীর অনুপাত ২০০১		
রাজ্য / জেলা	মোট জনসংখ্যা (লাখ)	মহিলা সংখ্যা প্রতি ১০০০ পুরুষে	মোট জনসংখ্যা (লাখ)	মহিলা সংখ্যা প্রতি ১০০০ পুরুষে	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে ১৯৯১ থেকে ২০১১	মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ১৯৯১	মহিলা	পুরুষ	মোট	মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ২০০১	পুরুষ	মহিলা	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	৬৮০.৭৮	৯১৭	৮০২.২১	৯৩৪	১৭.৮৪	২১৯.১৫	১১.২	৫১.৪	৩২.২০	২৯৫.০৩	৫৪.২৩	১৮.০৮	৩৬.৭৮
দার্জিলিং	১৩.০০	৯১৪	১৬.০৬	৯৪৩	২৩.৫৪	৪.৪৫	২০.১	৪৭.১	৩৪.২০	৫.৬৭	৪৮.৭৯	২০.৯৭	৩৫.২৯
জলপাইগুড়ি	২৮.০১	৯২৭	৩৪.০৩	৯৪১	২১.৫২	৯.৪৬	১৫.৬	৫০.৬	৩৩.৮০	১৩.০৬	৫২.৫৩	২৩.৩১	৩৮.৩৭
কোচবিহার	২১.৭১	৯৩৫	২৪.৭৮	৯৪৯	১৪.১৫	৬.৯৮	৯.২	৫৩.৬	৩২.১০	৯.৬৬	৫৫.০৮	২২.০৪	৩৯.০০
উঃ দিনাজপুর	১৮.৯৭	৯২১	২৪.৪২	৯৩৭	২৮.৭২	৬.৫০	১৫.৬	৫০.৬	৩৪.২৬	৯.৩৬	৫২.০৫	২৩.৭২	৩৮.৩৫
দাঃ দিনাজপুর	১২.৩১	৯৪৪	১৫.০৩	৯৫০	২২.১১	৪.২৯	২০.১	৪৭.১	৩৪.৮৯	৬.১২	৫৫.৭৯	২৪.৯২	৪০.৭৫
মালদা	২৬.৩৭	৯৩৮	৩২.৯০	৯৪৮	২৪.৭৭	৯.১৫	১৬.৮	৫১.৫	৩৪.৭০	১৩.৪১	৫২.৬৯	২৮.১৬	৪০.৭৬
মাুর্শিদাবাদ	৪৭.৪০	৯৪৩	৫৮.৬৪	৯৫২	২৩.৭০	১৪.৯৩	১০.৩	৫১.৫	৩১.৫০	২০.০২	৫১.৩২	১৬.০৮	৩৪.১৪
বীরভূম	২৫.৫৬	৯৪৬	৩০.১৩	৯৪৯	১৭.৮৮	৮.৪৬	১২.৭	৫২.৪	৩৩.১০	১১.২৭	৫৪.৪৬	১৯.৪৬	৩৭.৪২
বর্ধমান	৬০.৫১	৮৯৯	৬৯.২০	৯২১	১৪.৩৬	১৮.৫৮	৯.০	৫০.১	৩০.৭০	২৪.৫৬	৫৩.৭৬	১৫.৫৫	৩৫.৪৯
নদীয়া	৩৮.৫২	৯৩৬	৪৬.০৪	৯৪৭	১৯.৫১	১১.২৯	৫.১	৫২.০	২৯.৩০	১৬.১৭	৫৫.২৩	১৩.৮৯	৩৫.১৩
উঃ চব্বিশ পরগনা	৭২.৮২	৯০৭	৮৯.৩০	৯২৭	২২.৬৪	২০.৯৭	৫.৪	৫০.০	২৮.৮০	২৯.৮৬	৫৪.২৩	১১.০০	৩৩.৪৪
হুগলী	৪৩.৫৫	৯১৭	৫০.৪০	৯৪৭	১৫.৭২	১৩.৫৪	৮.১	৫২.১	৩১.১০	১৮.৫৭	৫৬.৭৩	১৫.৮৫	৩৬.৫৮
বাঁকুড়া	২৮.০৫	৯৫১	৩১.৯২	৯৫৩	১৩.৭৯	১৪.২৪	১৯.২	৫১.৮	৩৫.৯০	১০.০৭	৫৬.৮৯	৩১.৯৬	৪৪.৭৩
পুরুলিয়া	২২.২৫	৯৪৭	২৫.৩৫	৯৫৩	১৩.৯৬	১১.২৭	৩৪.৬	৫১.২	৪৩.২০	৯.৬১	৫২.৪২	৩৬.১১	৪৪.৪৬
মেদীনিপুর	৮৩.৩২	৯৪৪	৯৬.৩৮	৯৫৫	১৫.৬৮	৩৭.৬৫	১৭.৫	৫১.৯	৩৫.২০	২৯.৩৩	৫৪.৬১	২২.৭৯	৩৯.০৬
হাওড়া	৩৭.৩০	৮৮১	৪২.৭৪	৯০৬	১৪.৬০	১৪.৪২	৩.৭	৫১.৫	২৯.১০	১০.৫৮	৫৬.১৯	৮.৯০	৩৩.৭১
কোলকাতা	৪৪.০০	৭৯৯	৪৫.৮১	৮২৮	৪.১১	১৭.২৫	৬.৯	৫৩.৯	৩৩.০০	১২.৪৫	৫৮.৭২	১২.২৩	৩৭.৬৬
দঃ চব্বিশ পরগনা	৫৭.১৫	৯২৯	৬৯.০৯	৯৩৮	২০.৮৯	২২.৪৪	৬.২	৪৮.৮	২৮.৩০	১৬.১৭	৫২.১১	১১.৫৫	৩২.৪৮

সূত্র: সেন্সাস-২০০১

১. প্রতিহাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা কলকাতা ও হাওড়ায় উল্লেখযোগ্য রকমের কম। তার একটা কারন হল যে ঐ দুই জেলায় ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রচুর যারা তাঁদের পরিবার স্ব-স্ব রাজ্যে রেখে আসতে বাধ্য হন। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত মাত্র ১৮.০৮% শতাংশ। ১৯৯১ থেকে ২০০১-এ মহিলা শ্রমজীবীর অনুপাত ১১.২% থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮.০৮% শতাংশ। লক্ষণীয় জেলা স্তরে পুরুলিয়াতে মোট মহিলা জনসংখ্যার ৩৬.১১%, কলকাতায় ১২.২৩% হাওড়ায় ৮.৯০% ও উঃ চব্বিশ পরগনায় ১১.০০% মহিলা শ্রমজীবী হিসেবে চিহ্নিত।

তালিকা – ১২[৫২]

সারণী:- ২.১.১২ **দারিদ্রসীমার নীচে জনসংখ্যা ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০**

বছর	গ্রাম		শহর		মোট	
	জনসংখ্যা (লাখ)	মোট জনসংখ্যা শতাংশ	জনসংখ্যা (লাখ)	মোট জনসংখ্যা শতাংশ	জনসংখ্যা (লাখ)	মোট জনসংখ্যা শতাংশ
১৯৮৩	২৬৮.৬	৬৩.০৫	৫০.০৯	৩২.৩২	৩১৩.৬৯	৫৪.৮৫
১৯৮৭-৮৮	২২৩.৩৭	৪৮.৩	৬০.২৫	৩৫.০৮	২৮৩.৬১	৪৪.৭২
১৯৯৩-৯৪	২০৯.৯	৪০.৮	৪৪.৬৬	২২.৪১	২৫৮.৫৬	৩৫.৬৬
১৯৯৯-২০০০	১৫৮.০৪	২৭.২৪	৩১.০৬	১৮.৮৩	১৮৫.১	২৩.৪৩

দারিদ্রসীমার মাপঃ (মাথা পিছু মাসিক আয়ঃ টাকা)

১৯৭৩-৭৪		১৯৭৭-৭৮		১৯৮৩-৮৪		১৯৮৭-৮৮		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৯-২০০০	
গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
৫৪.৪৯	৫৪.৮১	৬৩.৩৪	৬৭.৫	১০৫.৫৫	১০৫.৯১	১২৯.২১	১৪৯.৯৬	২২০.৭৪	২৪৭.৫৩	৩৫০.১৭	৪০৯.২২

সূত্র: ১. প্লানিং কমিশন, এস্টিমেশন অফ পভার্টি

২. গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, পভার্টি এস্টিমেটস ফর ১৯৯৯-২০০০, নিউদিল্লী, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

৩. জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ২৮, (১৯৭৩-৭৪), ৩৮(১৯৮৩), ৪৩(১৯৮৭-৮৮), ৫০(১৯৯৩-৯৪), ৫৫(১৯৯৯-২০০০) তম রাউন্ড।

তালিকা – ১৩[৫৩]

সারণী:-২.১.১৩ **কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০**

স্বনিযুক্ত এবং নিয়মিত ও অনিয়মিত বেতন পায় এমন শ্রমজীবীর অনুপাত ১৯৯৯-২০০০

শ্রমজীবী মানুষ	গ্রাম		শহর		মোট	
	সংখ্যা (লাখে)	গ্রামের মোট শ্রমজীবী শতাংশ	সংখ্যা (লাখে)	শহরের মোট শ্রমজীবী শতাংশ	সংখ্যা (লাখে)	গ্রাম ও শহরের মোট শ্রমজীবী শতাংশ
১) স্বনিযুক্ত	১০৮.৭২	৫২.২	২৫.৫১	১৩.২	১৩৪.২৩	৫০.২
২) নিয়মিত বেতন ভুক	১৪.৩৭	৬.৯	২৩.৬২	৪০.০	৩৭.৯৯	১৪.২
৩) ক্যাজুয়াল বা অনিয়মিত	৫৮.১৮	৪০.৯	৯.৯২	১৬.৮	৯৫.১০	৩৫.৬

সূত্র: জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড, ১৯৯৯-২০০০

টিকা -

জনসংখ্যা ধরা হয়েছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৫ তম রাউন্ডে বা ১৯৯৯-২০০০ সালের ভিত্তিতে।

সারণী-২.৬, কর্মসংস্থান ১৯৯৯-২০০০সালে শহরে প্রতিহাজার জনসংখ্যায় মোট কর্মসংস্থান গ্রামের থেকে বেশী। কিন্তু প্রতি হাজারে মহিলা কর্মসংস্থান শহরের থেকে গ্রামে ৩৬ জন বেশী এবং পুরুষ শহরের থেকে গ্রামে ৬৩ জন কম।

সারণী- ৬, স্বনিযুক্ত এবং নিয়মিত ও অনিয়মিত বেতন পান এমন শ্রমজীবীর অনুপাত ১৯৯৯-২০০০ সালে গাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কর্মসংস্থান

সব থেকে বেশী। গ্রামীণ ক্ষেত্রে তা প্রায় অর্ধেকের বেশী, ৫২ শতাংশ। গ্রামীণ ক্ষেত্রে নিয়মিত বেতনভুক কর্মী সমস্ত শ্রমজীবীর মাত্র ৬.৯ শতাংশ, সেখানে শহরে নিয়মিত বেতনভুক কর্মী তিনগুণেরও বেশী। ক্যাজুয়াল কর্মীর শতকরা ভাগের প্রায় আড়াই গুন বেশী।

তালিকা – ১৪[৫৪]

সারণী:- ২.১.১৪ **সংগঠিত শিল্পে কর্মরত মোট শ্রমজীবী ও প্রতিষ্ঠান**

সাল	মোট			সরকারি			বেসরকারি		
	মোট কর্মসংস্থান (লাখে)	প্রতিষ্ঠান পিছু কর্মসংস্থান	প্রতিষ্ঠান	মোট কর্মসংস্থান (লাখে)	প্রতিষ্ঠান পিছু কর্মসংস্থান	প্রতিষ্ঠান	মোট কর্মসংস্থান (লাখে)	প্রতিষ্ঠান পিছু কর্মসংস্থান	প্রতিষ্ঠান
১৯৯৯	২৩.৪২	১৪৯০৪৬	১৫৬৬৯	১৫.৩১	২৫৮.৯২	৫৯১২	৮.১১	৮৩.১২	৯৭৫৬
২০০০	২২.৪৩	১৪৩.০১	১৫৬৮৪	১৪.৩৩	২৩৭.৯২	৬০২৩	৮.১০	৮৩.৮৪	৯৬৬১
২০০১	২২.৩০	১৩৩.৪৮	১৬৭০৬	১৫.২৪	২৪৭.১২	৬১৬৭	৭.৬	৬৬.৯৯	১০৫.৩৯
১৯৯৯ থেকে ২০০১ এ বৃদ্ধির হার	(-) ৪.৭৮	(-) ১০.৬৯	৬.`৬২	(-) ০.৪৬	(-) ৪.৫৬	৪.৩	(-) ১২.৯৫	(-) ১৯.৪১	৮.০২

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, বছর ২০০১

টিকা -

সারণী- ৭, সংগঠিত শিল্পে কর্মরত মোট শ্রমজীবী ও প্রতিষ্ঠান সারকারি ও বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্ম সংস্থান কমেছে। বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্ম সংস্থান সরকারি ক্ষেত্রের থেকে বেশী হারে কমেছে। প্রতিষ্ঠান পিছু কর্ম সংস্থান উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে।

তালিকা – ১৫[৫৫]

সারণী:-২.১.১৫ **বিভিন্ন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী**

	কর্মসংস্থান ১৯৯১ (লাখে)			কর্মসংস্থান ২০০১ (লাখে)			
বিভাগ	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	বৃদ্ধির হার
কৃষি ও কৃষি নির্ভর,	০.৯২	২.০৪	২.৯৬	০.২১	২.০৮	২.২৯	(-) ২২.৬১
খনির কাজ	১.০৬	---	১.০৬	১.৫৭	-----	১.৫৭	৪৮.১১
প্রাইমারি ক্ষেত্রে মোট	১.৯৮	২.০৪	৪.০২	১.৭৮	২.০৮	৩.৮৬	(-) ৩.৯৮
উৎপাদনের ক্ষেত্রে	২.৬৪	৫.১১	৭.৭৫	১.৭৭	৩.৯৮	৫.৭৫	(-) ২৫.৮১
বিদ্যুৎ ও গ্যাস	০.৪১	০.১৬	০.৫৭	০.৩৪	০.২৬	০.৬০	৫.২৬
নির্মাণ কার্য	০.৫২	০.০৪	০.৫৬	০.৫৭	০.০৪	০.৬১	৮.৯৩
সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে মোট	৩.৫৭	৫.৩১	৮.৮৮	২.৬৮	৪.২৮	৬.৯৬	(-) ২১.৬২
ব্যবসা বাণিজ্য, হোটেল	০.১১	০.২১	০.৩২	০.১৩	০.২৪	০.৩৭	১৫.৬২
রেস্তোরাঁ, পরিবহন, যোগাযোগ	৩.২৬	০.০৮	৩.৩৪	৩.১১	০.০৫	৩.১৬	(-) ৫.৩৯
ও স্টোরেজ বীমা, আর্থিক ও	০.৯১	০.১৯	১.১০	০.৯৯	০.১৬	১.১৫	৪.৫৫
জমি বাড়ির ব্যবসা, পরিষেবা	৫.৯১	১.০৫	৬.৯৬	৬.৫৫	০.২৫	৬.৮০	(-) ২.৩
টার্সিয়ারী ক্ষেত্রে মোট	১০.১৯	১.৫৩	১১.৭২	১০.৭৮	০.৭০	১১.৪৮	(-) ২.০৫
সর্বমোট	১৫.৭৪	৮.৮৮	২৪.৬২	১৫.২৪	৭.০৬	২২.৩০	(-) ৯.৪২

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল, বছর **১৯৯১** ও **২০০১**

টিকা -

১) পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টার্সিয়ারি সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবীর সংখ্যা কমেছে যথাক্রমে **৩.৯৮%, ২১.৬২%** ও **৯.৪২%** শতাংশ।

২) তার মধ্যে শুধুমাত্র খনির কাজে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস, নির্মান কাজে, ব্যবসাবাণিজ্য, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বীমা ক্ষেত্রে, আর্থিক ও জমি বাড়ির ব্যবসার ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেড়েছে।

৩) সব থেকে বেশী শ্রমজীবীর সংখ্যা কমেছে উৎপাদনী ক্ষেত্রে। তারপর কৃষি ও কৃষি নির্ভর ক্ষেত্রে। এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে সরকারি কৃষি ও কৃষি নির্ভর ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবীর সংখ্যা কমেছে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে কিছু বেড়েছে।

তালিকা – ১৬[৫৬]

সারণী:-২.১.১৬ **রেজিষ্টার্ড কারখানার সংখ্যা ও কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা**

বছর	কারখানার সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির হার	শ্রমিক সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির হার	কারখানা পিছু শ্রমিক	কারখানা পিছু শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির হার	মোট কর্মসংস্থান	মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার	কারখানা পিছু মোট কর্মসংস্থান	কারখানা পিছু মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার
১৯৮০-৮১	৬৩৫৯	-----	৭৫৬৩৩৩	-----	১১৯	-----	৯৫২০২৬	------	১৪৯.৭	-----
১৯৮৫-৮৬	৫৬১৯	(-) ১১.৬	৬৩৯২৫৭	(-) ১৫.৫	১১৪	(-) ৪.২	৮০৬৪৩৪	(-) ১৫.৩	১৪৩.৫	(-) ৪.১
১৯৯০-৯১	৫৬০৬	(-) ০.২	৫৭৮৫৫১	(-) ৯.৫	১০৩	(-) ৯.৬	৭৪০৯৮০	(-) ৩.২	১৩৭.৩	(-) ৪.৩
১৯৯৫-৯৬	৫৬৩২	০.৫	৬৫১২০৬	১২.৫	১১৬	১২.৬	৮২৫১৫৪	১১.৪	১৪৬.৫	৬.৭
১৯৯৮-৯৯	৫৫২৩	(-) ১.০৯	৫৫১২৩৪	(-) ১৫.৪	১০০	(-) ১৫.৮	৬৮৫১০৮	(-) ১৭.০	১২৬.০	(-) ১৪.০

সূত্র: অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিভিন্ন বছরে) সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকাল অর্গানিজেশন ও পশ্চিমবঙ্গ অন্য চোখে

টিকা -

সারণী – ২.৯ এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে কারখানার সংখ্যা, শ্রমিক সংখ্যা, কারখানা পিছু শ্রমিক সংখ্যা, কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯০-৯১-এ কমেছে, ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫-৯৬-এ বেড়েছে, আবার ১৯৯৫-৯৬ থেকে

১৯৯৮-৯৯-এ কমেছে। কিন্তু ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫-৯৬ যে হারে বেড়েছে, ১৯৯৫-৯৬ থেকে ১৯৯৮-৯৯ তার থেকে বেশী হারে কমেছে। এবং ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৮-৯৯ কারখানার সংখ্যা কমেছে ১৩.১৫ শতাংশ, শ্রমিক সংখ্যা কমেছে ২৭.১২ শতাংশ, কারখানা পিছু শ্রমিক সংখ্যা কমেছে ১৫.৯৭ শতাংশ, মোট কর্মসংস্থান কমেছে ২৮.০২ শতাংশ এবং কারখানা পিছু কর্মসংস্থান কমেছে ৩৩.৫৮ শতাংশ। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যে শ্রমিক সংখ্যা যে হারে বেড়েছে বা কমেছে ভারত সরকারের তথ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সংখ্যা তার থেকে বেশী হারে কমেছে। যেহেতু একটা বছরে পুরোন কারখানা খোলা থাকা, বন্ধ থাকা, আবার নতুন কারখানা চালু হওয়ার উপর নির্ভর করছে শ্রমিক সংখ্যা বাড়া-কমা। বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরোন কারখানার জন্যে শ্রমিক সংখ্যা কমে যাওয়া আবার নতুন কারখানা জন্য শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পরিসংখ্যান সারনী ১০-এ দেওয়া হল। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৯ এই বছরের তথ্য থেকে দেখা যায় কারখানা বন্ধের ফলে বছরে যে পরিমাণ শ্রমিক বিয়োগ হচ্ছে, নতুন কারখানা চালু হবার ফলে তার সামান্য অংশ শ্রমিক সংখ্যায় যোগ হয়েছে বা প্রতি বছর কারখানাপিছু যত শ্রমিক কাজ হারিয়েছে, তার থেকে অনেক অনেক কম কারখানাপিছু শ্রমিক কাজ পেয়েছে।

তালিকা – ১৭[৫৭]

সারণী:–২.১.১৭ **পশ্চিমবঙ্গে নতুন ও বন্ধ কারখানা**

বছর	নতুন কারখানা	নতুন কারখানার শ্রমিক (হাজার)	নতুন কারখানা পিছু শ্রমিক	বন্ধ কারখানা (ধর্মঘট ও লক আউট জনিত কারণে)	বন্ধ কারখানার শ্রমিক (হাজার)	বন্ধ কারখানা পিছু শ্রমিক
১৯৮৫	২২০	১০.৯	৫০	২০৫	১৪৯.৪	৭৩২
১৯৯০	২৫২	৭.৩	২৯	১৯৫	১২৩.০	৬৩১
১৯৯৫	১৯৪	৯.৫	৪৯	১৬৯	৩০৮.৫	১৮২৫
১৯৯৬	৩৪২	১০.৪	৩১	১৬১	১২৮.২	৭৯৬
১৯৯৭	২২৫	৬.১	২৭	১৯০	৯৭.৬	৫১৪
১৯৯৯	২৯৭	৮.২	২৮	২৯৮	৪৭৩.০	১৫৮৭
২০০০	২৪৯	৯.৬৩	৩৯	৩১৩	৩৭১.৮৬	১১৮৮
২০০১	৪১২	১৬.২৯	৪০	৩২৫	১৪৮.৩২	৪৫৬

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল ও পশ্চিমবঙ্গ অন্য চোখে

যে ধরনের কারখানা বানানো হচ্ছে তাতে আগেকার কারখানার মত কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তটা যেমন ১০ নং সারণী এর তথ্য (বন্ধ ও নতুন কারখানা মাথা পিছু শ্রমিকের হিসেব) থেকে বলা যায় তেমনি ১১ নং সারণীর তথ্য থেকেও বলা যায়।

তালিকা – ১৮[৫৮]

সারণী:-২.১.১৮ **শিল্প সংস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান**

বছর	শিল্পসংস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ (লাখ টাকা)	শিল্পসংস্থায় কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	প্রতি লাখ টাকা বিনিয়োগ পিছু কর্মসংস্থান
১৯৮০-৮১	৪১৭৭৪১	৯৫০০২৬	২.২৮
১৯৮৫-৮৬	৬৩৭৮৩১	৮০৬৪৩৪	১.২৬
১৯৯০-৯১	১২৫১৭৬৭	৭৪০৯৮০	০.৫৯
১৯৯৫-৯৬	৩০৮৭৫৪৯	৮২৫১৫৪	০.২৭
১৯৯৮-৯৯	১৭২১৫২৪	৬৮৫১০৮	০.১৬

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল, ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার ও পশ্চিমবঙ্গ

তালিকা – ১৯[৫৯]

সারণী:- ২.১.১৯ সারা রাজ্যে কর্ম সংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকরি হয়েছে

সংস্থা	১৯৯৯	২০০০	২০০১
কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস	৮৩৪	২৭৫	২৪০
কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত সংস্থা	১২৮৮	১৩৮	২৩১
রাজ্য সরকারি অফিস	৫০৫৬	৫৫০৩	৪৬৭৮
রাজ্য সরকার অধিগৃহিত সংস্থা	৩৬৪	১৬৫১	১৯৬৭
আঞ্চলিক সংস্থা	৪৩৭৭	৪৯৫৩	২৯৯২
মোট	১১৯২৮	১২৫২০	১০১০৮
বেসরকারি সংস্থা	২৫৩৭	১২৩৮	১০৪৯
মোট চাকরি হয়েছে	১৪৪৬৫	১৩৭৫৮	১১১৫৭

সূত্র: লেবার ইন ওয়েস্টবেঙ্গল ২০০১ ও পশ্চিমবঙ্গ

তালিকা – ২০[৬০]

সারণী:- ২.১.২০ শিল্পে ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক ২০০০, শতাংশ

শিল্প	পশ্চিমবঙ্গ	বিহার	উড়িষ্যা	উত্তর প্রদেশ	অন্যান্য	মোট
পাট	৩৭.৪৯	২৬.২৯	৭.১২	২৩.২৫	৫.৮৫	১০০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৭২.৯৮	১৩.৬৪	২.৯৪	৮.০৬	২.৩৮	১০০
ছাপাখানা	৮৫.০৭	৮.৬২	১.৪২	৩.৯৯	০.৯০	১০০
গ্লাস	৯১.০৭	৩.৫৭	০.০০	০.০০	৫.৩৬	১০০
লোহা ও স্টিল	-----	-----	----	----	----	----
রাসায়নিক	৮৩.৮০	১১.১৪	২.১৯	৫.৪০	২.৪৭	১০০
মোট	৫২.৬৮	২২.১৭	৫.০৮	১৬.১৯	৩.৮৮	১০০

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ২০০০

তথ্যসূত্র

১) সুধীরকুমার মিত্র। 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ'। মন্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, ১৯৬২, পৃ. ১৮৪

২) তদেব, পৃষ্ঠা. ১৮৯

৩) তদেব, পৃষ্ঠা. ৩২০

৪) ক্ষেত্র সমীক্ষা চিত্র, ০৫/০৬/২০০১৭

৫) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, রাখী চট্টোপাধ্যায়। 'বাংলার মুক্তি সন্ধানী'। গ্রন্থমিত্র, কলকাতা- ২০০৫। পৃ. ৩৫

৬) তদেব, পৃষ্ঠা. ৩৮

৭) অমল দাস। 'হাওড়ার লাডলো চটকলে শ্রমিক আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (১৯৮১)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৫। কলকাতা, ১৯৯০।

৮) তদেব, পৃষ্ঠা. ৪০

৯) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। 'আলমবাজারের লড়াকু শ্রমিক নেত্রী দুখমৎ দিদি'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৪। কলকাতা, ১৯৮৯।

১০) তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫২

১১) মণিভূষণ ভট্টাচার্য। 'গান্ধীনগরে এক রাত্রি'। দেজ পাবলিশিং হাউস। কলকাতা, ২০১৬

১২) তদেব, পৃষ্ঠা. ৩

১৩) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। 'চটকলের মেয়ে শ্রমিকরা: ৭০ বছর আগে পরে'। ইতিহাস অনুসন্ধান – ০৭। কলকাতা – ২০০৯।

১৪) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। ‘বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৩৪) ও কমিউনিস্ট নেত্রী সুধা রায়। ইতিহাস অনুসন্ধান – ৩। কলকাতা – ১৯৮৮।

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৭

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৯

১৭) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। ‘সুকুমারী চৌধুরী ও বেঙ্গল ল্যাম্প’। ইতিহাস অনুসন্ধান – ১৭। কলকাতা – ২০০৩।

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৬

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা. ৫১

২০) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৫

২১) তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫৯

২২) *'Chokh'.* Directed by Utpalendu Chakrabarty. Performed by Anil Chatterjee, Shyamanand Jalan, Sreela Majumdar Om Puri. 1982

২৩) মণিভূষণ ভট্টাচার্য। ‘গান্ধীনগরে এক রাত্রি’ http://www.milansagar.com/kobi/manibhushan_bhattacharjee/kobi-manibhushan.html, ০৬/২৬/২০১৮

২৪) গুরুদাস পাল।

২৫) তদেব

২৬) কবীর সুমন। কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিক আন্দোলন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ শ্রম আইন ও জুটমিলের অসংগঠিত শ্রমিক

পাটশিল্প জাতীয় করনের দাবি- ১৯৬২ সালের ৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাট ও চা শিল্পকে জাতীয়করণের যে দাবি বিরোধীপক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল তার বিরোধিতা করেন। ডাঃ রায় বলেন, 'এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের কোনো লাভ হবে না। বরং ক্ষতিপূরণ হিসাবে এজন্য যে বিপুল অর্থ দিতে হবে সে অর্থ দিয়ে নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারলে বাঙালি ছেলেদের বেকার সমস্যা কিছুটা সমাধান করা যাবে'।[১] ১৯৭০ –এর ১৩ এপ্রিল লোকসভায়, ভারতে বিদেশি মালিকানায় যেসব শিল্প আছে, সরকারের সেগুলির ভার নেওয়া উচিত বলে যে প্রস্তাব করা হয়, তার উত্তরে লোকসভার অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি সি শেঠই বলেন- প্রস্তাবে 'জাতীয়করণ'- এর যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ পরিষ্কার নয়। এই সব শিল্পের ভার নিতে হলে সরকারকে অল্পদিনের মধ্যে বিদেশি মুদ্রায় প্রচুর অর্থ খরচ করতে হবে। সুতরাং সরকারের মতে বিদেশি শিল্পের ভার নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়- প্রয়োজনীয় নয়।

পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের যে 'সংকট' চলছে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে দিল্লিতে শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। পাটশিল্পের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্র ইতিমধ্যে একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিও নিয়োগ করেন। শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগ জানান ওই সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রকে এক্ষেত্রে 'প্রতিকারমূলক' ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করেন। সাংবাদিকেদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি মন্তব্য করেন, এই মুহূর্তে (১৯৭৬ সাল) পাটশিল্পকে সরকারের হাতে নিতে গেলে

কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা দরকার।[২] পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রকল্প ও সমবায় মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন ৫ মার্চ ১৯৭৬ রাজ্য বিধানসভায় বলেন, 'পাটশিল্প জাতীয়করণের কথা মুখে বলা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া তত সহজ নয়'। এই শিল্প জাতীয়করণের পথে অনেক সুবিধা আছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী নন- কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করতে পারেন মাত্র।

১৫ জুলাই ১৯৭৬ বাংলার বর্তমান পাটশিল্পের হাল নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর (সিদ্ধার্তশঙ্কর রায়) এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প এবং অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী টি এ পাই, বাণিজ্য মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সরবরাহ ও পুনর্বাসন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মিরধা, রাজস্ব ও ব্যাংকিং দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি এবং যোজনা মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তারা পাট শিল্পের বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভারতীয় পাটকল চেয়ারম্যান জি এল হেতা-র সঙ্গে পরে স্বাক্ষাত করেন।[৩]

মালিক আক্রমণের শেষ হাতিয়ার হচ্ছে শ্রমিক ছাঁটাই এবং শেষ পর্যন্ত কারখানা লকআউট বা মালিকদের ধর্মঘট। পশ্চিমবাংলার রেজিষ্ট্রার্ড কারখানায় ১৯৬৫, ১৯৭০ এবং ১৯৭৫ এই তিন বছরে মালিকদের ধর্মঘটের (লকআউটে) শিকার হয়েছিল যথাক্রমে ৬০.২, ৮২.৮, এবং ৬৪.২ হাজার মজুর বা গড়ে বছরে ৬৯.১ হাজার মজুর।[৪] ঐ তিনবছর মিলিয়ে লকআউটের ফলে মোট ৭৪ লক্ষ শ্রমদিবস বা গড়ে বছরে ২৪.৬৭ লক্ষ শ্রমদিবস মজুরদের কারখানার বাইরে রেখেছিল মালিকরা।[৫]

এরই পাশাপাশি আমরা শ্রমিকদের প্রতিরোধের চিত্রটা দেখতে পারি। ঐ তিনবছরে যে মজুররা ধর্মঘট করেছিল তাদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬৩.৫, ৩৭১.৩,

এবং ২০৬.১ হাজার, বা গড়ে বছরে ২১৩.৬ হাজার মজুর। এই তিন বছরের ধর্মঘটে মোট শ্রমদিবস গেছে ১৬৯.৭০ লক্ষ, বা গড়ে বছরে ৬৫.৬৫ লক্ষ শ্রমদিবস।[৬]

শিল্পের সংকট শুরু হবার প্রথম ১০ বছরের (১৯৬৫-৭৫) এই যে তথ্য আলোচনা করা হল দেখা গেল মোটামুটি এই সময় গড়ে বছরে মালিকদের আক্রমণের সংখ্যাগত পরিমাণ যদি হয় ২৪.৬১ লক্ষ শ্রমদিবস (লকআউট), তবে এই একই সময়ে শ্রমিকদের প্রতিরোধের সংখ্যাগত পরিমাণ হচ্ছে ৫৬.৫৬ লক্ষ শ্রমদিবস (ধর্মঘট), বা লকআউটের তুলনায় প্রায় ২.৩ গুণ বেশী।[৭]

এই তথ্যের তাৎপর্য বোঝা যাবে যদি এর পাশাপাশি ১৯৯০এর দশকের শেষ পাঁচ বছরের (১৯৮৬-৯০) এবং দশকের শেষ পাঁচ বছরের (১৯৯৭-২০০১) লক-আউটের তথ্য আলোচনা করি।[৮]

১৯৮৬-৯০ এই পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর মালিকপক্ষের লক-আউটের শিকার হয়েছে ১৪৪.৫ হাজার শ্রমিক এবং এরা গড়ে প্রত্যেক ১৫৪ দিন তালাবন্ধ কারখানার বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে গড়ে বছরে মোট ২২২.৬৬ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে।[৯] এটা হচ্ছে প্রথম দিকের গড় (২৪.৬৭ লক্ষ) অপেক্ষা ৯ গুণের বেশী। অর্থাৎ সংখ্যাগত দিক থেকে বলা যায় যে সময়ের এই দুই ভাগের মধ্যে মালিকদের আক্রমণ মোটামুটি ভাবে বেড়েছে ৯ গুণ।[১০]

এইসময় শ্রমিকদের প্রতিরোধের অবস্থা কি? ১৯৮৬-৯০ এই পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিবছর ৪৬.৩ হাজার মজুর ধর্মঘট করতে সক্ষম হয়েছে এবং সব মিলিয়ে বছরে গড়ে মোট ১১.৫৮ লক্ষ শ্রমদিবস ধর্মঘট চালাতে পেরেছে।[১১] এটা হচ্ছে প্রথম দিকের গড়ের (৫৬.৫৬ লক্ষ) প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। শেষ পাঁচ বছরে (১৯৯৭-২০০১) গড়ে প্রতি বছর মালিকদের লকআউটের ফলে শ্রমদিন নষ্ট হয়েছে ১৪৫.২৪ লক্ষ

শ্রমদিবস বা আক্রান্ত শ্রমিক পিছু ১১৫ দিন।[১২] একই সময় শ্রমিকদের প্রতিরোধে শ্রমদিন নষ্ট হয়েছে ১৮.৪৪ লক্ষ শ্রমদিবস বা প্রতিরোধে অংশ নেওয়া শ্রমিক পিছু মাত্র ১৬ দিন। অনুপাতে মালিকদের আক্রমণের তীব্রতা শ্রমিকদের প্রতিরোধের তীব্রতা থেকে ১৪৫.২৪ ÷ ১৮.৪৪ প্রায় ৮ গুণ বেশী। ৯০-এর দশকের শেষ পাঁচ বছরের (১৯৮৬-৯০) তুলনায় এটা সামান্য কম। কিন্তু এখনও মালিক পক্ষের আক্রমণের উদ্যোগ যে অনেক বেশী এটা স্পষ্ট।[১৩]

১৯৬৪-৭৫ এর তুলনায় মালিকদের আক্রমণ বাড়ল ৮-৯ গুণেরও বেশী আর শ্রমিকদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে দাঁড়াল প্রায় ৩ থেকে ৫ ভাগের এক ভাগ।[১৪] শিল্পের সঙ্কটের প্রথম ১০ বছরের (১৯৬৫-৭৫) তুলনায় ১৯৯৭-২০০১-এর মধ্যে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক শক্তির ফারাকটা কোন দিকে কতটা বাড়ছে ঐ তথ্য তার একটা মোটামুটি ধারণা দেয়।

শ্রমিকদের এই অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে মালিকরা কারখানায় লকআউটের অস্ত্র বারংবার প্রয়োগ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়া এবং করে তোলা কারখানাগুলি থেকেও সবচেয়ে বেশী মুনাফা করার জন্য মজুরদের উপর অভাবনীয় এবং অসম্মানজনক বোঝা দিনের দিন চাপিয়ে চলেছে। এর মধ্যে পড়ে 'সংগঠিত' শ্রমিকদেরও বাধ্য করা ছাঁটাই মেনে নিতে, কাজের বোঝার পরিমাণ বৃদ্ধি মেনে নিতে এবং মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও চলতি মজুরীকে নানারকম কায়দায় কমিয়ে নিতে। কলকাতার শিল্পাঞ্চলের বহু জায়গায় অবস্থা খুবই করুণ। এর মধ্যে পড়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার খাদ্য যোগাতেও অক্ষম হয়ে আত্মহত্যা থেকে শুরু করে রিক্সা চালানো, সবজি বিক্রি জাতীয় কাজ করতে বাধ্য হওয়া ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের, বন্ধ করে রাখা কারখানার শ্রমিকদের। অসুস্থতা ইত্যাদি নানা রকম কারণে বা ছুতোয় মালিকরা আজ অনেক

জায়গায় কোন আইনের পরোয়া না করে, আইনে নির্দিষ্ট নিম্নতম মজুরী থেকে শুরু করে মজুরদের পাওনা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, চিকিৎসার পাওনা টাকা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই এই 'সংগঠিত' মজুরদেরও' বঞ্চনা করে চলতে পারছে।[১৫]

সংগঠিত কারখানার শ্রমিকদেরও এই প্রায় অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিভাবে শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়ান হচ্ছে এবং একই সঙ্গে মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি হচ্ছে তা ভারত সরকারের 'বার্ষিক শিল্প সমীক্ষা'র তথ্যে খুবই স্পষ্ট। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৭-৯৮–র মধ্যে বিশেষ করে ১৯৯০-র দশকে কিভাবে শিল্প থেকে আয়ে শ্রমিকের ভাগ কমেছে এবং ফলে মালিকদের ভাগ বেড়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে শ্রমিক পিছু যে আয় সৃষ্টি হয়েছে (১৮,১৭৯ টাকা) তার মাত্র ৪৭.১% বা ৮,৫৩৯ টাকা ছিল শ্রমিক পিছু মজুরী।[১৬] এই অনুপাত ১৯৮৫-৮৬ তে সামান্য বেড়ে হয় ৪৮.৩%। তারপর এটা দ্রুত কমতে শুরু করে এবং শেষ যে বছরের তথ্য পাওয়া গেছে সেই ১৯৯৭-৯৮ সালে এই অনুপাত ছিল ৩০.৯% শতাংশ।[১৭] ঐ বছর গড় শ্রমিক পিছু মজুরী ছিল বছরে ৪৫,৪৭৯ টাকা। শ্রমিকরা যদি তাদের শোষণের হার ১৯৮০-৮১ –র স্তরেও রাখতে পারত তবে তাদের মজুরী বৃদ্ধি পেত ২৩,৮৯৪ টাকা বা ৫২.৫৪% শতাংশ। এই সময়ে শ্রমিক পিছু আয় সৃষ্টি (স্থির মূল্যে) যা বেড়েছে তার অতি সামান্য অংশই (১৫%-এরও কম) মজুরী বৃদ্ধিতে গিয়েছে। অধুনা শ্রমিক পিছু আয় সৃষ্টি (বা productivity)-র সঙ্গে মজুরী নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে মালিক ও সরকার পক্ষের লোকেরা যে সব কথা বলেন তাদের মনোযোগের সঙ্গে ঐ ১৯৯০ –র দশকের তথ্য অনুধাবন করা উচিত।

প্রভিডেন্ড ফান্ড আইনের ৮ নং ধারায় রয়েছে মালিক বা কর্তৃপক্ষ বকেয়া টাকা যদি আইন সঙ্গত ভাবে হস্তান্তর না করে তবে প্রয়োজনে

১। মালিককে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

২। তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসানো যেতে পারে।

৩। প্রয়োজনে সেই সম্পত্তি বিক্রি করে বকেয়া টাকা মেটানো যেতে পারে।

১৪ নং ধারায় রয়েছে যে সকল কর্তৃপক্ষ এই সুরক্ষা বিমার টাকা বকেয়া রাখবে তাঁদের সর্বোচ্চ এক বছরের জেল বা ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি একসাথে হতে পারে।[১৮] ১৪A ধারায় রয়েছে যদি কোন কর্তৃপক্ষের একবার শাস্তি নিশ্চিত হয় তবে পরবর্তী অভিযোগের ক্ষেত্রে নূন্যতম ২ বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছর জেল ও একই সাথে ২৫০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।[১৯]

কিন্তু বাস্তবতা হল বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফান্ড বাবদ কাটা টাকা মালিকরা জমা করে না। অনেক পাটকলে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রভিডেণ্ড ফান্ড বাবদ নামমাত্র টাকা পান। কারণ প্রভিডেণ্ড ফান্ডের টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। অল্প কিছু টাকা দিয়ে চূড়ান্ত হিসাব হয়ে গেছে বলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে লিখিয়ে নেয়। এই ভাবে প্রভিডেণ্ড ফান্ডের টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। অল্প কিছু টাকা দিয়ে চূড়ান্ত হিসাব হয়ে গেছে বলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে লিখিয়ে নেয়। এই ভাবে প্রভিডেণ্ড ফান্ডের টাকা মালিকপক্ষ নয়ছয় করে চলেছে বছরের পর বছর। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাটকলে প্রভিডেণ্ড ফান্ড বাবদ শ্রমিকদের প্রাপ্য ৬০০ কোটি টাকা অনাদায়ী।[২০] কিছু ক্ষেত্রে মালিকরা পেনশন খাতেও টাকা জমা না করায় অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা বছরের পর বছর পেনশন না পাওয়ার হাহাকার উঠেছে। এছাড়াও গ্র্যাচুইটির টাকা শ্রমিকদের মোটেই দেওয়া হয় না, আর হলে ঠেকানো হয় নামমাত্র। আত্মসাৎ করা এই বিপুল টাকারই সামান্য কিছু সম্ভবত মিল চালানোয় মালিকদের বিনিয়োগ।

আর একই সাথে শ্রমিক কর্মচারীর পিএফ এর প্রাপ্য টাকা সময়ে না দেওয়া ও বঞ্চিত করার কারণে আজ পর্যন্ত কোন জুটমিল মালিকের শাস্তি হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে যেহেতু উন্নত মানের কাঁচা পাট উৎপাদিত হয় সামান্যই, চেষ্টা করা প্রয়োজন উন্নত মানের কাঁচা পাট উৎপাদনের পরিবেশ তৈরি করা এবং ঐ পাটকে যাতে চাষিরা ন্যায্যমূল্যে বেচতে পারে তার জন্য একটি সুস্থ পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা করা। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে সর্বোৎকৃষ্ট কাঁচা পাট অর্থাৎ TD1, TD2, W1 এবং W2 সমগ্র উৎপাদনের মাত্র ৩ শতাংশ।[২১] উন্নত মানের পাটজাত সামগ্রী তৈরি করতে যেহেতু প্রয়োজন উন্নত মানের পাট, ভাল পাট উৎপাদনের ওপর তাই ভীষণ ভাবে জোর দিতে হবে। উন্নত মানের কাঁচা পাটের জন্য প্রয়োজন উন্নত বীজ, উন্নত চাষপদ্ধতি এবং সর্বোপরি উন্নত রেটিং, বাংলাদেশে নদীনালার বহতাস্রোতকে কাজে লাগিয়ে উন্নত রেটিং-এর যে সুযোগ আছে, পশ্চিমবঙ্গে ততটা নেই। সুতরাং আনতে হবে মাইক্রো বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, প্রয়োজনে করতে হবে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ। উন্নত রেটিং শুধুমাত্র কাঁচা পাটের মানকেই উন্নত করবে না, কমিয়ে আনবে বর্ষার ওপর চাষীদের নির্ভরশীলতা, কমিয়ে আনবে পাটচাষের সময়। চাষীরা তাড়াতাড়ি পাটচাষে নিয়োজিত টাকা ফেরত পেতে পারবে। অতএব চাষ সংক্রান্ত গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে এবং সেই গবেষণাকে সাধারণ চাষীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।[২২]

কিন্তু এইসব উন্নত চাষ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন মূলধনের জোর। আমরা আগেই দেখেছি যে অধিকাংশ পাট চাষীই প্রান্তিক। মূলধনের জন্য ভরসা মহাজন, যার কাছে তারা নিজেদের অসময়ে পাট 'অভাবি বিক্রি' করতে বাধ্য হয়। সুতরাং চাষের প্রয়োজনীয় মূলধনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী না হলে

বোধহয় উপায় নেই। এবার আসা যাক কাঁচা পাট বণ্টনের প্রসঙ্গে। বর্তমানে যে বাজার ব্যবস্থা আছে তাতে চাষীদের পক্ষে আশাব্যঞ্জক দাম পাওয়া বেশ মুশকিল। কেন্দ্রীয় সরকারের জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া যে বছর পাট সংগ্রহ করে সে বছরও তারা মোট ফলনের দশ শতাংশ কেনে কিনা সন্দেহ। ফলে সরকার নির্ধারিত কাঁচা পাটের মূল্য পাওয়াও হয়ে পড়ে দুষ্কর। সুতরাং বাকি থাকে আড়তদার ও দালাল নিয়ন্ত্রিত মান্ডি ও খোলা বাজার। অল্পসংখ্যক হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পাট কেনার জন্য চালু সমবায় বা কো-অপারেটিভ রয়েছে, তাদের মূল সমস্যা হল মূলধনের অভাব।

এছাড়া বেসরকারি মিলগুলি তাদের কাছ থেকে পাট কিনতে চায় না। তাদের একমাত্র ক্রেতা হল এনজেএমসি মিলগুলি, যারা আবার পাট কেনা বাবদ টাকা অনেকদিন ধরে বকেয়া রাখে।[২৩] ফলে বেশীরভাগ সমবায়ই শেষ পর্যন্ত অনেক কম দামে মিলে পাট সরবরাহকারী পাটের দালালদের সস্তায় পাট দিতে বাধ্য হয়। তাই লোকসানের কারণে এরা ধুঁকতে থাকে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কৃষিদপ্তর এবং কৃষিবিপণনদপ্তর জুট উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পাট কিনে নিয়ে উৎপাদককে সঠিক দাম পেতে সাহায্য করতে পারে জুট কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল-এর মত একটি সংস্থা গড়ে তুলে। এর ফলে সমবায় সক্রিয় সরকারি সাহায্য না পেয়ে বেশ দুর্বল। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি দশ থেকে বারোটি ব্লক পিছু মান্ডি বা হোলসেল বাজার তৈরির প্রকল্পের কথাও ভাবতে পারে। ভাবতে পারে বড় বড় গুদাম বা ভান্ডারের কথা – যাতে চাষীরা পাটের লাভজনক দাম না পাওয়া অবধি কাঁচাপাট ধরে রাখতে হবে। তবে এ প্রসঙ্গে সরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে সমবায় আন্দোলনের কথা ভাবা যেতে পারে। সামনে আদর্শ হিসেবে মহারাষ্ট্রের তুলাচাষীদের সমবায় আন্দোলনকে

রাখা যেতে পারে।[২৪] ঐ আন্দোলন তুলাচাষীদের সঠিক দাম পাওয়া সুনিশ্চিত করেছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্রে তুলাচাষীরা মোটামুটিভাবে ধনী- ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও বেশী। অন্যদিকে পাট চাষীরা যেহেতু প্রান্তিক, সরকারের ওপরে নিয়ন্ত্রণও তাদের সামান্যই।

শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভাল যে বি আই এফ আর-এর বিচারাধীন মিলগুলির অনেকগুলিই ১২ থেকে ১৫ টি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেপ্টেম্বর ২০০০-এর হিসেব হল ১৬ টি মিল-এর স্কীম কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে (Scheme under implimentation) এবং ১১ টি মিল স্কীম তৈরির পর্যায়ে রয়েছে (scheme under formulation/order reserved)। এই মিল গুলির মোট শ্রমিক সংখ্যা ১ লাখ ৯ হাজার ৮০০ জন। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ৫ টি এন জে এম সি মিল ধরা হয়নি।[২৫] এই সমস্ত মিলগুলির কোনো নির্দিষ্ট, সুগঠিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্প নেই। এই সব মিল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিনের প্রচূর বকেয়া পাওনা ফেলে রেখেছে পাওনাদার, সরকার এবং শ্রমিকদের কাছে। এই সমস্ত মিল চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে বেকার হয়ে পড়বে এক বিশাল সংখ্যক শ্রমিক। অসংখ্য শ্রমিক পরিবারকে ঠেলে দেওয়া হবে ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত জীবনের দিকে। এই ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে শ্রমিক, পেশাদার এবং সরকার মিলে একটি যৌথ অংশগ্রহণকারী ম্যানেজমেন্টের কথা ভাবা যেতে পারে।

যে কটি মিল খোলা থাকবে, তাদের বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে চাই আধুনিকীকরণ। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে মিল-মালিক ও ব্যবস্থাপকরা আধুনিকীকরণের খাতে সরকারি ঋণের খুব সামান্যই ব্যবহার করেছে। সুতরাং মিল

মালিক ও কর্তৃপক্ষকে হতে হবে উদ্যোগী ও দূরদর্শী। মিল মালিকদের প্রসঙ্গে এ কথা প্রাসঙ্গিক যে দীর্ঘকালীন পরিচালকমণ্ডলী অথবা স্থায়ী মালিক ছাড়া বোধহয় কেউই কারখানা আধুনিকীকরণের মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিতে চাইবে না। সতরাং লীজ প্রথা দূর করতে এবং মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। যাই হোক, আধুনিকীকরণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা বাড়িয়ে এই বাজারী প্রতিযোগিতায় জেতা যাবে না।[২৬]

আধুনিকতার সাথে সাথে আনতে হবে উন্নত মানের পাটজাতদ্রব্য এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য। বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য উৎপাদন প্রসঙ্গে একথা আবারও বলতে হয় যে ল্যাবরেটরী গবেষণার ওপর শুধু জোর দিলে চলবে না, নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদন খরচ প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে হবে। এর সুফল শুধুই শিল্পই পাবে না- মাঠের চাষীরাও পাবে। কারণ নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করতে পারলে, বাড়বে কাঁচা পাটের চাহিদা, বাড়বে চাষের জমি ও চাষীদের উদ্যম। যেমন বেড়েছে গত কুড়ি বছরে উত্তরপ্রদেশের আখ চাষ। এটা সম্ভব হয়েছে চিনি ছাড়াও গুড়, মদ ইত্যাদির ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধিতে। তেমনিভাবেই পাটশিল্পকে শুধুমাত্র গানিব্যাগ, দড়ি ইত্যাদির মতো চিরাচরিত পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাগজ শিল্প তার কাঁচামালের (কাঠ) অভাবে ও অত্যধিক দামের জন্য ধুঁকছে। পাটকে কাগজ শিল্পের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করার একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব শ্রী পিনাকী সেনগুপ্ত (প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টিটাগড় পেপার মিল) বি আই এফ আর-কে দিয়েছিলেন এবং ১৯৯০ -এ বি.আই.এফ.আর এই প্রস্তাব মঞ্জুর করা সত্ত্বেও আই.ডি.বি.আই -এর আর্থিক সহযোগিতায় তা কার্যকরী হতে পারেনি।[২৭] সরকার এই দিকটা ভেবে দেখতে পারে। এতে দুটি শিল্প একসঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা চটশিল্পে ইতিবাচক ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবেই পরিবেশগত কারণে পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। পাটজাত পণ্য বায়োডিগ্রেবল অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ না করে প্রকৃতির সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়। পাটশিল্পকে এই সুযোগের সদব্যবহার করতে হবে। ২০০০ সালে চটশিল্পে ধর্মঘটের জন্য (মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত) সিনথেটিক শিল্প চটের সম্ভাব্য অভাব নিয়ে প্রচারে নামে। চাপের মুখে কেন্দ্র শেষ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে চিনি ও খাদ্যশস্যে ১০ শতাংশ এবং সারে দু শতাংশ হারে চটের বস্তার ব্যবহার কমিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়।[২৮] এর পরই সিনথেটিক লবি এই নির্দেশকে স্থায়ী করতে এবং চটশিল্প এই নির্দেশের প্রত্যাহারের দাবি জানাতে থাকে। বস্ত্রমন্ত্রক এই সঙ্কটে খড়গপুর আই.আই.টি -কে এই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে নিয়োগ করে। আই.আই.টি প্যাকেজিং-এর কাজে চটের বস্তার ব্যবহার বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিনথেটিক বস্তার ব্যবহার ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, লবণ ও সিমেন্ট ছাড়া আর কোনো শিল্পে সিনথেটিক বস্তার ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে চটের ব্যবহার বাড়বে এমন শিল্প আরও বেশী করে স্থাপনে সরকারি পরিকল্পনায় উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণকারী সিনথেটিক শিল্পের ওপর পরিবেশ কর আদায়ের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে আই.আই.টি -র রিপোর্টে। রিপোর্টের পরামর্শগুলি রূপায়িত করতে যেমন সরকারের উদ্যোগ দরকার, তেমনি ক্রমাগত সিনথেটিক লবির চাপকে প্রতিহত করতে চটশিল্পের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের উদ্যোগী হয়ে দূরদর্শিতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা অতীতে দেখেছি যে একসময় টেরিলিন জাতীয় সিনথেটিক কীভাবে বাজারে সুতি বস্ত্রকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন আবার সুতিবস্ত্র ধীরে ধীরে

বাজার দখল করে ফেলছে। স্বাভাবিক রেশমের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।[২৯]

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিল্প মিলিয়ে ৫০ কেজি ব্যাগের যা উৎপাদন ক্ষমতা তার সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে দেখতে হবে মিল-ভিত্তিক সত্যি সত্যিই ৫০ কেজি ব্যাগ উৎপাদনের ক্ষমতা ঠিক কতটা। সঠিক তথ্য না পেলে বুঝতে সুবিধে হবে কেন? সার-সিমেন্ট শিল্প অর্ডার দিলে আইন অনুযায়ী, বছরে নির্দিষ্ট সময়ে নির্মাণ শিল্প চাইলে, বা চাষের মরশুমে, এই বস্তার চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেলে যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। যার ফলশ্রুতিতে আবশ্যিক জুট ব্যবহারের আইন শিথিল করার দাবী ওঠে সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে – কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, অবশেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সরাসরি হস্তক্ষেপে আইন শিথিল করা হয়।[৩০] আমাদের রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি শুধুমাত্র রুটিনমাফিক চিঠি দিয়েই দায় সারেন। প্রয়োজন সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করার।

আমরা আগেই দেখেছি যে চট শিল্পের শ্রমিকরাই স্বাভাবিকভাবে এই শিল্প সংকটে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যে সংকট সৃষ্টিতে তার ভূমিকা প্রায় নেই। বরং তাদের প্রভিডেণ্ড ফান্ড, ই এস আই, গ্রাচ্যুইটির কোটি কোটি টাকা মালিকরা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে- প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কিছু কারখানা হয়তো চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে কথা আগেই আলোচিত। সে ক্ষেত্রে বেকার হয়ে পড়বে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক। এছাড়া শিল্পের আধুনিকীকরণের প্রয়োজন মেনে নিলে, বোধহয় একথাও মানতে হবে যে সেক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে আরও অনেক শ্রমিক। সব মিলিয়ে এই বিপুল শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার দাবিই

বোধহয় সব থেকে যুক্তিযুক্ত- এবং তা চটশিল্পের ক্ষেত্রে সীমায়িত রাখলে চলবে না, তাকে যুক্ত করতে হবে অন্যান্য সমস্ত শিল্পের সংকটের সঙ্গে।

২০১৪-২০১৫ সালের প্রকাশিত "Labour in West Bengal" নামক রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জুটমিলের উন্নতিতে তাঁদের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করছেন যে ২০১৫ সালে জুটমিল কর্তৃপক্ষ ট্রেডইউনিয়ন এবং সরকারের উপস্থিতিতে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই অনুসারে কোন নতুন শ্রমিক পাটশিল্পে যুক্ত হলে তার দৈনিক বেতনের পরিমাণ হবে ২৫৭ টাকা, একই নিয়ম অন্য সমস্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[৩১] দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ভাগাওয়ালা, কন্ট্রাক্ট, ট্রেনি ও জিরো নাম্বার শ্রমিকদের যে বেতন হুগলী শিল্পাঞ্চলে দেখেছি তা কোন ভাবেই এর অনুরূপ নয়।

গ্র্যাচুইটি বাবদ শ্রমিকদের পাওনা কর্তৃপক্ষ কী পরিমাণে বাকি রেখেছে তার কোন সঠিক হিসাব কারোরই জানা নেই। একই সাথে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কারখানার বাইরে এবং বিপদজনক পরিবেশে অসংগঠিত শ্রমিকদের এক বড় অংশ কাজ করলেও তাঁরা বেশির ভাগই ESI তালিকা ভুক্ত নয়।[৩২]

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন সাংসদ বা বিধায়কের পেনশন বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ সুযোগ সুবিধা বন্ধ হওয়ার কোন নজীর নেই। অথচ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া চলেছে দশকের পর দশক জুড়ে।

"রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
তবু দিন বদলায় না"![৩৩]

তালিকা – ১[৩৪]

সারণী:- ৩.১.১ পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (শতাংশ)

	ভারত		পশ্চিমবঙ্গে	
বিষয়	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১. মোট জনসংখ্যা (লাখে) *	৪৪৮০.৪৬	৪৭২৯.৪২	৩৬১.৪১	৩৭৩.৯৯
২. মোট শ্রমজীবী ১৯৯৯-২০০০*	১১৬০.১০	২৪৯৩.৬৪	৫৬.৯২	২১০.৪০
৩. শতাংশ হার	২৮.৬	৫৪.৫	১৫.৭৫	৫৬.২৬
৪. বেকারত্বের হার ১৯৯৯-০০	২.১৭	২.৪০	৫.১৩	৪.৩২
৫. শহরের কর্মসংস্থানের হার ১৯৯৯-০০	১৯.৭৩	৩৫.০৫	১৭.০৮	২৩.৪৫
৬. গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের হার ১৯৯৯-০০	৮০.২৭	৬৪.৯৫	৮২.৯২	৭৬.৫৫
৭. স্বনিযুক্তি মাধ্যমে জীবিকা ১৯৯৯-০০	৫১.৩০	৪৮.২৫	৫৩.৫০	৪৬.১৫
৮. নিয়মিত বেতনভুক্ত কর্মচারী ১৯৯৯-০০	১৮.২০	২৫.২৫	২২.৬০	২৩.৭০
৯. অনিয়মিত বেতনভুক কর্মচারী ১৯৯৯-০০	৩০.৫০	২৬.৫০	২৩.৯০	৩০.১৫

তালিকা – ২[৩৫]

সারণী:-৩.১.২ ভারতে নারী শ্রমিক বৃদ্ধির হার

	গ্রাম		শহর		মোট	
বছর	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
বৃদ্ধির হার ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত	২৪.৬	১১.৮৫	৯.১৫	১৯.৭২	২২.৬২	১৩.৭৫

সূত্র: জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫০ তম এবং ৫৫ তম রাউন্ড, ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৯-২০০০

* জনসংখ্যা ধরা হয়েছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় ৫৫ তম রাউন্ডের ভিত্তিতে ।

তালিকা – ৩[৩৬]

সারণী:-৩.১.৩ ভারতের ফ্যাক্টরি, খনি ও বাগিচা শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিক

ক্ষেত্র	১৯৯১	১৯৯৩	১৯৯৫	১৯৯৭
ফ্যাক্টরি	৫০৭ (১০%)	৫৭৮ (১১%)	৫১৪ (১১%)	৬৭৭ (১৪%)
খনি	৫৫ (৭%)	৫০ (৬%)	৪৭ (৬%)	৪১ (৬%)
বাগিচা শিল্প	৫৭২ (৫২%)	৫৬৮ (৫২%)	৬৩৩ (৪৯%)	৪১২ (৫১%)

সূত্র:- শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক/রিপোর্ট ২০০০-২০০১

তালিকা – ৪[৩৭]

সারণী:-৩.১.৪ ভারতে সংগঠিত শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিক (৩১/০৩/১৯৯৯ পর্যন্ত)

		রাষ্টায়ত্ত			বেসরকারি			মোট	
সাল	মোট	নারী	শতাংশ	মোট	নারী	শতাংশ	মোট	নারী	শতাংশ
১৯৯৬	১৯৪.২৯	২৬.৩৫	১৩.৫৬	৮৫.১২	১৭.৯২	২১.০৫	২৭৯.৪১	৪৪.২৬	১৫.৮৪
১৯৯৭	১৮৫.৫৯	২৭.২৮	১৩.৯৫	৮৬.৮৬	১৯.০৯	২১.৯৮	২৮২.৪৫	৪৬.৩৭	১৬.৪২
১৯৯৮	১৯৪.১৮	২৭.৬৩	১৪.২৩	৮৭.৪৮	২০.১১	২২.৯৯	২৮১.৬৬	৪৭.৭৪	১৬.৯৫
১৯৯৯	১৯৪.১৫	২৮.১১	১৪.৪৮	৮৬.৯৮	২০.১৮	২৩.২০	২৮১.১৩	৪৮.২৯	১৭.১৮
২০০০	১৯৩.১৪	২৮.৫৭	১৪.৭৯	৮৬.৪৬	২০.৬৬	২৩.৯০	২৭৯.৬০	৪৯.২৩	১৭.৬১

সূত্র: ইকোনমিক সার্ভে ২০০১-২০০২, শ্রমমন্ত্রক (DGE & T)

তালিকা – ৫[৩৮]

সারণী:- ৩.১.৫ সংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ)

সাল	রাষ্টায়ত্ত	বেসরকারি	মোট
৩১/০৩/১৯৯৬	১১৬.২	১০২.৪	২১৮.৬
৩১/০৩/১৯৯৯	১১১.৭	১২৮.৮	২৪০.৫

সূত্র: শ্রম মন্ত্রক ভারত সরকার, ২০০০-২০০১

তালিকা – ৬[৩৯]

সারণী:- ৩.১.৬ অসংগঠিত শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ)

সাল	বিষয়	গ্রাম	শহর	মোট
১৯৯৯-২০০০	নারী ও পুরুষ শ্রমিক	৫০.৪৬	৩০.৪৩	৮০.৮৮
	নারীকর্মী	১৭.২০	৩.৮৮	২১.০৮
	শতাংশ	৩৪.০৯	১২.৭৫	২৬.০৬

সূত্র: ইনফর্মাল সেক্টর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড ১৯৯৯-২০০০

তালিকা – ৭[৪০]

সারণী:- ৩.১.৭ অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের শ্রেণীবিভাগ (১৯৯৯-২০০০)

শ্রেণীবিভাগ	মোট/নারী কর্মী শতাংশ	পুরো সময়ের শ্রমিক	আংশিক সময়ের শ্রমিক
স্বনিয়োজিত কর্মী	মোট	৫৪.৩৬	৫.১০
	নারীকর্মী	১২.০৬	২.৭১
	শতাংশ	২০.৬৬	৫৩.১৪
ভাড়া করা কর্মী	মোট	১১.২১	১.৩৯
	নারীকর্মী	০.৯৮	০.৩২
	শতাংশ	৮.৭৪	২৩.০২
অন্যান্য	মোট	৫.৩৮	৩.৪৪
	নারীকর্মী	২.৭৫	২.২৬
	শতাংশ	৫১.১১	৬৫.৭০

সূত্র: ইনফর্মাল সেক্টর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড ১৯৯৯-২০০০

তালিকা – ৮[৪১]

সারণী:- ৩.১.৮ বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ)

ক্ষেত্র	মোট (লাখ)	নারী (লাখ)	শতাংশ
১. উৎপাদন ক্ষেত্র	৩৯.৫৩	১৮.০৪	৪৫.৬৪
২. নির্মাণ	২.০৩	০.০৮	৩.৯৪
৩. ব্যবসা ও যন্ত্রপাতি সারানো	২৪.১৮	১.৬০	৬.৬২
৪. হোটেল ও রেস্তোরাঁ	২.৮৭	০.৩০	১০.৩৮
৫. পরিবহন যোগাযোগ ও স্টোরেজ	৬.৬৯	০.০৮	১.২০
৬. আর্থিক পরিষেবা ও জমি বাড়ীর ব্যবসা	১.০৮	০.০৬	৫.৫৬
৭. শিক্ষা	১.৫৫	০.৫৩	৩৪.১৯
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক কাজ	০.৯০	০.০৬	৬.৬৭
৯. অন্যান্য	২.০৫	০.৩৩	১৬.১০
মোট	৮০.৮৮	২১.০৮	২৬.০৬

সূত্র: ইনফর্মাল সেক্টর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড ১৯৯৯-২০০০

তালিকা – ৯[৪২]

সারণী:- ৩.১.৯ সারা ভারতে এবং পূর্বাঞ্চলে সংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক (হাজার) ৩১/০৩/১৯৯৯

দেশ/রাজ্য	রাষ্টায়ত্ত	বেসরকারি	মোট
ভারত	২৮১০.৩	২০১৮.৪	৪৮২৯.১
পূর্বাঞ্চল	২৮৫.৭	১৫৭.১	৪৪২.৮
বিহার	৯০.১	১৭.৪	১০৭.৫
উড়িষ্যা	৮৩.৯	১০.৯	৯৪.৮
পশ্চিমবঙ্গ	১১১.৭	১২৮.৮	২৪০.৫

সূত্র: ইকোনমিক সার্ভে ২০০১-২০০২, শ্রমমন্ত্রক (DGE &T)

তালিকা – ১০[৪৩]

সারণী:- ৩.১.১০ পশ্চিমবঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন যে সব নারী

সাল	লাখ
১৯৯১	১০০০
১৯৯৯	২৮০৭
২০০০	২৩১৬
২০০১	১৭০৭

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল

তালিকা – ১১[৪৪]

সারণী:- ৩.১.১১ রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার নারী (পশ্চিমবঙ্গ)

সাল	বেকার (লাখ)
১৯৯১	১০.৫৫
১৯৯৯	১৩.৫৭
২০০০	১৪.৭০
২০০১	১৬.০৫

সূত্র: লেবার ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল

টিকা:- নারী শ্রমিক ও মজুরি

ভারতে কৃষিকাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় ৭০ শতাংশ কম মজুরি পেয়ে থাকেন। সারাদিন কাজের বিনিময়ে যেখানে একজন পুরুষ কৃষি শ্রমিক ২৩.৪০ টাকা পেয়ে থাকেন সেখানে নারী শ্রমিক পেয়ে থাকেন মাত্র ১৬.৪০ টাকা। এছাড়া পুরুষ শ্রমিক যেখানে সারা বছর গড়ে ১৪৫ দিন কাজ পান, নারী শ্রমিক সেখানে ১২৫ দিন কাজ পান।[৪৫]

১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে সারা দেশে ৩৩ হাজার পরিবারের ওপরে এক নমুনা সমীক্ষা চালিয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক রিসার্চ সংগঠন জানিয়েছেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একজন নারী কৃষি শ্রমিক একই সময় কাজ করে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম হারে মজুরি পান-

তামিলনাড়ু	৬৭%
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৫%
মহারাষ্ট্র	৬৮%

বর্তমানে কর্মরত নারীদের জন্য আইনি অধিকার

১) দি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট, ১৯৫১

*ক্রেশের সুবিধা রাখতে হবে।

*শিশুকে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজনে নারী শ্রমিক কাজের মধ্যে ছাড় পাবেন।

*এই সুবিধা প্রাপ্য হবে যদি এই সব সংস্থায় ৫০ জন বা তার বেশী কর্মী কাজ করেন।

২) দি ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট, ১৯৪৮

*ফ্যাক্টরি পরিষ্কারের কোনো কাজ নারী শ্রমিকদের দিয়ে করান যাবে না। লুব্রিকেটিং, ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কোনো কাজে নারী শ্রমিকদের নেওয়া যাবে না।

*এই আইন সেখানেই কার্যকর হবে যেখানে ৩০ জন বা তার বেশি কর্মী কাজ করবেন।

*মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহের বেতনসহ পাওয়া যাবে।

৩) দি মাইনস অ্যাক্ট, ১৯৫২

*খনির অভ্যন্তরে যে কোনো রকম কাজেই নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ।

৪) ইক্যুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৬

*সমকাজে সমমজুরি অর্থাৎ একজন পুরুষ যে কাজের জন্য যে মজুরি/বেতন পাবেন, নারীদেরও তাই দিতে হবে।

তালিকা – ১২[৪৬]

সারণী:-৩.১.১২ নারীদের সংরক্ষিত আইনি ব্যবস্থা

নারীদের সংরক্ষিত আইনি ব্যবস্থা		
ক্রমিক নং	বিধিবদ্ধ আইন	সংরক্ষিত ব্যবস্থাপনা
১	বিড়ি সিগারেট কর্মীদের (চাকরির শর্তাবলী) অ্যক্ট ১৯৬৬	নারী কর্মী যেখানে ৫০ জনের বেশী সেখানে অর্থাৎ শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে শিশু রাখার ক্রেসের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।
২	ক্ষেত মজুর অ্যক্ট ১৯৫১	প্রত্যেক ক্ষেত-খামার বা চা বাগানে যেখানেই ৫০ জন বা তার অধিক নারী শ্রমিক কর্মরত অথবা যেখানে কর্মীদের শিশুদের সংখ্যা ২০ বা তার বেশী (কন্ট্রাক্টর দ্বারা নিযুক্ত মেয়েরাও এই অ্যাক্টে-এর অন্তর্ভুক্ত) সেখানে অবশ্যই ক্রেসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশু যতদিন মাতৃদুগ্ধের ওপর নির্ভরশীল থাকবে, কর্মরত অবস্থায় শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর সময় দিতে হবে।
৩	দি কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যন্ড অ্যাবলিশন অ্যক্ট ১৯৭০	যেখানে ২০ বা তার অধিক নারী সাধারণভাবে চুক্তি শ্রমে নিযুক্ত সেখানেও

	কন্ট্রাক্টর দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিক) (নিয়মাবলী ও তার বিলোপ)	ক্রেসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নার্স বা ধাত্রী ছাড়া কোনো নারীকেই ৯ ঘন্টার বেশী (অর্থাৎ সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যো সাতটা) কাজে নিযুক্ত রাখা যাবে না।
৪	অন্য রাজ্য থেকে আগত কর্মী (চাকরি পাওয়া এবং রক্ষা করার শর্তাবলী) অ্যাক্ট ১৯৭৯	২০ জনের অতিরিক্ত নারী শ্রমিক থাকলে তারা বহিরাগত কর্মী হিসাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সুবিধার্থে ক্রেসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষত তাদের সঙ্গে তিন মাস বা তার অতিরিক্ত দিনের জন্য চাকরিতে থাকার চুক্তি থাকলেও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৫	ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ১৯৪৮	সাধারণভাবে যদি কোনো ফ্যাক্টরিতে ৩০ বা ততোধিক মেয়ে কাজ করলে তাদের ক্ষেত্রেও ক্রেসের সুযোগ রাখতে হবে।
৬	খনি অ্যাক্ট ১৯৫২	খনির নীচে নারী শ্রমিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা বাথরুম, ধোওয়ার জন্য জলের ব্যবস্থা রাখা জরুরি।
৭	মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট ১৯৬১	চাকরিতে নিয়োগেরপর ৮০ দিন কাজ করলেই সেই নারী প্রসবকালীন ছুটির সুযোগ পাবেন। প্রসব হওয়ার পর বা গর্ভপাত হলে পরবর্তী ছ-সপ্তাহ সবেতন

		ছুটি পাবেন। শ্রমসাধ্য কোনো কাজ বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ, গর্ভাবস্থায় যা ক্ষতিকর তা করানো যাবে না, বিশেষত প্রসব হওয়ার আগে ছয় মাস। মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে প্রসবকালীন সুবিধা পাবেন। প্রসবের পূর্বে ও পরে শারীরিক অসুস্থতার নিরাময় যদি বিনামূল্যে না হয়ে থাকে তবে প্রসূতি ২৫০.০০ মেডিকেল বোনাসের সুযোগ পাবেন।
৮	সমবেতন অ্যক্ট ১৯৭৬	প্রুরুষ ও নারী সমকাজে বা এক ধরনের কাজের জন্য অ্যাক্ট অনুযায়ী সমবেতন পাবেন। বহিরাগত ন্রী শ্রমিকরা এই সুযোগ পাবেন। আইন মাফিক যদি কোনো কাজে মহিলাদের নিয়োগে বিধি নিষেধ না থাকে তবে মহিলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং চাকরির শর্তে পুরুষের সঙ্গে ফারাক থাকবে না।
৯	ই এস আই জেনেরাল রেগুলেশন অ্যক্ট ১৯৫০	মহিলাদের বিশেষত গর্ভপাত / গর্ভাবস্থায় দুর্বলতাজনিত রোগে, সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব হলে বা প্রসূতি শয্যাশায়ী হলে মেডিকেল সার্টিফিকেট তারিখ অনুযায়ী সুযোগ পাবে।

১০	বিড়ি শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড অ্যাক্ট ১৯৭৬	কেন্দ্রীয় পরামর্শদান কমিটিতে আরও মহিলা প্রতিনিধি প্রয়োজন।
১১	আয়রন, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোম খনি শ্রমিক ওয়েল ফেয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৬	ঐ
১২	লাইম স্টোন এবং ডলোমাইট খনি শ্রমিক ওয়েল ফেয়ার ফান্ড অ্যাক্ট ১৯৭৬	ঐ
১৩	অভ্র খনি শ্রমিক ওয়েল ফেয়ার ফান্ড অ্যাক্ট ১৯৪৬	ঐ
১৪	বাড়ি ও অন্যান্য নির্মান শিল্পের শ্রমিকদের (চাকরি পাওয়া এবং রক্ষার শর্তাবলী) অ্যাক্ট ১৯৭৬	বাড়ি নির্মান কাজে কোনো নারীকে কেন্দ্রীয় পরামর্শদান কমিটিতে থাকতে হবে। কন স্ট্রাকশন কোম্পানি ওয়েলফেয়ার ফান্ড অ্যাক্ট অনুযায়ী কর্মরত মহিলাদের প্রসব কালীন সুযোগ ও সংখ্যায় তাঁরা ৫০ জনের বেশী হলে ক্রেস-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১৫	শিল্প শ্রমিকদের চাকরি (স্থায়ী নিয়মাবলী) অ্যাক্ট ১৯৪৬	কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের যৌন নির্যাতন এড়াবার বা রদ করবার ব্যবস্থা রাখা জরুরি।

৩.২ সরকারি কার্যাবলী

আমরা চটশিল্পের মন্দার কারণগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলাম। এবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে চটের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কী ভূমিকা নিয়েছিল আমরা তা দেখার চেষ্টা করবো।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মূল পাটচাষ কেন্দ্রগুলি অধুনা বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায়, ফলতঃ পাটচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সরকার কিছু প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমতঃ আউশ ধানচাষের বদলে পাটচাষকে উৎসাহিত করা হয়। তা করতে গিয়ে ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে চাল উৎপাদন হলে সেই ক্ষেত্রে চালে ভর্তুকি দেওয়া হত। এর ফলে কাঁচা পাটের চাষ বৃদ্ধি পায়। পাট চাষের জমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ -এর মধ্যে বৃদ্ধি পায় পশ্চিমবঙ্গে তিনগুণ, আসামে দুইগুণ পর্যন্ত।[৪৭] পরবর্তীকালে সরকারি নীতি বদলে যায়, আউশ চাষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং এক ফসলি জমিতে যেখানে কেবলমাত্র আমন চাষ হয় সেখানে আমন চাষের আগে পাট চাষ শুরু করা হয়।

কাঁচা পাটের গুণগত মানের উন্নতি ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি যেমন একটি সমস্যা তেমনি সমস্যা হল মূলধনের অভাব ও যথাযথ বাজারজাতকরণ। এই সমস্যাগুলো নিরসনে সরকারের ভূমিকা কী এবং এর সার্থকতা বা কতটুকু? কাঁচা পাটের গুণগত মানের উন্নতি ও একর-প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গবেষণার স্তরে কিছু কাজ হলেও বাস্তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার অভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল জুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই.জে.ডি.পি) চালু হয় ১৯৭২-৭৩ সালে।[৪৮] কিন্তু তার লক্ষ্য যা ছিল তা

পূরণ হয়নি –অবস্থা এতটাই খারাপ যে পাট চাষের জন্য সারের যে মাত্রা ঠিক হয় তা আই.জে.ডি.পি অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ হয় না।

পাট চাষের ক্ষেত্রে প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যা বেশি। স্বাভাবিকভাবে মূলধনের অভাবটিই চলে আসে। এই ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা খুব বেশী দেখা যায় না। চাষীদের মোটামুটিভাবে নির্ভর করতে হয় ব্যবসায়ী বা মহাজনদের ওপর। দাদন নিয়ে অল্প দামে তাদের কাছেই মাল বেচে দিতে হয়। ফলতঃ চাষীরা আশাব্যঞ্জক দাম পায় না। মূলধন সরবরাহের যথাযথ ভূমিকা সরকার পালন না করলেও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা নেয়- জুট করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জে.সি.আই) তৈরি করার মাধ্যমে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে। এর মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্ট দামে বাজার থেকে পাট কিনতে থাকে। কিন্তু কর্পোরেশন কাজ করতে থাকে ভীষণ নীচু তারে- প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ১৫ বছরের মাথায় বাজারে আসা কাঁচা পাটের মাত্র ২৪% কিনেছে সরকার (১৯৮৫-৮৬)। কো-অপারেটিভ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও জে.সি.আই –এর ব্যর্থতার সাথে যুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রের তুলা চাষের ক্ষেত্রে কিন্তু কো-অপারেটিভগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত জে.সি.আই প্রায় কোনো কাজই করেনি। ১৯৯৭-৯৮ সালে জে.সি.আই কাঁচা পাট কেনে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার বেল, যেখানে ১৯৮৫-৮৬-তে এর পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ বেল, ১৯৮৬-৮৭-তে ২২ লক্ষ বেল।[৪৯] জে.সি.আই -এর কর্মপদ্ধতি নিয়ে কিছু না বললে বোধহয় কিছু কম থেকে যাবে। জে.সি.আই পূর্ব নির্ধারিত একটি দামে পাট কেনা বেচা করে, যা উন্নত মানের পাট চাষের পরিপন্থী। কারণ সেই নির্ধারিত দামে উচ্চ মানের পাট বিক্রি করতে পাটচাষীরা বিশেষ উৎসাহিত হয় না। ফলতঃ এন.জে.এম.সি মিলগুলি উন্নতমানের কাঁচা পাট বিশেষ পায় না।

পাটশিল্পের একটি দিক যেমন পাট চাষ, তেমনি আর একটি দিক হল কারখানা। এই কারখানার প্রধান সমস্যা হল আধুনিকীকরণ। যেটুকু আধুনিকীকরণ এই শিল্পে হয়েছে, তা হয়েছে ষাটের দশকে স্পিনিং এবং নন-স্পিনিং এর ডিপার্টমেন্টগুলিতে। অন্য ক্ষেত্রগুলিতে প্রায় হয়নি। আধুনিকীকরণে সরকার কিছু কিছু প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে নিয়েছে। যেমন একটা প্রচেষ্টা হল ১৯৭৬ আই.ডি.বি.আই -এর সফট লোন প্রকল্প। বাস্তবে মাত্র ৬ কোটি টাকা লোনের গ্রাহক পাওয়া গিয়েছিল। কারণ, যে কোনো সহজ লোনের সঙ্গেই কিছু বিশেষ শর্ত থাকে। কিন্তু মিল মালিকেরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। এরপর ১৯৮৬-এর নভেম্বরে আর একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয় -এই সময়ে মডার্নাইজেশন ফান্ড তৈরি করা হয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকার।[৫০] এই ফান্ড থেকে ১৪টি মিলে ৫৭.২৯ কোটি টাকা লোন অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিতরন হয় মাত্র ৮.৯ কোটি টাকা। এই ফান্ডের আভ্যন্তরীণ কাঠামোটির কিছু বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা প্ল্যান্ট ও মেশিনারী আধুনিকীকরণের জন্য; ৩০ কোটি টাকা রাখা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল পরিচালিত মিলগুলির জন্য, ২০ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের দেয় টাকার জন্যে এবং মাত্র ৬% সুদে।[৫১] এই প্রকল্পটির পরিচালক আই.এফ.সি.আই -কে ভর্তুকি দেওয়ার দায়িত্ব নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

উপরোক্ত সরকারি প্রচেষ্টাগুলি ছাড়াও সরকার ১৯৮৭ -তে Jute Packing Material Compulsory Use in Packing Commodity Act চালু করে।[৫২] এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক চট ও চটজাত থলের ব্যবহার চালু করে, খাদ্যশস্যের ও চিনির ক্ষেত্রে ১০০%, সিমেন্ট ও সারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০% ও ৫০% শতাংশ।[৫৩] সিমেন্ট ও সারের শিল্পে অবশ্য এই আইন লঙঘন করার প্রবণতা দেখা

যাচ্ছে। সরকারি ভূমিকা এই ক্ষেত্রে দুর্বল। এছাড়াও অন্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে আছে আমদানি শুল্ক ছাড় দেওয়া, পাটজাত পণ্যকে উৎপাদন শুল্কের বাইরে রাখা। এর বাইরে আছে সরকারি ক্রয় যার পরিমাণ মোট উৎপাদিত স্যাকের ৩০% শতাংশ।[৫৪] অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি প্রধান ত্রুটি হল সারা বছর ধরে অর্ডার না দিয়ে বছরে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় সব অর্ডার দেওয়া যা পাটকলগুলির পক্ষে অল্প সময়ে যোগান দেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

১৯৮৩ সালে শিল্পের রুগ্নতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত তেওয়ারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মোটামুটি এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে Sick Industrial Companies-Special Provisions-Act, ১৯৮৫, পাশ করে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে চালু করা হয়। এই আইন অনুসারেই ঐ বছর Board of Industrial and Financial Reconstruction, ১৯৮৭ বা সংক্ষেপে বি.আই.এফ.আর গঠিত হয়।[৫৫]

এই আইন প্রথমে শুধু বড় ও মাঝারি বে-সরকারি শিল্প কোম্পানির উপর প্রযোজ্য ছিল। ১৯৯৩ থেকে সরকারি কারখানার উপরও এই আইন প্রযোজ্য। যে সমস্ত কোম্পানি অন্তত ৭ বছরের পুরোনো এবং যার মোট লোকসানের পরিমাণ তার সঞ্চিত পুঁজির মোট পরিমাণ থেকে বেশী এবং যাদের ২ বছর পরপর নগদ লোকসান হয়েছে, তারাই সরকারি ভাবে রুগ্ন এবং তারা আইনত বাধ্য তাদের অবস্থা জানিয়ে বি.আই.এফ.আর -এর কাছে আবেদন করতে তাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য।[৫৬]

যে সমস্ত কোম্পানির লোকসান তাদের ঐ মোট পুঁজির অর্ধেকের বেশী, তারা আইনতঃ 'আধা রুগ্ন' এবং তারাও তাদের রিপোর্ট ঐ বি.আই.এফ.আর -এ জমা দিতে বাধ্য। বি.আই.এফ.আর -এর ক্ষমতা আছে তদন্ত করে কি করা যায় তা নির্ধারণ করার, একদিকে যেমন মজুর-মালিক চুক্তি বা ট্রাইব্যুনাল অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদিকে স্থগিত করে

দেবার মজুর বিরোধী অধিকার, তেমনি অন্যদিকে মালিক কারখানা চালাতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হলে সেই কারখানা চালাবার ভার ঐ কারখানার শ্রমিক সমবায়ের হাতে ছেড়ে দেবার।

যদিও শ্রমিক সমবায়ের অভিজ্ঞতা কোনও ক্ষেত্রেই ভালো নয়। তার জ্বলন্ত চিত্র কানোরিয়া শ্রমিক সমবায়। ঘোষিত প্রতিশ্রুতির কোনটিই সরকার পালন করে নি।

তালিকা – ১৩[৫৭]

সারণী:-৩.১.১৩ লক আউট-ধর্মঘট-শ্রম বিরোধ

বছর	লক-আউট	শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	শ্রম দিবস নষ্ট (লাখ)	ধর্মঘট	শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	শ্রম দিবস নষ্ট(লাখ)
১৯৯১	৫৩২	৪৭০	১৪০	১২৭৮	৮৭২	১২৪.৩
১৯৯২	৭০৩	৪৮৫	১৬১.৩	১০১১	৭৬২	১৫১.৩
১৯৯৩	৪৭৯	২৮২	১৪৬.৯	৯১৪	৬৭২	৫৬.১
১৯৯৪	৩৯৩	২২০	১৪৩.৩	৮০৮	৬২৬	৬৬.৫
১৯৯৫	৩৩৪	৩০৭	১০৫.৭	৭৩২	৬৮৩	৫৭.২
১৯৯৬	৪০৩	৩৩১	১২৪.৭	৭৬৩	৬০৯	৭৪.২
১৯৯৭	৫১২	৩৪৪	১০৬.৪	৭৯৩	৬৩৭	৬৩.০
১৯৯৮	৪৩২	৪৮৮	১২৭.১	৬৬৫	৮০১	৯৩.২
১৯৯৯	৩৮৭	২১২	১৬১.৬	৫৪০	১০৯৯	১০৬.২
২০০০	৩০৬	৩০৫	১৩৩.৫	৩৫০	৩৮৫	৩৩.৭

সূত্র: শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০

*২০০১ সালে আই ডি অ্যাক্টের ১২(৪) ধারায় রিপোর্ট এসেছে ২৬৪ টা এবং এর মধ্যে ১২.৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে ছাঁটাই এর ঘটনা ছিল।

৩.৩ ট্রেড-ইউনিয়ন -

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৮৬৬ সালে 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' আমেরিকার শ্রমিকদের একটি প্রতিষ্ঠানে দিনে আট ঘন্টা কাজের দাবীর অধিকার আইন হিসেবে যাতে লিপিবদ্ধ হয় তার জন্য সংগ্রাম চালাবার প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৫৮] ঐ একই বছর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কম্যান এ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রথম সাধরন সম্মেলনে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের দাবীকে সমর্থন জানায় এবং সেটি যাতে পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ দাবী হিসেবে গৃহীত হয় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেসের 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের' দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং সেই দাবীকে যারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ দাবী হিসাবে গ্রহণ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ভাবে কাজের দাবী কমাবার দাবীও আট ঘন্টা দিনে কাজের সময় সাধারণ দাবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে মে দিবসের আন্দোলন গোটা পৃথিবী জুড়ে এই দাবীর তাৎপর্যকে সামনে নিয়ে আসে এবং মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের ঘন্টা কমানোর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে।[৫৯]

মার্ক্স-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইস্তেহারে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক মুক্তি যে ছবি এঁকেছেন তাতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠন অপরিহার্য শর্তও হল সেই সংগঠন যা মজুরী শ্রমের চলতি সম্পর্কে বদল ঘটিয়ে শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের অনিশ্চয়তা ও অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক মুক্তি যা শ্রমের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত তার জন্য প্রয়োজন অন্যান্য সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য। নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যেমন এই ঐক্যের রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। তেমনই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যদি দুর্বল হয় সে ক্ষেত্রে এই ঐক্যের পূর্বশর্তটি

হয় অনুপস্তিত ও ভঙ্গুর।[৬০] উপরোক্ত প্রতিপাদ্য থেকে যে ঘোষণা তাই সংশয়াতীত ভাবে করা যেতে পারে তা হল ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণির শেষ অস্ত্র নয়।

দশকের পর দশক জুড়ে নিছক অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের সংস্কৃতি শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক উদ্যোগকে সীমাবদ্ধরাখার ক্ষেত্রে এই বাংলায় শুধু পাটশিল্পে নয় অন্যান্য সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। পাটশিল্প এলাকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পরিচিত কথা... "প্যায়সা সে জরুরত হৈ নগদ নারায়ণ চাহিয়ে হামারা" বা ধর্মঘটে "তবহি লিডার মানা যায় জব কামভি বন্ধ রহি ওর প্যায়সা ভি মিলি"– এসব জনপ্রিয় কথাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পাটশিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অর্থনীতিবাদের কোন আবর্তে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।[৬১] ফলত নিয়ম করে বছরে একবার বা দু-বার পাটশিল্পে ধর্মঘট আর অন্যদিকে কারখানা ভিত্তিক আলাদা আলাদা চুক্তির হিড়িক পাটশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনে যে সংকটকে আজ গভীরতর করেছে তার থেকে মুক্তির কোনো সহজ সরল রাস্তা খোলা নেই।

সিপিআই(এম) নেতা শ্রী জ্যোতি বসু হাওড়ায় বেঙ্গল চটকল মজুর ইউনিয়নের এক জনসভায় এক কালে বলেছিলেন... "জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভূলে শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে সামিল হন তাতে শুধু দাবী আদায় নয়, মানুষের মনে রাজনৈতিক আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তা সহায়ক হবে"।[৬২]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর "ট্রেড ইউনিয়নের ভেজাল" নিবন্ধে এক কালে বলেছিলেন "এক এক শিল্পে রাজনৈতিক দলপিছু এক এক ইউনিয়ন তো আছেই তার ওপর আছে অমুক ইউনিয়ন তমুকের ইউনিয়ন। ঠিকে মজুর, দিনমজুর, ঝি-চাকর বাদে শহরের প্রায় সবাই বোধ হয় এখন ইউনিয়ন বদ্ধ। উৎপাদনের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই সেই চাকরিজীবী লোকজনদের পাল্লা ক্রমশ ভারী হয়ে

ওঠার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতি প্রকৃতিতে কী কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে? বিশেষজ্ঞরা তা বলতে পারবেন। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সমাজের বাকি অংশকে দলে টেনে বিশ্বমানবের যে মুক্তির লক্ষ্য কেবলই আপাত লাভের পেছনে ছুটে সেই লক্ষ্যটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছুনেই তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক নয়। আসলে তার মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে পেটি বুর্জোয়ার ছোঁয়াচে রোগ"।[৬৩] এই পেটি বুর্জোয়া মহামারী করোনার মতই পাটশিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কী চেহারা নিয়েছে তা যে কোনো একটি কারখানার বুকে কান পাতলে ও নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করলে সহজেই অনুমান করা যায়।

তাই পুরনো ধরণের ট্রেড ইউনিয়নের যেসব ব্যবহারিক সূত্রগুলো ছিল যেমন কারখানার পাশের চা-য়ের দোকানে বসে রোজ নিয়মকরে মালিক বা ম্যানেজমেন্টকে চুটিয়ে গালাগালি দেওয়া তাহলেই তোমার সহকর্মী শ্রমিকদের জঙ্গী অংশটা তোমার চারধারে আসতে আসতে ভিড় করবে; এধরণের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি আজ আর খুব বেশী কাজ দেবে না। অথবা আন্দোলনের দিকে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার পূর্বধাপ হিসেবে শ্রমদপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে প্রাথমিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা বা আন্দোলন ধাক্কা খেলেও শ্রমদফতরকে তাৎক্ষণিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যতে আবার আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরী করার সুযোগ মেলে, এর উপযোগিতাও নতুন পরিস্থিতিতে বিশেষ নেই। নতুন পরিস্থিতিতে যেখানে শ্রম আইনের ব্যাপক পরিবর্তন আজ শুধু সময়ের অপেক্ষায়। যেখানে শ্রমিক অসন্তোষের "সেফটি ভ্যাল্ব" হিসেবে শ্রম আইনের পুরনো ভূমিকাতেও বিস্তর বদল আসতে চলেছে।[৬৪] সেখানে ওই মডেলকেও আজ পুরনো পরিত্যক্ত হিসেবেই দেখতে হবে। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন মডেলে শ্রমিক আন্দোলনের জন্য তৈরী করতে হবেনতুন সূত্রায়ণ।

আসলে বাঁধা চাকরি আর বাঁধা মাস মাইনের যে পরিবেশে শ্রমিক আন্দোলন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রধান ধারা হয়ে উঠেছিলো, তা কিন্তু চিরকালের নয়। ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণির জন্মানোর পর দীর্ঘকাল ধরে শ্রমিকদের জীবনে বাঁধা চাকরি আর বাঁধা মাস মাইনের অস্তিত্ব ছিলই না। সে সময়টা কিন্তু ছিল বড়ো বড়ো আন্দোলনের যুগ। মজুরী, কাজের পরিবেশ, চাকরির নিরাপত্তা, জীবন ধারণের পরিবেশ এমনকি দেশের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়েও শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছেন। সে সময়ে চাকরির দুর্লভ সুযোগ হাতে পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতা সম্ভবই ছিল না। সে সময়ের শ্রম পরিবেশই বলে দিচ্ছিল শ্রমিককে বাঁচতে গেলে লড়তে হবে প্রতি ঘন্টা প্রতি মুহূর্তে। এমনকী ৩০/৪০ বছর আগেও কয়লা শিল্প জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত কয়লা খনি শ্রমিকদের জীবনে চাকরির নিরাপত্তা বা মজুরির নিয়মিততা প্রায় ছিলই না।[৬৫] তার সঙ্গে ছিল মালিকের পোষা গুন্ডার গ্যাং। সেই পরিবেশে শ্রমিক আন্দোলন চলেছে দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশী ধরে। যখন খনিতে দুর্ঘটনা হয়ে শ্রমিকদের হাজিরা খাতা লোপাট করে দিয়ে মৃত আর আহতদের খনির ভিতরেই আগুন দিয়ে গাঁথনির ভিতরে গেঁথে ফেলা হত। যখন লড়াকু শ্রমিক নেতাকে বয়লারের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হত। শ্রমিক আন্দোলনের সে সময়ের চাপা পড়ে যাওয়া মডেলকে বাংলার মাটিতে বিস্মৃতির তলা থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদের। করে তুলতে হবে আজকের সময়ের উপযোগী।

বেশকিছু বছর আগে সিটুর হাতে ধর্মঘটি ঠিকা শ্রমিক খুন হওয়ার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকের রোষানলে ব্যারাকপুরের এক জুটমিলের অফিসারের মৃত্যু বা উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ছাঁটাই শ্রমিক জনতার হাতে শিল্পের কর্তাব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাও আগামীদিনে শ্রমিক আন্দোলনের জঙ্গী মডেলের অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখায়।

শ্রমিক আন্দোলনের বিলুপ্ত মডেলকে পুনরুদ্ধার আর যুগপোযোগী করে তুলতে হবে। কিন্তু পুরনোকে দেখতে হবে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং তার খাদ ফেলে সার গ্রহণ করতে হবে আমাদের। পুরনো সবকিছুই ঠিক না। এটা পরিষ্কার যে পুরনোদিনের শ্রমিক আন্দোলনের ভিতের উপরেই দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালের শ্রমিক আন্দোলনে আইন-নিয়মতান্ত্রিক-আপোষকামী ধারার জন্ম হয়েছিল।[৬৬] পুরনো শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ঠ লড়াকু আর জঙ্গী হলেও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ছিলনা। সে জঙ্গী আন্দোলন থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন দখলকারী আর রেষারেষি একদিকে আর অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্র। অন্যদেশের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের থেকেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রুশ শ্রমিক আন্দোলন থেকে আমরা শ্রমিক চক্রের আর গণরাজনৈতিক পত্রিকার সাংগঠনিক মডেল ইতিহাসে পাই। আমাদের দেশেও অনেক যায়গায় শ্রমিক চক্রের সাংগঠনিক মডেল ব্যবহার হয়েছে। শ্রমিকরা কাজথেকে ফিরে এসে যখন দেখে এক নারকীয় পরিবেশে বা বৈচিত্রহীনতা আর একাকিত্ব যেখানে নিয়মিত বিনোদন বলতে কিছুনেই শুধু দুই ম-কার ছাড়া, যেখানে কাজের জায়গাতেও শ্রমিকরা মুখোমুখি হয় ম্যানেজমেন্টের স্বেচ্ছাচার, খেয়ালখুশি লাল চোখের, মাসে যেখানে বহু শ্রমিকই দু-বার বেতন পায়, একবার কাউন্টার থেকে তো আর একবার সুদখোর মহাজনের কাছথেকে, যেখানে শুধু কাজের জায়গাই নয় বরং সর্বত্রই শ্রমিকদের সহ্য করতে হয় চাতুরি ধোঁকাবাজি শোষণ; যেখানে জীবন্তভাবে পরিচালনা করতে পারলে শ্রমিকদের আলোচনা চক্রগুলো শ্রমিকদের প্রাথমিক বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলার এক চমৎকার মাধ্যম হতে পারে, একই সঙ্গে হতে পারে তাদের সংগঠনের একটা জীবন্ত রূপও। শ্রমিকদের কাজের বৃহদায়তন কর্মব্যস্ততার জায়গা, যেখানে তাঁরা সামাজিক

শ্রমবিভাগের অংশীদার হয়ে সমগ্র সমাজের সঙ্গে সম্পর্কে আসে যেটা তাঁদের গোটা জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ, যেখান থেকে তাঁদের পাওয়ার কথা এক উজ্জ্বল সামাজিক পরিচয়ের মর্যাদা, যেখানে তাঁদের সত্যিকারের ভূমিকা হল বীরের আর শিল্পীর। কিন্তু সে জীবন তাঁদের নিজেদের নয়, সেটা তাঁদের বিক্রি হয়ে যাওয়া জীবন আর সে জীবনের পরে শুরু হয় তাঁদের একান্ত নিজস্ব বলতে যে জীবন, সে জীবনে তাঁদের জন্যে পরে থাকে শুধু ঝুজ্ঞি ঝোপড়ির পুতিগন্ধভরা অন্ধকার।[৬৭] যে কোনোও শ্রমিকের কাছে জীবন্তভাবে একথা বললে তা আকর্ষণহীন বিনোদনবঞ্চিত জীবনে সে এক নতুন চমক আর আকর্ষণ বোধ করবেই। ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে এই আলোচনা চক্রগুলোকে আকর্ষণীয় আর নিয়মত করে তোলা খুবই সম্ভব। আর চক্রের নিয়মিত সদস্যদের অন্য অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগের দ্বার খুলে যেতে পারে। রাজনৈতিক শ্রমিক পত্রিকাও শ্রমিকদের রাজনীতি সচেতন করার আবার একই সাথে তাঁদের সংগঠিত করার এক পরীক্ষিত মাধ্যম হতে পারে। দরকার শুধু এ নিয়ে স্বপ্ন দেখার, সৃজনশীল ভাবে উদ্যোগ নেবার। আর জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাবার।

কারখানা আর কলোনির বৃত্তের ভেতরের বিচ্ছিন্ন জীবন, শুধু মজুরী বাড়ানোর উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়া, স্থায়ী আর অস্থায়ী শ্রমিকদের দুই আলাদা দুনিয়া দৈনন্দিন শ্রম-সম্পর্কে মিডিলম্যানদের ওপর নির্ভর করে চলা, আর আইনের ঘেরাটোপের গন্ডির ভেতরের শ্রমিক আন্দোলন সবটা মিলিয়ে নিশ্চিত চাকরি আর ধরা বাঁধা মাস মাইনের পরিবেশে শ্রম-সম্পর্কের এতকালের যে চালু মডেল ছিল, তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শ্রমিকদের এতকালের ধরা বাঁধা জীবন, শ্রম সম্পর্কের পুরনো ছক, সব মিলিয়েই এতকালের পুরনো মডেল আজকে হারিয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা। নিশ্চিত

চাকরি আর বাঁধা মাস মাইনের কাজের পরিবেশের সংকট শ্রম সম্পর্কের পুরনো মডেলও এনেছে সংকট আর পুরনো মিডিলম্যানদের গ্রহণযোগ্যতাতেও সংকট ডেকে এনে শ্রমিকদের চোখে তাঁদের বানিয়েছে 'নিকম্মা'।[৬৮]

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে যে শূন্যতা আজ তৈরী হয়েছে সেখানে সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠার উপযুক্ত মুহূর্ত এসে গেছে আজ যেখানে অর্থনীতিবাদের জায়গা নিতে হবে কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে আর গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামকে। যেখানে কারখানার মধ্যে শ্রমিকের গন্ডিবদ্ধ জীবনে জায়গা নিতে হবে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিকের ঐক্যকে। যেখানে মিডিলম্যানদের ওপর নির্ভরতার জায়গা নিতে হবে শ্রমিকদের স্বাধীন উদ্যোগকে এবং যোজনাবদ্ধ ভাবে ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে রূপ দিতে হবে রোজকার শ্রেণি সংগ্রামকে যে সংগ্রাম তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বলবে ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণির শেষ অস্ত্র নয়। কিন্তু এসবই করতে হবে রোজকার বাস্তব সমস্যার ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আর কথার ফানুস দিয়ে নয় কখনোই।

চাকরির নিরাপত্তা আর ধরাবাঁধা মাস মাইনে যতই অনিশ্চিত হয়ে ওঠে সংগঠিত ক্ষেত্রে, আকাশছোঁয়া জিনিসের দাম যখন প্রকৃত মজুরীকে টেনে নামায় নীচে যখন পরবর্তী প্রজন্মের কাজ পাবার সম্ভাবনা থাকে অন্ধকারে, যখন অস্থায়ী মজুর আর ঠিকা মজুর নিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্র বাড়তে থাকে হু-হু করে, যখন অসংগঠিত ক্ষেত্রের মজুরদের জীবন হয় অসহনীয় আর চরম দুর্দশাগ্রস্ত, যখন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপরে আক্রমণ নেমে আসে সংগঠিত ভাবে, যখন অর্জিত অধিকার হরণ হয়ে ওঠে দৈনন্দিন ঘটনা, যখন শ্রমিক আন্দোলনের ওপরে হয় একের পর এক রাজনৈতিক মাফিয়া চক্রের আক্রমণ, তখন যেহেতু শ্রমিকের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হল লড়াই। তাই তখন শ্রমিক অসন্তোষ বারবার ফেটে পড়বে অনিবার্যভাবে, আর ইস্যু যদি জ্বলন্ত

হয়, পুরোভাগে শক্তির যদি গ্রহণ যোগ্যতা থাকে, সে শক্তির সহমর্মিতা-সততা-সাহস-বিচক্ষণতা রাজনৈতিক চেতনা যদি শ্রমিকদের কাছে নির্ভযোগ্য বলে মনে হয় তাহলে শ্রমিক অসন্তোষের অভ্যুত্থান বাংলার শিল্প মানচিত্রে দেখা যাবে একের পর এক।

৩.৪ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা -

জুটশিল্পে ধর্মঘট আর লকআউটের যে ধারাবাহিক চিত্র তার সালতামামি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যতদিন গেছে ততই শ্রমিকরা তাদের আঘাত করার ক্ষমতাকে হারিয়েছে।মালিকপক্ষের আক্রমণের তীব্রতা দিন দিন বেড়ে গেছে। শ্রী অমিয় বাগচি "Economic and political Weekly"(EPW; V.47; Nov-Dec 98) একটি লেখায় বলেছেন "জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন কমতে থাকার এক অন্যতম কারণ হল অনেক কারখানায় ক্রমহ্রাসমান কর্মসংস্থান।উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে ১৫টি চটকলের ৪৫০০০ শ্রমিক তাঁদের কাজ হারান"। ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন ছিল লড়াকু,জঙ্গি মনোভাবের। ক্রমশই যেন সেই মনোভাবটা বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরোয়া না করে যেভাবে স্থানীয় ভাবে চটকলের ইউনিয়নগুলি ও মালিকেরা নিজেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে ধর্মঘট ভেঙ্গে কাজে অংশগ্রহণ করেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। পরিস্থিতির জন্যে কে দায়ী সে আলোচনার স্থান এটা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি এখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।তবে এই সার্বিক অন্ধকারের মধ্যেও বারবার যে রুপালী রেখা ঝলসে উঠেছে সে বিষয়টার উল্লেখ না করলে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রতিষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়নকে অস্বীকার করে কোথাও কোথাও চটকল শ্রমিকেরা তৈরি করেছে নিজস্ব সংগঠন; চালিয়েছে নিজস্ব লড়াই। এই লড়াই নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে গেছে তবুও চটকল শ্রমিকদের লড়াইয়ের

এই ধারার অবদান শ্রমিক আন্দোলনে অনেকদিনই থেকে যাবে।বাম জমানার চৌত্রিশ বছরে ভিক্টোরিয়া জুটমিলের শ্রমিক ভিখারি পাসোয়ানের ঘটনা বা বরানগর জুটমিলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে পুড়িয়ে মারা, মাঠকল বা গ্যাঞ্জেস জুটমিলে শ্রমিকদের দ্বারা কারখানার যন্ত্রপাতি পুড়িয়ে দেওয়া অথবা তৃণমূল জামানায় নর্থব্রুক জুটমিলের কারখানা চত্বরে ম্যানেজমেন্ট আধিকারিককে হত্যা করার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও আদিমতম নিগ্রহের বিপরীত প্রতিক্রিয়া কতটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল ঘটনার ফলশ্রুতিতেই নেমে এসেছে তীব্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট লুম্পেনবাহিনীর তাণ্ডব শ্রমিক এলাকাগুলিতে এবং দোষী-নির্দোষ বেশ কিছু শ্রমিকের গ্রেপ্তারী ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ধীরে ধীরে পরিবারগুলি শেষ হয়ে যাওয়ার দিকে সব কিছু শেষ হয়েছে।অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলি এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। জঙ্গি ও অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের এই চেহারা আমাদের অতীত ইংল্যান্ডের সেই লুডাইট মুভমেন্ট বা যন্ত্র ভাঙ্গার আন্দোলনের কথা মনে করায় যখন বিজ্ঞানসম্মত চেতনার অভাবে শ্রমিকের শ্রেণীঘৃণা কারখানার যন্ত্রকে আপাতলক্ষ্য বলে আঘাত করে ব্যর্থ হত বারবার।বলাই বাহুল্য সংসদীয় দলগুলির দীর্ঘ সাংগঠনিক উপস্থিতি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক হয়নি।নয়তো পরিণতি এত সকরুণ হত না।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে প্রথম বড় শিল্প ধর্মঘট সংগঠিত হয় ষাটের দশকে। ১৯৩৭ সালের চটকল শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলনের ৩২ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে ৪ থেকে ১১ আগষ্ট পর্যন্ত এক বৃহৎ ও সফল ধর্মঘট সংগঠিত হয়। এই ধর্মঘট বিভিন্ন কারণে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর এই প্রথম বড় সুসংগঠিত

ধর্মঘট। দ্বিতীয়তঃ এইসময় কেন্দ্রে কংগ্রেসি শাসন থাকলেও বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগঠিত হয় যার নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট নেতারা।তৃতীয়তঃ এই ধর্মঘট অতীতের ধর্মঘটের চেয়ে পৃথক ছিল।কারণ ব্রিটিশ আমলে বা ১৯৩৭-৩৯ সময়পর্বে কংগ্রেসি আমলের মত ধর্মঘট ভাঙানোর জন্য পুলিশের প্রয়োগ না করে তৎকালীন জোট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মধ্যস্থতায় এক ত্রিপাক্ষিক আলোচনায়র মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটে। সম্ভবত শ্রমিক ইতিহাসে এই প্রথম ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হল। চটকলে দ্বিতীয় বড় ধর্মঘট সংগঠিত হয় ১৯৭৯ সালে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০ দিনের জন্য। তৃতীয় বড় ধর্মঘট সংগঠিত হয় ১৯৮৪-তে ৮৪ দিনের জন্য। এই সমস্ত ধর্মঘট গুলিতে শ্রমিকদের একাধিক দাবী ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীত হয়। ১৯৮৪ সালের সমঝোতা অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিকের ৬৫ টাকা মজুরী বৃদ্ধি করা হয়। ডিএ বৃদ্ধি পায় ৫.৬০ টাকা। অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত করে দেখা যায় শ্রমিকদের প্রায় ১০০ টাকার বেশি মজুরীর বৃদ্ধি ঘটে। এই সমঝোতার শেষে শহিদ মিনারের মাঠে এক বিশাল সমাবেশ হয় এবং এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই সময়পর্বে চটকল অধ্যুষিত শ্রমিকদের বস্তিগুলি ক্রমশ নগরে রূপ নিতে থাকে এবং আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষা স্বাস্থ্য সুস্থ পরিবেশ প্রভৃতি প্রশ্ন যেমন জোরদার হতে থাকে তেমনই চটকলকে কেন্দ্র করে এক মিশ্র সংস্কৃতির উত্থান ঘটে।প্রথমপর্বে কিছু বামপন্থী নেতা চটকল শ্রমজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও স্থানীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের গ্রহণ যোগ্যতা কতটুকু ছিল তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। আশির দশক পরবর্তী কালে এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসেন অ-বামপন্থী অ-কমিউনিস্ট হিন্দিভাষী স্থানীয় নেতারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্থানীয় অবাঙালী নেতারা

প্রাথমিক জীবনে চটকলের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। উক্ত সময়পর্বে চটকল গুলিতে ক্রমাগত ট্রেডইউনিয়ন এর কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ায় চটকলগুলিতে সর্দারের প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে থাকে।এই সর্দাররাও তাদের বিকল্প অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়, এবং দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সর্দাররাই স্থানীয় রাজনীতিতে এই অবাঙালি শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। অবশ্য কালক্রমে রাজনীতিই এই নব উদিত নেতাদের প্রধান জীবিকায় পরিণত হয় এবং চটকল জীবনের সাথে এদের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হতে থাকে।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে,স্বাধীনতা-উত্তর চটকল শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমদিকে চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতির সাময়িক সংযোগের ফলে এই চটকল অধ্যুষিত অবাঙালীদের মধ্যেও বামপন্থীদের প্রভাবও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্বের প্রথম প্রজন্ম শেষ হতে না হতেই বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। কালক্রমে বাংলার রাজ্য রাজনীতি এবং চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বামপন্থীরা নিজ প্রভাব বজায় রাখলেও স্থানীয় রাজনীতিতে তারা অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকে। ফলে এসব অঞ্চলে দেখা যায় এক নতুন ধরণের রাজনীতি যা পরিবর্তীকালে এক সামন্ততান্ত্রিক পরিবারতান্ত্রিক রূপ ধারন করে। চটকল শ্রমিক আন্দোলনে ১৯৯০ থেকে ২০১১ এক গুরুত্বপূর্ণ সময় পর্ব। ১৯৯১ সালে ভারতের আত্মনির্ভর আর্থিক তথা শিল্পনীতিকে বিসর্জন দিয়ে নরসিমহা রাও এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বায়ন তথা উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেন। এর এক বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে চটশিল্পের ওপর। এই নীতির ফলে অনেক চটকল বন্ধ হয়ে যায়। বহু চটকলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। চটকলে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমতে থাকে। স্থায়ী শ্রমিকের জায়গায় ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ঠিকা

শ্রমিকের বেতন ছিল কম। অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাও এই ঠিকা শ্রমিকদের দিতে হত না। ছাঁটাই লকআউট দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। চটকলগুলির হাত বদল হতে থাকে। ফাল্গুনী মুখ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বর্তমানে জুটমিলগুলোর হাত বদল শুরু হয়েছে। যারা কিনছে তারা সব আগে কাঁচা পাটের দালালী করত। কাজেই ওরা মালিক হওয়ায় জুটমিল সমূহের ক্ষতির আশঙ্কা, এরা নিয়ম নীতি মানবে না। ইউনিয়ন আর শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেবে না। তাঁর মতে "এত লিডার এত আন্দোলন অথচ লড়াইয়ের অবস্থা দিন দিন খারাপই হয়েছে"। এবং উল্লেখযোগ্য বামফ্রন্টের শাসন পরবর্তী দশকগুলিতে যত মজবুত হয়েছে চটকলের পরিস্থিতির অবনতি ও সামগ্রিক সংগ্রাম বিমুখতা বেড়েছে উত্তরোত্তর।চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে ১৯৯০এর দশক থেকে সংগ্রামী চরিত্রের অবক্ষয় লক্ষ করা যায়। চটকলগুলিতে ট্রেডইউনিয়নের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বের পূর্বেই বহু লড়াকু নেতাই প্রয়াত হন নতুবা রাজনীতি থেকে অবসর নেন।নতুন প্রজন্মের নেতারা মুখে মার্ক্সবাদের কথা বললেও কর্মে তার প্রতিফলন পাওয়া যায় না। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় "এরপর অনেক আদর্শবান নেতাই একে একে বিদায় নিলেন।তাঁদের শূন্যস্থান পূরণে যারা এগিয়ে এলেন তাঁরাই এখন মালিকের সব জোরজুলুম মেনে নিচ্ছেন। একসময় যারা কথায় কথায় কারখানা বন্ধ করার শ্লোগান তুলতেন, তাঁরাই বলছেন.... "কাম করো, প্রোডাকশান করো। মালিক বাঁচলে তব না তুমহারা রোজিরুটি। এক কদম আগে বাড়ো তো দো কদম পিছে হটো"।

চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বামপন্থীরা প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণরূপে না হারালেও চটকল বহির্ভূত স্থানীয় রাজনীতিতে চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নির্বাচনী ফলাফল দেখলে বোঝা যায় ১৯৯০-২০১১ পর্যন্ত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিধানসভায়

বামপন্থীদের জয় নিরবিচ্ছিন্ন হলেও এমনকি ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন ওয়েভেলি জুটমিল, গৌরিশঙ্কর জুটমিলে বামপন্থী শ্রমিকইউনিয়ন ক্ষমতা দখলে রাখলেও ওই একই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চল বা বিধানসভা অন্তর্গত পৌর অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত অবাঙালী হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলিতে, অবামপন্থী নেতাদের প্রভাব অনেক বেশি বাড়তে থাকে। এই নব উদিত অবামপন্থী নেতাদের উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায় এদের প্রথম প্রজন্ম কোনও না কোনও ভাবে চটকলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কালক্রমে উক্ত অবাঙালী অঞ্চলে এদের প্রভাব বাড়তে থাকে। এরা কোনও একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্বাসী বলে মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গারুলিয়ার চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত হিন্দিভাষী অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সিং পরিবারের প্রভাব বজায় আছে। বর্তমানে সুনীল সিং উক্ত অঞ্চলে টিএমসির পৌরপ্রধান, তাঁর বাবা শ্রী কেদার সিং এককালীন কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। আবার কংগ্রেসি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি যথাক্রমে এইচএমএস, লোকদল, ফরওয়ার্ড ব্লক এর সদস্য ছিলেন। একই চিত্র দেখা যায় ভাটপাড়া অঞ্চলে যেখানে সত্যনারায়ণ সিং প্রথম জীবনে কংগ্রেস দলের সভ্য হলেও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে তাঁর সন্তান অর্জুন সিং টিএমসির সভ্য রূপে উক্ত অঞ্চলে বিধায়ক তথা পৌরপ্রধান হন (বর্তমানে ভারতীয় জনতা দল এর সাংসদ)। সুতরাং সহজে অনুমেয় এদের রাজনীতি কোনও একটি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত নয়। আবার এই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশ তথা বিহারের রাজনীতির ছাপ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ এই অঞ্চলেও একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে। ফলে রাজনীতি এখানে ক্রমশ পরিবারতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক রূপ নিতে থাকে। অবাঙালী শ্রমজীবীরা, এমনকী বামপন্থী দরদি সমর্থকরাও মনে করে বামপন্থী নেতাদের সাথে এই অবামপন্থী, স্থানীয় হিন্দি ভাষী

নেতাদের এক গোপন সমঝোতা বা বোঝাপড়া আছে, যা তারা সেটিং শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এই সমঝোতা বা সেটিং এর রাজনীতি করতে গিয়ে বোধ হয় বামপন্থীরা এই হিন্দিভাষী অঞ্চলে তাঁদের নিজস্ব বামপন্থী নেতা তৈরির কোনও আন্তরিক প্রচেষ্টা করেননি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব' ও 'লবিবাজি'। যার ফলে উক্ত অঞ্চলে এই অবামপন্থী নেতাদের উদ্ভব ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসার সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং সাভাবিক ভাবেই উক্ত সময়পর্বে এ অঞ্চলগুলিতে বামপন্থীদের দৈন্য প্রকট হয়। ২০১১ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের যে ঝড় ওঠে তাঁর বহু পূর্বেই এই অবাঙালী শ্রমজীবীদের অঞ্চল থেকে বামপন্থীরা নিশ্চিহ্ন হতে থাকে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এই চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। চটকলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে চটকল বহির্ভূত রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য ছিল বিস্তর। স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দুই দশক এই চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ছিল ক্ষীণ। কিন্তু ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে বামপন্থীরা সংগ্রামের জোয়ার নিয়ে আসে। যদিও এই বামপন্থীরা চটকল বহির্ভূত শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি। কিন্তু ১৯৯০এর পরবর্তী বিশ্বায়নের যে নেতিবাচক প্রভাব চটশিল্পে পড়ে, তা শ্রমজীবীদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। চটকলে ছাঁটাই, ধর্মঘট, লকআউট, দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়।অন্যদিকে দরদি শ্রমজীবী নেতাদের অবসর গ্রহণ তথা প্রয়াত হওয়ার দরুন নব নেতাদের উদয় এবং আপোষহীন সংগ্রামের পথ থেকে 'সেটিং' বা সমঝোতার পথ গ্রহণ তাঁদের সংগ্রামী জীবন থেকেও সরিয়ে আনে,যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় রাজনীতিতে।

তথ্যসূত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা মার্চ ৩, ১৯৬২ ন্যাশনল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৫

২. আনন্দবাজার পত্রিকা মার্চ ৫, ১৯৭৬ ন্যাশনল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৭

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা জুলাই ১৫, ১৯৭৬ ন্যাশনল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৭

৪. Labour in West Bengal 2013-14, Department of Labour, Govt. of West Bengal, Writer's Bulding, Kolkata, পৃষ্ঠা. ৫২, ৭১, ৮৫

৫. Industrial Disputes Act, 11 March - 1947

৬. তদেব।

৭. Labour in West Bengal 2013-14, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১২

৮. তদেব।

৯. তদেব।

১০. তদেব।

১১. Labour in West Bengal 2013-14, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৩

১২. তদেব।

১৩. তদেব।

১৪. Industrial Disputes Act – 1947, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫

১৫. Labour in West Bengal 2013-14, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৪

১৬. Amritabazar Patrika, Friday December 12, 1980, Department of International Relations, Taraknath Paper House, p-5

১৭. Amritabazar Patrika, Tuesday December 30, 1980, p-7

১৮. Jerome Joseph and Srinath Jagannathan. 'Employment Relations & Managerialist Undercurrents – The Case of Payment of Gratuity Act. 1972'. Indian Jounal of Industrial Relations, October 2011, Vol. 47, No. 2 (October 2011). P-253-263

১৯. তদেব।

২০. তদেব।

২১. Commission for Agricultural Costs and Prices. Ministry of Agriculture & Farmers welfare, Government of India. Report on Prices Policy For Jute For Season 2010-2011.

২২. Alexander R. Murray. 'The Jute Industry'. Journal of the Royal Society of arts, August 3rd, 1934. Vol.82, No. 4263 (august 3rd 1934). P- 977-996

২৩. Jute Corporation of India, Vigilance Bulletin 2019, p-23

২৪. Sangeeta Shroff. 'Cotton Sector in Maharastra', October 15, 2005, p-27

২৫. Dr. Durgaprasad Navalla, et all. 'A Study on Industrial Factors Analysis of Industrial Sickness: With Reference to Priyadarshini Spinning Mills Limited'. Journal of Xi'an Shiyou, Natural Science Edition. P- 135-145

২৬. তদেব।

২৭. তদেব।

২৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, মে ৪, ১৯৫৩, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৫

২৯. Md. Mahbubul Islam, et all, 'Industrial Research Advances of Jute in Bangladesh'. International Journal of Agriculture and Biosystems Engineering 2018; 3(1); p-1-9

৩০. Act, Trade Union. "Industrial Law" by PL Mishra." (1926).

৩১. Labour in West Bengal 2013-14, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৬

৩২. Jerom Joseph & Srinath Jagannathan. 'Employment Relations & Manegerialist Undercurrents – Te Case of Payment of Gratuity Act, 1972. Indian Journal of Industrial Relations, Vol.47 No.2, (October 2011)

৩৩. বিরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ১৮৮০-১৯৩৭

৩৪. Economic Servey 1999-2000

৩৫. জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫০ তম এবং ৫৫ তম রাউন্ড

৩৬. শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০-২০০১

৩৭. ইকোনমিক সার্ভে ২০০১-২০০২, শ্রমমন্ত্রক (DGE & T)

৩৮. শ্রমমন্ত্রক ভারত সরকার ২০০০-২০০১

৩৯. ইনফরমাল সেক্টর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম রাউন্ড ১৯৯৯-২০০০

৪০. তদেব।

৪১. তদেব।

৪২. ইকোনমিক সার্ভে ২০০১ – ২০০২, শ্রমমন্ত্রক (DGE & T)

৪৩. Labour in West Bengal 2013-14, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৭

৪৪. তদেব।

৪৫. তদেব।

৪৬. তদেব।

৪৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, মে ২০, ১৯৫৬, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ.৭

৪৮. Bedanand Chaudhary. 'Jute Research and Development in Napal: Status and Future Strategies'. Proceeding of the Third SAS-N Convention, 27-29, August, Kathmandu.

৪৯. Amritabazar Patrika, Monday 12 December, 1983, p-11

৫০. Amritabazar Patrika, Friday 3 May, 1981, p-5

৫১. বি. আই. এফ. আর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

৫২. Amritabazar Patrika, Wednesday 27 May, 1981, p-7

৫৩. Amritabazar Patrika, Sunday 7 September, 1986, p-4

৫৪. তদেব।

৫৫. Amritabazar Patrika, Saturday 13 September, 1986, p-6

৫৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জুন, ১৯৯৩, নিউজ পেপার সেকশন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৪

৫৭. শ্রমমন্ত্রক বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০

৫৮. ন্যাশনল লেবার ইউনিয়ন ১৮৬৬

৫৯. তদেব।

৬০. Sarath Devala, 'Independent Trade Unionism in West Bengal', Economic and Political Weekly, Vol.31, No.52 (December 28, 1996) p. L44-L49

৬১. তদেব।

৬২. Amritabazar Patrika, Monday 15 June, 1987, p. 9

৬৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'ট্রেড ইউনিয়নে ভেজাল'

৬৪. Deepita Chakravarty, Indranil Bose, 'Industry, Labour and the state: Emerging Relations in the Indian State of West Bengal', Journal of South Asian Development, October 10, 2011, 6(2), p. 169-194

৬৫. দেবশ্রী দে। 'পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত ১৯৪৭ – ২০১০', এপ্রিল ২০১২, সেতু প্রকাশনী, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা – ৬,

৬৬. তদেব, পৃ. ৭৯

৬৭. নব দত্ত। নাগরিক মঞ্চ।

৬৮. তদেব।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১. বিশ্বায়ন : পুঁজির সঞ্চয়ন ও নয়া উদারবাদের জয়যাত্রা

"Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30"-র রিপোর্টে বলা হয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে পাটের উৎপাদন ছিল বাংলার প্রায় একচেটিয়া।[১] সমগ্র উপমহাদেশের প্রয়োজন মিটিয়ে যে পাট ও চট রপ্তানি হতো তা থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারত বাণিজ্যিক খাতে মোট যত বৈদেশিক মুদ্রা পেতো তার অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ ছিল। কিন্তু বাংলার পাটচাষী প্রায় দেনায় ডুবে থাকতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলি থেকেই মফ:স্বলের পাটের বাজারে মাড়োয়ারী আড়তদার প্রভৃতি ভিড় জমাতো। পাটের ব্যবসার একটা বড় অংশ মাড়োয়ারীদের দখলে চলে যায়। ইংরেজদের চটকলগুলো ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে পাট কিনতো, সরাসরি ভারতীয়দের কাছ থেকে কিনতো না। ইংরেজ কোম্পানি মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে এবং নিজেরা মফঃস্বলের বাজার থেকে কিনে মিলকে সরবরাহ করতো। দালালের দালাল ভূমিকা ছিল মাড়োয়ারীদের।[২] মিল পাটচাষীদের নানাভাবে ঠকাতো। বিভিন্ন রকম মাপ ছিল, সেটা ঠকাবার একটা কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তা ছাড়া পাটকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হতো। মিলগুলো অনেক সময় প্রথম শ্রেণীর পাটকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করে পাটচাষীদের কয়েক কোটি টাকা ঠকাতো।

জন গ্যালাগার প্রমুখ অনেকে বলেছেন যে, যে পাটের দামের উপর অসংখ্য বাঙালী কৃষকের জীবন নির্ভর করতো তা নিয়ন্ত্রিত হত কলকাতার বড়বাজার থেকে।[৩] সেখানে পাটের দাম নিয়ে ফাটকাবাজি হত এবং দাম যথাসম্ভব কমানো হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক বছরের মধ্যে পাটের দাম আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগেরও কম হয়ে যায়। অন্যদিকে যুদ্ধের কল্যাণে পাটের চাহিদা অস্বাভাবিক রকম

বৃদ্ধি পায় এবং য়ুরোপীয় চটকল মালিকরা ও মাড়োয়ারী মুৎসুদ্দিরা আকাশছোঁয়া মুনাফা করে। যুদ্ধের সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এই মুৎসুদ্দিরা। কাপড় ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ১৯১৮-এর মধ্যে তাদের কল্যাণে দ্বিগুণ হয়।[৪] মাড়োয়ারী সমাজের ঐতিহাসিক বালচাঁদ মোদি লিখেছেন, যুদ্ধের বছরগুলোতে বড়বাজারের উপর ধনসম্পদ বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হচ্ছিল। বিড়লাদের সম্পদ এই চারবছরে চারগুন বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধের পরের বছর গুলিতে য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররা চেষ্টা করে পাটের দাম যত কমানো যায়। পাবনা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় মাড়োয়ারী দালালরা আগামী ফসলের উপর চাষীদের দাদন দিতে এগিয়ে আসে। অর্থের একান্ত প্রয়োজনে চাষীরা এই দাদন নিতেন এবং পাট উঠলে সেটা জলের দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতেন।[৫]

সেদিন পাটচাষীদের বেদনার কথা গ্রাম্য কবির কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল। ময়মনসিংহের এক গ্রামের কবি আবদুল সামেদ মিঞা লিখেছিলেন...

"পাট আসিয়া যখন দেশেতে পৌঁছিল,
পশ্চিমা এসে তখন দখল করিল।
এখন তাদের হাতে দেখ পয়সা হৈল,
বাঙালীরে তারা দেখ কিছু না বুঝিল।
না মিলে বাঙালীরে রেঙ্গুনের ভাত,
বুবা হয়ে গেল দেখ বাঙালীর জাত"।[৬]

আর এক কবি রংপুরের গ্রামের আবেদ আলি মিঞা মাড়োয়ারী কর্তৃক পাটচাষীদের শোষণের চিত্র এঁকেছেন...

"মাড়োয়ারীরা লাখ পতি,

হাল ঠেলেও ভাই ভাত পাবে না।

আছে তাদের চক্ষে জ্যোতি,

চুনে নিছে বঙ্গের মতি।

শেষে কি তোর হবে গতি,

এ সংসারে ভাই পর ভাবনা ।

দিনে দিনে দেখতে পাবে,

মাড়োয়ারীদের হাতে যাবে;

তোমরা দেশে কলা খাবে,

কান্দবে ঋণ হিসাবের দিনা।

দেখবে তোরা দুদিন পরে;

সব যাবে মাড়োয়ারীর ঘরে।

রবে তখন হ্যাঁ করে,

আবেদের তা আছে জানা"।[৭]

আবেদ আলি মিঞা আরও একটি কবিতায় লিখেছেন...

"বেশী পাট করো ভাইরে বেশী টাকার আশে

যেমন আশা তেমন দশা দেনা পাটের চাষে।

টাকা টাকা মজুর দিয়া নিড়ান কুলাম কাম,

মাড়োয়ারীরা ঘরে বসে পাঁচ টাকা দেয় দাম"।[৮]

১৯২৯-৩৩ এর বিশ্বব্যাপী (সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া) অর্থনৈতিক মন্দার সময় বাংলার কৃষকের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়।[৯] পাটের মত ধানের দামও দারুণ পড়ে

যায়। জমিদারের খাজনা দেবার বা মহাজনের ঋণ শোধ করার অথবা সুদের টাকা যোগানোর সঙ্গতি কৃষকের থাকে না। যখন ঋণের খুবই প্রয়োজন তখন, বিশেষ করে ১৯৩৫-এ Agricultural Debtors Act পাশ হবার পর, মহাজনের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। জোতদার ও ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসে ঋণ দিতে।[১০] ওঙ্কার গোস্বামী লিখেছেন... 'পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুময় চাষীরা আগামী দিনের ফসল বন্ধক রেখে টাকায় দু'আনা মাসিক সুদে ঋণ নিয়েছে। এই ধরনের দাদন যারা দিত তাদের মধ্যে অনেকেই মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ছিল, যারা ছিল আবার কলকাতার বড় মাড়োয়ারী মুৎসুদ্দিদের লোক'।[১১] ১৯৪১ সালের মধ্যে পাট ও চটের ব্যবসার শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মাড়োয়ারীদের হাতে চলে যায়।[১২]

এখন বিদেশী প্রত্যক্ষ শাসন নেই; কিন্তু বিদেশী ঋণের চাপ, বেশী বেশী আমদানি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, বৈদেশিক লেন-দেনে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি, মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত মানুষদের থেকে শুরু হয়ে এখন অনেকেরই বিদেশী ভোগ্যপণ্যের প্রতি লালসা ইত্যাদি আমাদের দেশকে বাধ্য করছে বিশেষ করে ১৯৮০–র দশক থেকে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনের উপর অত্যাধিক জোর দিতে। খোলা বাজার বা অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশীয় পুঁজির তুলনায় বহুগুণ বেশী শক্তিশালী বিদেশী পুঁজির কাছে ক্রমশ বেশী বেশী করে আমাদের দেশের সব ধরনের বাজার খুলে দিতে আমরা বাধ্য হলাম। ফলে আমাদের সম্পদ বিপুল পরিমাণে লুঠ হচ্ছে এবং একই সঙ্গে আমাদের সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা, আমাদের কল-কারখানা ক্রমশ বেশী বেশী করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা বিদেশী ফাটকাবাজ পুঁজির শিকার হিসাবে কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন। এর ফলেই ১৯৯১ সালে বিদেশী ঋণের বার্ষিক কিস্তি শোধ দেবার জন্যও বিশ্ব ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হওয়া।[১৩] বিশ্ব ব্যাঙ্ক সেই সুযোগ নিয়ে আমাদের

উপর ‘কাঠামোগত পুনর্গঠনের’ বোঝা চাপিয়ে দেয়। ভারত সরকারকে বাধ্য করে ত্রিবিধ সর্বনাশকে মেনে নিয়ে ‘নয়া অর্থনৈতিক নীতি’ চালু করতে। এই ত্রিবিধ সর্বনাশের মধ্যে পড়ে...

(১) টাকার অবমূল্যায়ন; বিশ্ব বাণিজ্যে টাকা-ডলারের যোগান-চাহিদা ভিত্তি করে ক্রমাগত টাকার মূল্য কমানো।

(২) পণ্য ও পুঁজির আমদানি ও রপ্তানি ইত্যাদি বি-নিয়ন্ত্রণ করা। এবং

(৩) সরকারি সব কারখানা ও অন্যান্য উদ্যোগকে দেশী-বিদেশী মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া। এর পরে ১৯৯৪ -র পর থেকে শুরু হোল বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার চাপ-পেটেন্ট আইনের পরিবর্তন। সব মিলিয়ে আমরা আমাদের যেটুকু স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব ছিল তাও দ্রুত গতিতে খোয়াতে শুরু করলাম।

নয়া অর্থনৈতিক নীতির ত্রিবিধ সর্বনাশা স্তম্ভের দুটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এর একটা হচ্ছে, গত ৫০ বছর ধরে গড়ে তোলা ভারী ও মূল শিল্পকে দেশী-বিদেশী মালিকদের বিক্রী করে দেওয়া। এই খবর অন্তত কিছুটা নানা রকম পত্র-পত্রিকাতে পাওয়া যায়। একই রকম ভাবে খবর পাওয়া যায় শত শত পণ্যের খোলা বাজারে আমদানির ব্যবস্থা করা। এই উভয় দিক মিলিয়ে আমাদের শিল্প এবং কৃষি যে বিপুল বিপদের মধ্যে পড়েছে তার কিছুটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু টাকার দ্রুত অবমূল্যায়নের ফলে অ-সম বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশ কি ভাবে এবং কতটা লুণ্ঠিত হচ্ছে তা কখনই আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয় না। তাই এই দিক দিয়ে আমরা কিভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছি তার সম্বন্ধে অন্তত একটা মোটামুটি ধারণা করার জন্য কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

ডলার (বা পাউন্ড ইত্যাদি) এবং টাকার বিনিময় মূল্যের দুটো দিক আছে। এর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার এবং টাকার পারস্পরিক চাহিদা-যোগানের ভিত্তিতে বাজারে যে বিনিময় মূল্য ঠিক হয়। যেমন ১৯৯৯-২০০০ সালে বিশ্বের বাজারে এক ডলারের মূল্য ছিল 'ইউ.এস.ডি টু ইনার' অ্যাভারেজ ৪৩.৩৩ টাকা। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এই আন্তর্জাতিক বাজারে আমেরিকা সহ জি-৭ দেশের অংশ হচ্ছে ৫০% এর বেশী এবং ভারতের অংশ হচ্ছে ০.৭% এর কম। কাজেই এই বাজারে আমাদের কর্তৃত্ব কত সামান্য তা সহজেই বোঝা যায়।[১৪]

এই বিনিময় মূল্যে ১৯৯৯ সালে ডলারের হিসাবে আমাদের দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৪৫০ ডলার। আমেরিকার ছিলো ৩৪,২৬০ ডলার বা আমাদের থেকে ৭৬ গুণেরও বেশী।

১৯৯০ –এর দশক থেকে রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্ব-ব্যাঙ্ক বিভিন্ন মুদ্রার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার বস্তুগত ভাবে কি তা নির্ধারণ করা শুরু করে। এই বিনিময় হার ঠিক করার জন্য আমেরিকাতে ১ ডলার দিয়ে সাধারণ যে সব বস্তু কেনা যায়, সেই জিনিষেরই দাম ভারতে (বা অন্য কোন দেশে) কত তাই দিয়ে নির্ধারণ হয় "ক্রয় মূল্যের সমতার হারে" (purchasing power parity বা সংক্ষেপে PPP) ডলারের সঙ্গে টাকার (বা অন্য কোন দেশের মুদ্রার) বিনিময় হার কত। ঐ হারে ১৯৯৯-২০০০ সালে ১ ডলারের বিনিময় মূল্য ছিলো মোটামুটি ৯.০৭ টাকা। অর্থাৎ এই বস্তুগত যে বিনিময় মূল্য তার (৪৩.৩৩ / ৯.০৭) বা ৪.৭৮ গুন বেশী টাকা দিয়ে বিশ্ব-বাজার থেকে আমাদের ১ ডলার পেতে হত। বিদেশীরা ১ ডলার দিয়ে আমেরিকায় যতটুকু জিনিষ কিনতে পারে, তার ৪.৭৮ কিনতে পারে ভারতে এসে।[১৫]

কিন্তু তার নিজের দেশে ঐ ভারতীয় দ্রব্য কিন্তু সস্তায় পায়না ঐ সব বিদেশীরা। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অ-সম বাণিজ্যের মাধ্যমে ঐ দেশের বহুজাতিকরা আমাদের বাধ্য করে ৪৩.৩৩ টাকার ভারতীয় দ্রব্য পাঠিয়ে আমাদের মাত্র ১ ডলার নিতে। তারা কিন্তু তাদের দেশে ঐ ৪৩.৩৩ টাকার ভারতীয় দ্রব্যের বদলে ঐ পণ্যের যা সত্যিকারের দাম, অর্থাৎ ৪.৭৮ ডলারই ঐ দেশের লোকদের দিতে হয়। এই আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের মত একটা অত্যন্ত গরীব দেশকে ১ ডলার জন্য বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের (৪.৭৮ – ১.০০) বা ডলার পিছু ৩.৭৮ ডলার ভর্তুকি দিতে হয় দুনিয়ার সব থেকে ধনী ব্যবসায়ীদের। ধনী দেশের সাধারণ মানুষদের এর ফলে কোন উপকার হয় না।[১৬]

তাই চলতি বিশ্বায়নের এই আক্রমণের যুগে আমাদের মত দেশকে যত বেশী আমদানি নির্ভর করা যায় তত বেশী আমাদের উপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় যত বেশী সম্ভব রপ্তানি করতে।আর যত বেশী আমরা খোলা বাজারে রপ্তানি করতে বাধ্য হব তত বেশী ঐ অ-সম বাণিজ্যের মাধ্যমে আমরা লুণ্ঠিত হতে থাকব। এই ধরনের বাণিজ্যে একমাত্র লাভ হচ্ছে মুষ্টিমেয় বহুজাতিক ব্যবসাদারদের। আর তাদের এদেশীয় অনুচরদের।

এই হিসাবটা একটু মোটা দাগের, কারণ ‘ক্রয় ক্ষমতার হার’ ঠিক হয় দেশের মধ্যে ব্যবহৃত পণ্যের দামের তুলনা করে। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে এই ‘সমতার হারে’র সঙ্গে বাজার দামের যে ফারাক মোটামুটি সেই একই রকম ফারাক রয়েছে আমদানি-রপ্তানি কৃত পণ্যগুলির মধ্যে।

১৯৯৯-২০০০ সালে ভারত মোট রপ্তানী করেছিলো ১৬২,৯২৫ কোটি টাকার দ্রব্য। আন্তর্জাতিক বাজারেরে বিনিময় হারে (১ ডলার = ৪৩.৩৩ টাকা) আমরা ডলার

পেয়েছি ৩,৭৬০ কোটি টাকা। কিন্তু যে দ্রব্য আমরা পাঠিয়েছি তা ঐ "ক্রয়মূল্যের সমতার হারে" বা ১ ডলার = ৯.০৭ টাকা হারে আমেরিকায় দাম হচ্ছে (১৬২,৯২৫ / ৯.০৭) বা ১৭,৯৬৩ কোটি ডলার। কিন্তু বহুজাতিকদের দখলে থাকা তথাকথিত "খোলা বাজারে" আমরা পেয়েছি মাত্র ৩,৭৬০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ঐ "খোলা বাজারে" অসম বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা (১৭,৯৬৩–৩,৭৬০) বা ১৪,২০৩ কোটি ডলার আমাদের কাছ থেকে আইনসঙ্গত ভাবে লুঠ হয়ে গেল। এটা হচ্ছে মোটামুটি ১৪২ বিলিয়ন ডলার। এক বছরে লুঠ ঐ টাকার অবমূল্যায়নের ফলে।[১৭]

একই রকম ভাবে ১৯৯৫-৯৬ সালে আমরা রপ্তানি করেছিলাম ১০৬,৩৫৩ কোটি টাকার দ্রব্য। ঐ বছরের বাজারে বিনিময় হার ছিল ১ ডলার = ৩৩.৪৫ টাকা। ঐ হারে আমরা ডলার পেয়েছিলাম ৩,১৮০ কোটি ডলার। ঐ বছরের "ক্রয়ক্ষমতার সমতার" ভিত্তিতে বিনিময় হার ছিলো ১ ডলার = ৮ টাকা। এই হারে আমরা ডলার পেলে, আমাদের পাবার কথা ছিলো ১৩,২৯৪ কোটি ডলার। বাজারের কেরামতিতে লুঠের পরিমাণ (১৩,২৯৪ – ৩,১৮০) বা ১০,১১৪ কোটি ডলার। এটা হচ্ছে মোটামুটি ১০১ বিলিয়ন ডলার।[১৮]

১৯৯১-তে "নয়া অর্থনৈতিক নীতি" গ্রহণের পর প্রথম চার বছরে (১৯৯১-১৯৯৫) ভারত মোট রপ্তানী করেছে ২৫৪ হাজার কোটি টাকার দ্রব্য। ঐ চার বছর গড়ে বিশ্ব বাজারে ১ ডলারের বিনিময় মূল্য ছিলো ৩০ টাকা। এবং ক্রয়ক্ষমতার সমতার হারে বিনিময় মূল্য ছিলো ১ ডলার = ৭.৫০ টাকা। এই চার বছরে আমরা বাজার মূল্যে ডলার পেয়েছি ৮৪৬৭ কোটি। ক্রয়মূল্যের সমতার হারে পাবার কথা ছিলো ঠিক এর ৪ গুণ বা ৩৩,৮৬৭ কোটি ডলার। ফলে ঐ ৪ বছরের মোট লুট হচ্ছে (৩৩,৮৬৭-৮,৪৬৭)

বা ২৫,৪০০ কোটি ডলার বা ঐ সময়ের লুঠের বার্ষিক গড় ছিলো ৬,৩৫০ কোটি ডলার।[১৯]

নয়া অর্থনৈতিক নীতি নেবার ঠিক আগের বছরে (১৯৯০-৯১) আমরা ৫০ হাজার কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করে পেয়েছিলাম ২,৭৯২ কোটি ডলার। ঐ বছরেও ক্রয়ক্ষমতার সমতার হারে পরের পাঁচ বছরের মত ঐ বছরও ১ ডলার = ৭.৫০ টাকা ধরে নিয়ে আমাদের পাবার কথা ছিলো ৬,৬৭৮ কোটি ডলার। অর্থাৎ ঐ বছর লুঠের পরিমাণ ছিল (৬,৬৭৮-২,৭৯২) = ৩,৮৮৬ কোটি ডলার।[২০]

পুরো ১৯৯০–এর দশক ধরলে (১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৯-২০০০) ভারত ৯৬২ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করে বাজারের বিনিময় হার পেয়েছে মোট ২৯ হাজার কোটি ডলার। ক্রয়ক্ষমতার সমতার হারে পাবার কথা ছিলো মোট ১০০ হাজার কোটি ডলার। অর্থাৎ অ-সম বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের মত একটা গরীব করে রাখা দেশের কাছ থেকে ধনী দেশের বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা লুঠ করেছে (১০০-২৯) বা ৭১ হাজার কোটি ডলার।[২১] হয়তো তাদের ক্ষুদ্র ভারতীয় অংশীদার মালিকরাও এর কিছু অংশ পেয়ে তাদের নিজেদের দেশকে লুঠ করতে ঐ বিদেশী বহুজাতিকদের সাহায্য করে চলেছে। এই লুঠের হার কিভাবে বছরের পর বছর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা নজর করার মত।

কিভাবে এই লুঠ বন্ধ করা যায়?

আমাদের সামনে যে পথটা এখন চালু রয়েছে তা হচ্ছে চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে মেনে নিয়ে এর মধ্যেই কি করা যায় তা স্থির করা। এর বিকল্প পথটা হচ্ছে এর ১৮০ ডিগ্রি উল্টোদিকেঃ এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে পরাস্ত করার মূল লক্ষ্য সামনে নিয়ে তার জন্য এখনই কি করা যায় তা ঠিক করা।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রায় একই রকম ভাবে অ-সম বাণিজ্যের মাধ্যমে গরীব কৃষক-কারিগররা লুণ্ঠিত হয় প্রধানত শহুরে ব্যবসাদার গোষ্ঠীর দ্বারা। চাল-গম থেকে শুরু করে আরও বেশী তরি-তরকারি (বা তাঁতের কাপড় ইত্যাদি) যে দামে কৃষক-কারিগররা বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং যে দামে ঐ সব দ্রব্যই শহরের মানুষ কেনে তার মধ্যে ফারাক অনেক। এই ক্ষেত্রেও শহরের মানুষরা মোটেই কৃষকদের লুঠ করছে না। কারণ তারাও কেউ সস্তায় জিনিষ পাচ্ছে না। লুঠ করছে ফাটকাবাজ ব্যবসাদাররা।

এই অভ্যন্তরীণ লেনদেনে এবং বিশ্ব-বাজারের লেনদেনে লুণ্ঠিত হবার পথ থেকে উদ্ধার পাবার পথ একটাই। এটা হচ্ছে যত বেশী সম্ভব এই লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে দেশীয় বহুজাতিক ব্যবসাদারদের প্রয়োজন থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

একদিকে দেশের মধ্যে যত বেশী সম্ভব 'স্থানীয় বাজারের' গুরুত্ব বাড়বে, বিক্রেতার প্রত্যক্ষ ভোগকারীর সঙ্গে সোজাসুজি লেনদেনের ব্যবস্থার প্রসার হবে; এবং অন্য দিকে, গ্রামের ও শহরের উভয় জায়গায় উৎপাদনকারী ও ভোগকারীরা নিজেরা সমবায়ে সংগঠিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তখনই সম্ভব হবে দেশীয় মুনাফাখোরদের হাত থেকে মানুষদের মুক্তি পাওয়া।

এই রকম ভাবে এখনকার দুনিয়াজোড়া খবর আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে শুভ কাজে ব্যবহার করে, দুনিয়ার সব দেশের মানুষ যদি বিভিন্ন দেশের পণ্যের দাম জানতে পারে তবে সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে ঐ 'ক্রয়মূল্যের সমতার হারে' বিশ্ব-বাণিজ্য চলার (শুধু ঐ দামের সঙ্গে যোগ হবে পরিবহণের সত্যিকারের ব্যয়)। এই ব্যবস্থার শুরু হিসাবে আমরা ঠিক করতে পারি (ক) মোটামুটি ক্ষমতার সমতার হারে যতটুকু রপ্তানী করা যায় মূলত ততখানিই রপ্তানী করা। এবং (খ) কোন কোন দ্রব্যের কতটা আমদানি কমাতে

পারি। এর সঙ্গে জড়িত আছে সমাজে উচ্চবর্গীয়দের আধিপত্য ও তাদের সীমাহীন ভোগ-লিপ্সা সৃষ্টি হওয়াকে প্রতিরোধ করা।[২১]

আমাদের সচেতনভাবে ঐ বিকল্প পথকে বেছে নিয়ে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবকিছুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে হবে।

আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটা সাম্য এবং সহযোগিতা ভিত্তিক সব থেকে বেশী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দিকে এগোনো যেখানে দারিদ্র্য থাকবে না, থাকবে প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের হাতে সবচেয়ে বেশী সর্ববিধ ক্ষমতার ভিত্তিতে জাতীয় সার্বভৌমত্ব। এই দীর্ঘমেয়াদী মূল লক্ষ্যের কথা সামনে রেখে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী এবং আশু এই উভয় স্তরের জন্য শিল্প পরিকল্পনা করতে হবে।

১৯৩৬ সালে John Maynard Keynes তার একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন "উৎপাদন সংস্থার উৎপাদনের প্রবাহমানতা বজায় থাকলে ফাটকা বাজদের ভূমিকা হয় বুদবুদের মত। তারা ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সংস্থাটি যদি ফাটকাবাজারির ঘূর্ণীপাকে বুদবুদে পরিণত হয় তখনই ঘনিয়ে আসে বিপদ। একটি দেশের পুঁজির বিকাশ যদি জুয়া খেলার অধীন হয়ে পড়ে তখন উৎপাদনের কাজটি আর করা যায় না"।[২২]

John Keynes তিরিশের দশকে মহামন্দার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি বিবেচনা করে যে মন্তব্য করেছিলেন তার তাৎপর্য কতটা তা বিশ্ব অর্থনীতির দিকে একটু নিবিড়ভাবে তাকালে সহজে অনুমান করা যায়। মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উৎপাদনের প্রকৃত অর্থনীতির সরল সহায়কের আদি ভূমিকা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে লগ্নীপুঁজি অবধারিতভাবে হয়ে উঠেছে ফাটকা পুঁজি যা তার নিজের প্রসারের জন্যে পুরোপুরি নিয়োজিত; উৎপাদনের জন্য নয়। অতীতে কেউ

স্বপ্নেও ভাবেনি যে পুঁজিবাদের একটি নতুন প্রক্রিয়া ফাটকা পুঁজি যা এমনভাবে বেড়ে উঠতে পারে যে কেবল জাতীয় অর্থনীতি শুধু নয় বরং গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো। আর বিশ্বায়ন এই ফাটকা পুঁজির অবাধ অনিয়ন্ত্রিত চলাচলের 'Conveyor Belt' হিসাবে কাজ করলো।[২৩] শেষ পর্যন্ত তাই যে বাস্তবতার মুখোমুখি হল উন্নত দেশগুলি তা লক্ষ লক্ষ বেকার এবং তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে অযুত নিযুত বেকার মজুত বাহিনী এবং তৃতীয় দুনিয়ায় ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও পরিবেশের অবনতি। বিশ্বব্যাঙ্কের কর্ণধার IMF – এর নীতি নির্ধারকেরা যে বিশ্বায়নের কথা বলেছিলেন তা কী বস্তুত এটাই ছিল?

বিশ্বায়নের বিশ্ব-ব্যাঙ্ক নির্দেশিত পথে যাত্রা শুরু করে একদা এশিয়ান টাইগার ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি খাদের কিনারে এসে দাঁড়ালো; দারিদ্রপীড়িত হল আরও ভয়ংকর ভাবে লাতিন আমেরিকা, দেউলিয়া হয়ে গেল, চিলি, মেক্সিকো, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা; এমন কী মূলধারার ইউরোপ অভূতপূর্ব সংকটের সামনে এসে দাঁড়ালো গ্রীস, স্পেন, পর্তুগাল-রক্তাক্ত হল আফ্রিকা মহাদেশ আর আমাদের দেশে 'Bank of England'-এ সোনা বন্ধক রেখে তথাকথিত 'জাতীয় সরকার' যাত্রা শুরু করল নয়া উদারবাদের সর্পিল অনিশ্চিত পথে।[২৪]

এর পরবর্তীকালে কোন কিছুই আর আগের মতো থাকেনি। ফাটকাপুঁজির অবাধ জয়যাত্রা মসৃণ করতে একদিকে যেমন মূলধননিবিড় শিল্পকে একমাত্র উৎসাহিত করা হল তেমনি জলের দরে বেচে দেওয়া হতে লাগলো জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে গড়ে ওঠা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পকারখানা। ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, কয়লা মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি সহ সমস্ত ক্ষেত্র যেমন এই অবাধ বিনিয়োগ ও লুণ্ঠনের ছাড়পত্র পেল তেমনি স্বাস্থ্য শিক্ষা জনপরিষেবা ও সামাজিক অধিকারের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নিজেকে সরিয়ে নিলো বিগত

তিন দশকে। ১৯১২ সালে Rosa Luxemburg তার সুবিখ্যাত 'Accumulation of capital' গ্রন্থে লগ্নীপুঁজির যে অনির্দেশ্য যাত্রাপথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার মধ্যগগনে উপনীত আজ আমরা।[২৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মিশ্র অর্থনীতি ও জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের অভিমুখকে সামনে রেখে যে পথে এক নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করেছিল বিশ্বায়নের রথের চাকা তাকে নিশ্চিত ভাবে ব্যাহত করেছে। ফ্রীডম্যানের নিয়ন্ত্রণবিহীন বাজার অর্থনীতির আদর্শ নিশ্চিতভাবেই তৃতীয় বিশ্বের অন্য সকল দেশের মতোই এদেশেও গড়ে তুলেছে এক স্বৈরতন্ত্রী অভিজাততন্ত্র। এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ 'Joseph Stiglitz'-এর সুবিখ্যাত রচনা 'Globalization and Its Discontents' গ্রন্থটির প্রসঙ্গ।[২৬] বৃহৎ আর্থিক সংস্থাগুলিতে দীর্ঘকাল কাজ করার সুবাদে Stiglitz নির্মোহভাবে দেখিয়েছেন যে আদর্শের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার ঘোষণা করলেও কিভাবে বাজার একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের দ্বারাই চালিত হয় এবং আপাত নিরপেক্ষতার মোড়কে কীভাবে অসম-বাণিজ্যচুক্তি তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক জীবন জীবিকা ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। কিভাবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বন্ধক থাকে দেশি ও বিদেশী মাল্টিন্যাশনল কর্পোরেশন গুলির কাছে এবং কিভাবে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও মুদ্রার অবমূল্যায়নে বিশ্বায়নী নীতি গুলিই ভূমিকা নেয় তাও Stiglitz দেখিয়েছেন তার নিজস্ব ভঙ্গীতে।

বিগত তিন দশকে তাই একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর যেমন নিয়ন্ত্রণবিহীন আক্রমণ বেড়েছে লগ্নীপুঁজির তেমনই নয়া উদারবাদের মোড়কে দেশে দেশে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এক অভূতপূর্ব মাত্রায়। উৎপাদনী শিল্পক্ষেত্রে যে সঙ্কট

তাই আজ ঘনিয়ে এসেছে সামগ্রিক পলিসিকে চ্যালেঞ্জ করা ছাড়া তার থেকে মুক্তির অন্য কোন বিকল্প রাস্তা খোলা নেই।

তালিকা:- ১[২৭]

ভারত নতুন আর্থিকনীতি গ্রহণ করার আগে ও পরে কর্মসংস্থান, বেকারী

সারণী: ৪.১ লক আউট-ধর্মঘট-শ্রমবিরোধ

লক আউট-ধর্মঘট-শ্রমবিরোধ						
বছর	লক-আউট	শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	শ্রমদিবস নষ্ট (লাখ)	ধর্মঘট	শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	শ্রম দিবশ নষ্ট(লাখ)
১৯৯১	৫৩২	৪৭০	১৪০	১২৭৮	৮৭২	১২৪.৩
১৯৯২	৭০৩	৪৮৫	১৬১.৩	১০১১	৭৬২	১৫১.৩
১৯৯৩	৪৭৯	২৮২	১৪৬.৯	৯১৪	৬৭২	৫৬.১
১৯৯৪	৩৯৩	২২০	১৪৩.৩	৮০৮	৬২৬	৬৬.৫
১৯৯৫	৩৩৪	৩০৭	১০৫.৭	৭৩২	৬৮৩	৫৭.২
১৯৯৬	৪০৩	৩৩১	১২৪.৭	৭৬৩	৬০৯	৭৪.২
১৯৯৭	৫১২	৩৪৪	১০৬.৪	৭৯৩	৬৩৭	৬৩.
১৯৯৮	৪৩২	৪৮৮	১২৭.১	৬৬৫	৮০১	৯৩.২
১৯৯৯	৩৮৭	২১২	১৬১.৬	৫৪০	১০৯৯	১০৬.২
২০০০	৩০৬	৩০৫	১৩৩.৫	৩৫০	৩৮৫	৩৩.৭

সূত্র:- শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০

সারণীঃ- ৪.২ ধর্মঘট ও লক আউটে বন্ধ হয়ে থাকা কারখানার সংখ্যা, কর্মহীন শ্রমিক ও নষ্ট শ্রমদিবস ও মোট শ্রম বিরোধ

	লক আউট			ধর্মঘট			মোট ধর্মঘট ও লক আউট		
সাল	সংখ্যা	কর্মহীন শ্রমিক (হাজার)	শ্রমদিবস নষ্ট (লাখ)	সংখ্যা	কর্মহীন শ্রমিক (হাজার)	শ্রমদিবস নষ্ট (লাখ)	সংখ্যা	কর্মহীন শ্রমিক (হাজার)	শ্রমদিবস নষ্ট (লাখ)
১৯৯৫	১৩৬ *(৮০.১)	৭৪.১৪ (২৪.০)	৫২.৫ (৮০.৮)	৩৩ (১৯.৯)	২৩৪.৪ (৭৬.০)	১২.৫ (১৯.২)	১৬৯	৩০৮.৫৮	৬৫.
১৯৯৬	১৪৪ (৮৯.৪৪)	১০৪.৬ (৮১.৬৩)	১০৪.৭ (৪৬.২৪)	১৭ (১০.৫৬)	২৩.৬ (১৮.৩৭)	১৬.৭ (১৩.৭৬)	১৬১	১২৮.১৭	১২১.৪
১৯৯৭	১৬১ (৮৪.৭৪)	৮৯.২ (৯১.৪২)	৭৬.৪ (৯২.৪৯)	২৯ (১৫.২৬)	৮.৪ (৮.৫৮)	৬.২ (৭.৫১)	১৯০	৯৭.৫৭	৮২.৬
১৯৯৮	২১৩ (৮৯.৫০)	১০৫.০ (৯৭.৭৪)	১১৩.৫ (৯৮.১০)	২৫ (১০.৫০)	২.৭ (২.৫৩)	২.২ (১.৯০)	২৩৮	১০৭.৭১	১১৫.৭
১৯৯৯	২৬৪ (৮৮.৫৯)	১৪২.৭ (৩০.১৮)	১৭৭.৭ (৮২.০০)	৩৪ (১১.৪১)	৩৩০.৩ (৬৯.৮২)	৩৯.০ (১৮.০০)	২৯৮	৪৭২.৯৭	২১৬.৭
২০০০	২৮৬ (৯১.৩৭)	১৬৭.৪ (৪৫.০১)	১৬০.৬ (৮৩.৭৮)	২৭ (৮.৬৩)	২০৪.৫ (৫৪.৯৯)	৩১.১ (১৬.২২)	৩১৩	৩৭১.৮৬	১৯১.৭
২০০১	৩০৫ (৯৩.৭৫	১২৭.৮ (৮৬.১৯)	১৯৮.০ (৯৩.৫৩)	২০ (৬.১৫)	২০.৫ (১৩.৮১)	১৩.৭ (৬.৪৭)	৩২৫	১৪৮.৩২	২১১.৭

সূত্র:- লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ২০০১

*বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো মোট ধর্মঘট ও লক আউটের শতাংশ

সারণী:-৪.৩ ভারতে ক্লোজার ও ছাঁটাই

সাল	সারা ভারতে ক্লোজার ও ছাঁটাই	ক্ষতিগ্রস্ত মোট শ্রমিক	ছাঁটাই সংস্থা	ছাঁটাই শ্রমিক সংখ্যা
১৯৯১	২৩৭	২১২৫০	২৩৫	৪৩৯৬
১৯৯২	১৮৭	১২৫০০	২২২	৩৮৩৬
১৯৯৩	৪৯৪	২৫৬২৫	১৮৯	২৮৯১
১৯৯৪	২২৫	২১২৫০	১৩৫	২১৯২
১৯৯৫	১৮১	১৪৩৭৫	৯৪	১৭৯২
১৯৯৬	২০৩	২০৬২৫	৭৮	২৩৭৩
১৯৯৭	১৫৫	১৩১২৫	১৬৩	৩৩৯০
১৯৯৮	১৭৫	১৩৩১২	১৩৫	২০৩৪
১৯৯৯	১৫৯	১৫৭০৭	১৭৬	২৫০৩
২০০০	৯১	৪৪৬১	৮৯	২৬৫৬

সূত্র:- শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০

সারণী:- ৪.৪ পশ্চিমবঙ্গে ছাঁটাই ও লে-অফ

বছর	সংস্থা থেকে ছাঁটাই হয়েছে	মোট শ্রমিক ও কর্মচারি	সংস্থা	মোট শ্রমিক/ কর্মচারি
১৯৮০	৯১	১০৪৩	১০৬	১১৯৬৬
১৯৮৫	৬৩	২৪৯	১৯	৫১০
১৯৯০	৩	১০৪৩	৭	২৭২
১৯৯৫	৭	১২৪	৫	৩০১
১৯৯৬	২	১১	১১	৪৮২১
১৯৯৭	৫	২৪৯	৬	৫২৭৪
১৯৯৮	৬	৩৬	৩	২০৪৩
১৯৯৯	৩	৩৭	৯	৬৬৯
২০০০	---	---	৬	১২৭২
২০০১	১	১	৮	৪২৫

সূত্রঃ- ইকনমিক রিভিউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১-২০০২

সারণী:- ৪.৫ পশ্চিমবঙ্গের শ্রম কমিশনারের কাছে মোট যত বিরোধ এসেছিল এবং যতগুলি নিষ্পত্তি হয়েছে

বছর	মোট বিরোধ	নিষ্পত্তি হয়েছে	শতাংশ
১৯৯৫	৬৬৩০	৩০৭৩	৪৬.৩৫
১৯৯৬	৫৮০৭	২৩৫২	৪০.৫
১৯৯৭	৫৮৯৭	৩১৯৭	৫৪.২১
১৯৯৮	৫১০২	২১৩৮	৪১.৫১
১৯৯৯	৫২৮৫	২২৩৪	৪২.২৭
২০০০	৫৩২৬	২৮৫৭	৫৩.৬৪
২০০১	৪৮৭৩	২৫৭০	৫২.৭৪

সূত্র:- লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ২০০১

৪.২. পরিবেশবান্ধব পাটচাষ ও ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি

পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। গোটা বিশ্বব্যাপী তুলোর পরেই রেশমি সোনালি রঙের এই প্রাকৃতিক সেলুলোজ তন্তুটির ব্যবহার এবং উৎপাদন। মূলত পাট গাছ দুই প্রকারের হয়। সাদা পাট, যা নিচু জমিতে জন্মায় এবং তোষা পাট, উঁচু জমিতে জন্মায়। এই সাদা পাট গাছ থেকে সব থেকে বেশি পরিমাণের তন্তু পাওয়া যায়। তোষা পাট থেকে তুলনা মূলক ভাবে একটু কম পরিমাণের তন্তু পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও দুই রকমের পাট হয়, মেস্তা পাট এবং বিমলি পাট। পাটজাত জিনিস তৈরিতে পৃথিবীতে ভারত শীর্ষে। বাংলাদেশ কাঁচা পাট উৎপাদন ও রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম দিকে

রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব যথেষ্ট। মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগপতি থেকে শুরু করে বড় চটকলগুলি অর্থকরী এই ফসলটি দিয়ে খাদ্যবস্তুর মোড়ক ছাড়াও নানান পরিবেশবান্ধব জিনিস তৈরি করে। পাট-চাষি, পাটবীজ ব্যবসায়ী, কাঁচা পাটের ব্যাপারি, ফড়ে এবং অবশ্যই পাট-মাজুতদারদের আর্থিক সংস্থান করে পাট ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখে। প্রাকৃতিক দূষণ কমিয়ে পাট চাষ পরিবেশকে সবুজ ও মজবুত রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

অতীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৫৯০ সালে লেখা আবুল ফজল এর 'আইন-ই-আকবরি' বইতে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পাটের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।[২৯] এই বই থেকে জানা যায় যে ভারতের গ্রামের গরীব মানুষ সাদা পাটের তন্তু থেকে তৈরি জামা কাপড় পরত। হাতে ঘুরানো চরকা-কাটা পাটের সুতো দিয়ে সাধারণত তাঁত বোনা যন্ত্রেই জামাকাপড় তৈরি হত। ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকে পাটের তৈরি দড়ি ও পাতলা পাক দেওয়া সুতো ঘরের ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহার করত। আফ্রিকা এশিয়ায় বুনন ও দড়ি তৈরির কাজে পাট তন্তু ব্যবহার হত। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে তোষা পাট গাছের পাতা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হত। মিশর, জর্ডন ও সিরিয়া-য় পাট গাছের পাতা দিয়ে খাবার স্যুপ তৈরি করা হয়। পাট গাছের পাতা শাক হিসেবে খাওয়া যায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিন-পুর্ব এশিয়া, বাংলাদেশ এবং ভারতের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে পাট চাষ করা হয় প্রধানত এর তন্তু ব্যবহারের জন্য। 'হারবিন একাদেমি অফ সায়েন্স' এর চৈনিক গবেষক 'Qui Shiyu' জানাচ্ছেন, প্রাচীনকাল থেকেই চিন দেশে পাট থেকে কাগজ তৈরি হত। এ কাজে ইহুদিরা অংশ

নিত। এ ধরণের কাজকে বলা হত 'jiaoji'।[৩০] মোটা ধরণের পাট তন্তু দিয়ে এই কাগজ বানানো হত। উত্তর-পশ্চিম চিন এর গানশু প্রদেশের ডানহুয়াং অঞ্চলে এরকম এক খণ্ড পাটের তৈরি কাগজের খোঁজ মিলেছে যার ওপর চিনা হরফ লেখা আছে। মনে করা হচ্ছে পশ্চিম হান রাজত্বে (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ) এই কাগজ তৈরি হয়েছিল। প্রধানত কাঁচা পাটের ব্যবসা প্রথম শুরু করে উনিশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বিশ শতকের প্রথমেই কোম্পানি ডান্ডি-র পাটকলের সাথে কাঁচা পাটের ব্যবসা শুরু করে। এই সময় কোম্পানির এটি একচেটিয়া কারবার ছিল। ১৮০০ শতাব্দে ডান্ডি-র পাটকলগুলির মালিক ছিলেন মারগারেট ডনেলি-১। তিনি ভারতে পাটকলগুলি প্রথম স্থাপন করেন।[৩১] ১৮৫৪-৫৫ সালে হুগলি নদীর ধারে কলকাতার কাছে রিষড়া-য় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। মিস্টার জর্জ অকল্যান্ড ডান্ডি থেকে সুতাকাটা কল এখানে নিয়ে আসেন। এর চারবছর বাদে বিজলি চালিত বুনন কল চালু হয়।[৩২]

নানাবিধ পাটের ব্যবহারিক ধরন

পাটের তন্তু নানা কাজে লাগে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই চটের কাপড় তৈরির কাজে শন এর সুতোর বদলে পাটের সুতোর ব্যবহার শুরু হল। আজও চটের কাপড় দিয়েই পাটজাত নানান জিনিস তৈরি হয়। পাটের তন্তুর সব চেয়ে বড় সুবিধা হল যে কেবল এটি দিয়েই যেমন নানা জিনিস তৈরি করা যায়, তেমনই এটির সঙ্গে অন্যান্য তন্তু ও উপাদান মিশিয়েও তাকে ব্যবহার করা যায়। পাট ভাল অন্তরক (Insulating) হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।[৩৩] এটি মাঝারি ধরনের আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে। পাটের তাপীয় পরিবাহিতা অল্প। বাণিজ্যিক ভাবে মোড়ক তৈরির উপাদান হিসেবে পাটের তন্তু

সবথেকে সস্তা। এর প্রধান কারণ হেক্টর প্রতি এর উৎপাদন বেশি এবং আধুনিক পাটজাত জিনিস তৈরির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এটিকে সহজেই ব্যবহার করা যায়। তাই পাটের তৈরি থলে, তেরপল, দড়ি, হেসিয়ান-কে মালপত্রের মোড়ক হিসেবে যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনই পাট দিয়ে কার্পেট, কম্বল, পাকানো সুতো, লিনোলিয়ামও তৈরি করা হয়।[৩৪] এমনকী বোর্ড, কাগজের তৈরিতে কাঠ বা বাঁশের বিকল্প হিসেবেও এটি যথেষ্ট ভাল। জাল তৈরি, বয়ন শিল্পে, কারখানায় সুতো তৈরি করতে, নির্মাণ শিল্পে এবং কৃষি ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার হয়। পাটের ব্যবহার তাই বহুমুখী। ব্যবহারের দিক থেকে পাটকলে তৈরি পাটজাত জিনিসকে সাধারণত ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়।

১. মোটা পাট-কাপড়ে তৈরি ব্যাগ বা মোড়ক (Hessian)

২. ভারী জিনিস বইবার বস্তা বা থলে (Sack)

৩. ক্যানভাস

৪. পাটের সুতো এবং পাকানো সরু সুতো বা দড়ি (Jute yarn and twine)

৫. ঢাকা দেবার কাজে ব্যবহৃত তেরপল (Tarpaulin)

৬. ঝোলা বা ব্যাগ,

৭. কফি, কোকো, চিনাবাদাম ইত্যাদির মোড়কের জন্য হাইড্রোকার্বন-মুক্ত পাটের কাপড় এবং

৮. জিওটেক্সটাইলস– মাটির ক্ষয় ও ধস রোখার কাজে এটিকে নদীবাঁধে ও পাহাড়ের ঢালে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও অন্য কিছু ধরনও আছে। যেমন বয়ন শিল্প ও ল্যামিনেশনের কাজে ব্যবহৃত সেরিম (serim) কাপড়, তামাক পাতা এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠাতে

মোড়কের জন্য ব্যবহৃত tobacco sheet, পাটের তৈরি ফিতে এবং নানান ধরণের সাজানোর সরঞ্জাম – খেলনা, well hanging, সুদৃশ্য কগজ, শৌখিন ব্যাগ, টেবিল ল্যাম্প, আসবাব ইত্যাদি।[৩৫]

পরিবেশ বান্ধব পাট চাষ এবং কার্বন বাণিজ্য

পাট ১০০% পচনশীল, পুনর্নবীকরণযোগ্য, পরিবেশ বান্ধব এক প্রাকৃতিক তন্তু।[৩৬] সাধারণত কোনরকম কীটনাশক ও সার ছাড়াই পাট গাছ বেড়ে ওঠে। নানা ধরণের সুতো এবং বাণিজ্যিক ভাবে মোড়কের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি সিনথেটিক বা কৃত্রিম তন্তু থেকে বেশি উপযুক্ত। পাট গাছ সাধারণত চার থেকে ছয় মাসে পরিণত হয়ে যায়। পাট গাছের সরু কাণ্ড গুলি বেশ শক্ত। পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান কাঠের চাহিদার বিকল্প হিসেবে একে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাট গাছের কার্বনডাইঅক্সাইড আত্তীকরণ ক্ষমতা খুব বেশি। পাট চাষ করতে সাধারণত ১২০ দিন সময় লাগে।[৩৭] ভারত সরকারের বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের দেওয়া এপ্রিল, ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী ১ একর জমিতে পাট চাষ করা হলে পাট বায়ুমণ্ডল থেকে ১২০ দিনে ৬ মেট্রিকটন কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং ৪.৪ মেট্রিকটন অক্সিজেন বাতাসে যোগ করে। এখানে উল্লেখ্য যে অন্যান্য অনেক নিরক্ষীয় গাছের তুলনায় পাট গাছের বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করার ক্ষমতা বেশি। এছাড়াও পাট চাষ করলে প্রতি বছর ১ মেট্রিকটন শুকনো পাতা একর প্রতি মাটিতে মেশে। একর প্রতি তিন মেট্রিকটন শিকড় মাটিতে রয়ে যায়। এগুলি পচে মাটিতে জৈব সার হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাস যোগ হয়। ফলে মাটিতে সরাসরি সার দেওয়ার খরচ চাষির বেঁচে যায়। যত টাকার এই সার বাঁচে তাকেও পাটের 'কার্বন ক্রেডিট' এর মূল্য বলে ধরা হয়। পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়াবার

পর পাটকাঠি বা প্যাকাটি পান চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং জ্বালানি ও সস্তার ঘর তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। [৩৮]

বিশ্বউষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে নানান কলকারখানা থেকে যাতে কম কার্বনডাইঅক্সাইড বেরিয়ে বাতাসে মেশে তার জন্য পৃথিবী জুড়ে কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থায় প্রতি টন কার্বনডাইঅক্সাইড (বা গ্রিন হাউস গ্যাস) এর দাম ঠিক করা হয়। এবং যে সব শিল্পপ্রধান দেশ থেকে এই গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মেশে, তাদের গ্যাস বেরোনোর পরিমাণ অনুযায়ী বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ তহবিলে অর্থ জমা দিতে হয়। সাধারণত দুই ধরণের কার্যকারী কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন , ১) 'কার্বন অফসেট ক্রেডিট'- এই ব্যবস্থায় প্রধানত নির্মল শক্তি উৎপাদনের কথা বলা আছে। এক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কার্বন বিহীন বা কম কার্বনযুক্ত নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার (যেমন সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বায়ুশক্তি ও জৈব শক্তি) ব্যবহার করতে হবে। ২) 'কার্বন রিডাকশন ক্রেডিট'- এই ব্যবস্থায় বারে বারে গাছ লাগানোর মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে মাটিতে ও সমুদ্রে সঞ্চয়ের কথা বলা আছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা কমাতে এই দুটি ব্যবস্থাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিসরি দুনিয়ার উন্নতিশীল ও কৃষিপ্রধান দেশগুলির জন্য 'কার্বন রিডাকশন ক্রেডিট' ব্যবস্থা বেশি উপযুক্ত। বায়ুমণ্ডলে এক টন পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড কমানো হলে কার্বন বাণিজ্যর পরিভাষায় তাকে বলে ১ সি ই আর (CER= Certified Emission Reduction)। ১ সি ই আর- এর আন্তর্জাতিক বাজার দর এখন ১৫-২৫ ইউরো (Fair Climate Fund.2019)। ভারতীয় টাকার অঙ্কে ১ ইউরো বর্তমানে প্রায় ৮৫ টাকার সমান।[৩৯]

ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হয় (Office of the jute Commissioner,2018)। এই পরিমাণ জমি থেকে ১২০ দিনে মোট কার্বনডাইঅক্সাইড শোষিত হয় ২০ লক্ষ x ৬ মেট্রিকটন= ১২০ লক্ষ টন বা ১.২ কোটি সি ই আর (CER)। প্রতি ই সি আর- এর আন্তর্জাতিক বাজার দরে এই ১.২ কোটি সি ই আর-এর মূল্য ভারতীয় টাকার অঙ্কে কী দাঁড়ায় তা সহজেই হিসেব করা যায়।[৪০] এই টাকা পাট উৎপাদনকারীদের মধ্যে উৎসাহ ভাতা হিসেবে করা যায়; বা পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মধ্যেও সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায়। পাট চাষে কার্বন বাণিজ্যের দিকটি আমাদের দেশে এখনো খুব একটা সামনে আসেনি। এ ব্যাপারে সরকারকেই সকলকে উৎসাহিত করতে হবে।

এক নজরে পাট শিল্পঃ ভারত ও অন্যান্য দেশ

স্বাধীনতার সময়ে ভারতে পাটকলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। কেন্দ্রীয় বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে কম্পোজিট পাটকলের সংখ্যা ছিল ৯৭টি। এগুলির মধ্যে ১৯টি বন্ধ। এই পাটকলগুলির মধ্যে ৬টি 'ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন' নামক রাষ্ট্রায়ত্ত অধীনে পরিচালিত। পশ্চিমবঙ্গে কম্পোজিট পাটকলের সংখ্যা ৭১টি। বাকি ২৬টি রয়েছে অন্যান্য রাজ্যে; যেমন- অন্ধ্রপ্রদেশে ১২টি, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও ওড়িশায় ৩টি করে, ছত্তিসগড় ও অসমে ২টি করে এবং ত্রিপুরায় ১টি।[৪১] পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি মূলত হুগলি নদীর দু'ধারে প্রায় ৬০ মাইল জুড়ে টিটাগড়, জগদ্দল, হাওড়া, বজবজ, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, নৈহাটি, হালিশহর, কাকিনাড়া, শ্যামনগর, বরানগর, বিড়লাপুর, কামারহাটি, বৈদ্যবাটি ইত্যাদি জায়গায় অবস্থিত। এই পাটকলগুলিকে শিল্প –

এলাকাগত দিক দিয়ে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যেমন, ভাটপাড়া-জগদ্দল, টিটাগড়-খড়দহ, বজবজ-বিড়লাপুর, চাঁপদানি-ভদ্রেশ্বর এবং হাওড়া। আমাদের রাজ্যে গড়ে প্রতিটি পাটকল প্রায় ২.৫ কোটি বস্তা বা থলে তৈরি করতে পারে।[৪২]

কর্মসংস্থান পাট বয়ন শিল্পের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ভারত সরকারের বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে কম্পোজিট পাটকলগুলি সংগঠিত ক্ষেত্রে সরাসরি ৩.৭ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করে। এছাড়াও পরোক্ষভাবে, পরিষেবা ক্ষেত্র সহ অন্যান্য সহযোগী কাজকর্মে প্রায় আরও ৪০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। 'অফিস অফ দ্য জুট কমিশনার' এর ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে বছরে পাট ও মেস্তার গড় উৎপাদন ১০৯৯০ বেল (১ বেল=১৮০ কেজি) বা প্রায় ৫০,৪৭৭ টন। পাট ভারতের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক পণ্য। পাটজাত জিনিস তৈরি এবং রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। আমাদের দেশে গড়ে (বিগত চার বছরের হিসেবে) ১১২৮০০০ টন পাটজাত জিনিস তৈরি হয়। ভারত প্রতি বছর ১৩৩০০০ মেট্রিকটন পাট জাত জিনিস বিদেশে রপ্তানি করে। অংকের হিসেবে এর মূল্য বছরে প্রায় ২১১৫ কোটি টাকা।[৪৩] বিদেশে ভারতের পাটজাত জিনিসের প্রধান ক্রেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও, আর্জেন্টিনা, মিশর, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, কিউবা এবং পূর্ব ইউরোপ ও আফ্রিকার নানান দেশে প্রচুর পাটজাত জিনিস রপ্তানি করে। আমাদের দেশে পাটজাত জিনিসের চাহিদা বছরে ১০৫৬০০০ টন।[৪৪]

পৃথিবীতে প্রথম দশটি পাট উৎপাদনকারী দেশ হল ভারত, বাংলাদেশ, চিন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ব্রাজিল, উজবেকিস্তান, আফ্রিকা, নেপাল ও ভিয়েতনাম। পাটের ব্যবসা প্রধানত ভারতীয় উপমহাদেশ ঘিরেই চলে। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বাজারে

পাটজাত জিনিসের স্থানীয় মূল্যকেই আন্তর্জাতিক মূল্য হিসেবে ধরা হয়। পাটজাত জিনিসের ৭৫% মোড়কের কাজে, থলে এবং মোটা পাট-কাপড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভারতে উৎপাদিত মোট কাঁচা পাটের ৫০% উৎপন্ন হয়।[৪৫]

পাট চাষীর অবস্থান

১৯৪৭-৫১ এই পাঁচ বছরে বার্ষিক গড়ে উৎপাদন ছিল ৪০৫৮ লক্ষ টন, আর ১৯৯৬-৯৭ –তে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১৮.৩৬ লক্ষ টন, অর্থাৎ চারগুণেরও বেশি। ১৯৪৭-৫১ –তে বাৎসরিক গড় পাট চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪১১.৩ লক্ষ হেক্টর, ১৯৯৩-৯৪-তে পাট চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৯১.৩ লক্ষ হেক্টর। তাছাড়া হেক্টর প্রতি উৎপাদন হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৫% শতাংশ। ১৯৪৭-৪৮ সালে পাট চাষী পরিবারের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ, ১৯৯৬-৯৭-তে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লক্ষ।[৪৬]

এই ভাবে কৃষকরা যখন উৎপাদন বাড়িয়ে চলছিল তখন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় (১৯৬১-৬৬) বার্ষিক গড় পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩,২৬,০৬০ টন।[৪৭] এই সময় পাটকল মালিকরা, ফড়ে এবং আড়তদারদের সহযোগিতায় পাটের দাম ভীষণ ভাবে কমিয়ে আনল।

১৯৬৩ সালে বেতন-বোর্ডের রায়ের ফলে শ্রমিকদের যে বাড়তি আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিতে হল তা' পুষিয়ে নেওয়ার জন্য মালিকেরা একদিকে জোড়া তাঁত চালু করল, অপরদিকে কৃষকদের কম দামে পাট বিক্রি করতে বাধ্য করল। কৃষকরা পাটের এই কম দামের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ন্যায্য দামে পাট কেনার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে এবং পাট উৎপাদনও কমিয়ে আনে।[৪৮] পরিণতিতে ১৯৬৬-৬৯-এ বার্ষিক গড় পাট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,৮০,৩৬০ টন। এই

অবস্থায় শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭১ – এ Jute Corporation of India সংক্ষেপে J.C.I. গঠন করে। ১৯৭২-৭৩ থেকে J.C.I কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত দামে পাট ক্রয় আরম্ভ করে।[৪৯] কিন্তু সেই দাম কৃষকদের পাট উৎপাদন খরচের চাইতে অনেক কম এবং দেশে গড় বার্ষিক উৎপাদিত পাটের ১০% -এরও কম পাট তারা ক্রয় করেছে। এই অবস্থায় পাটকল মালিক, আড়তদার ও মহাজনের কাছে পাট চাষীদের অবস্থা দাঁড়ায় বাঘের কাছে হরিন-শাবক রাখা। এই পাট বিক্রয়ের জন্যও J.C.I. – কে নির্ভর করতে হয় প্রধানত পাটকল মালিকদের উপর। আর এই মালিকেরা কখনও "বাজার" নেই, কখন "কাঁচামাল" –এর অভাব বলে পাটকল বন্ধ করে দিয়ে একদিকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়াকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে অপর দিকে পাট না কিনে কৃষককে জলের দামে পাট বিক্রি করতে বাধ্য করছে। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য পাট শিল্প, পাট কল শ্রমিক ও পাট চষীদের স্বার্থে পাট শিল্প ও পাটের পাইকারী ব্যবসা জাতীয়করণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কৃষকরা জাতীয়করণ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন করে আসছে, তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়ও দু'বার সর্বসম্মতভাবে জাতীয়করণের প্রস্তাব গ্রহন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সুফল কিছুই হয় নি।

কেউ কেউ মনে করে কাঁচা পাটের অভাবেই পাটকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই ধারনা একেবারেই ভ্রান্ত। কারণ পাটের ন্যায্য দাম পেলে চাষীরা উৎপাদন বাড়াতে রাজি আছে – তার প্রমাণ ১৯৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৬, ৯৭ সালের উৎপাদন, তাছাড়া আমাদের দেশের কৃষি-বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এখন ১২ মাসই পাট চাষ হয় এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হারও আগের তুলনায় অনেক বেশি, যেমন- ১৯৫১-তে হেক্টর প্রতি

পাট ও মেস্তার গড় উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১০৯৬.৭ কেজি ও ৭৭৬.১ কেজি, ১৯৯৩-৯৪ –তে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৯০৭ ও ১০১৬ কেজি।[৫০]

কোন জাতের পাট	রোপণের সময়	কাটার সময়
সাদা পাট	ফেব্রুয়ারি	৯০-১০০ দিন পর
তোষা পাট	মে	৯০-১০০ দিন পর
মেস্তা পাট	আগস্ট	১১০-১২০ দিন পর
শন পাট	নভেম্বর	৯০-১০০ দিন পর

সূত্র: সেন্ট্রাল জুট রিসার্চ

যতক্ষণ পর্যন্ত পাট কল ও পাটের পাইকারী ব্যবসা জাতীয়করণ করা না হচ্ছে, ততক্ষন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কৃষককে এই সংকটের হাত থেকে বাঁচতে এবং ক্রমবর্ধমান বেকারী রোধ ও আংশিক ভাবে হলেও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়াও পাটের তন্তুকে উন্নত করে পাটের আঁশ বের করার নতুন আবিস্কারের মাধম্যে গুনমানে উন্নত তন্তুর সমস্যা দূর করা সম্ভব। কিছু কিছু কাজও শুরু হয়েছে নানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, যেমন – চট মিশ্রিত কাপড়, পাটের গুড়ো দিয়ে তৈরি বোর্ড, পাটের তন্তু থেকে কাগজের মন্ড, পাট মিশ্রিত কম্বল, পাট ও অন্যান্য রাসায়নিক তন্তু মিশ্রিত কার্পেট, বাজারের থলে, ভূমি ক্ষয় রোধ করার জন্য চটের চাদর (জিও টেক্সটাইল) ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে পোষাক পরিচ্ছদ তৈরির জন্য সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি করা। এছাড়া নানা ধরণের খেলনা, সুটকেস, জুতো এছাড়াও পাটের ব্যবহার করে দরজা, জানলা, দেওয়ালের পর্দা সহ নানা গৃহস্থালী সৌখিন জিনিস, নানা ধরণের সৌখিন গহনা, সৌখিন ব্যাগ তৈরি করা

সম্ভব হয়েছে। কাঠের পরিবর্তরূপে পাটের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে, দরজা-জানলা আসবাবপত্র তৈরির ক্ষেত্রে যা কাজে লাগে।[৫১]

শুধু পাটের তন্তু নয়, পাটকাঠি বা তার টুকরো দিয়ে প্রস্তুত পার্টিসন বোর্ড, টেবিলটপ, হালকা সিলিং এবং আরো বহু কিছু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ব্রিফকেস সহ নানা ধরণের বাক্স প্রস্তুত করা, সারকুলার-লুমে তৈরি বড় ব্যাগ যাতে ফল ও সব্জি পরিবহন করা যায়, কাঁচা পাট থেকে কাগজ তৈরি শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে।[৫২]

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত তিনটি গবেষণাগারের উপর পাট সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের দায়ভার ন্যাস্ত আছে। সেগুলি হলো, জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ। এছাড়া বিপণনের জন্য জুট ম্যানুফ্যাকচার্স ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ও ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুট ইন্ডিয়া সংস্থা দু'টির প্রধান কেন্দ্র এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই। গবেষণা সংস্থাগুলি বহু বছর ধরে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বীজ উৎপাদন পদ্ধতি ও কারিগরি বিদ্যা উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাট শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।[৫৩] আরও আরও গবেষণা এবং তার উপযুক্ত পরিবেশ ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া পাটের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

দেশভাগের ফলে পাট চাষের বেশির ভাগ অঞ্চল বাংলাদেশ চলে যাওয়ায় পাট শিল্পের কাঁচামালের সংকট দেখা দিল। এর মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে পাটের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে এগিয়ে এল। এতে উৎসাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাট চাষিরা দ্রুত পাটচাষের বিস্তার ঘটিয়েছিল। কিন্তু আজ সে উৎসাহ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। সরকার এখনও পাটের নূন্যতম সহায়ক মূল্য ঠিক করে দেয় এটা ঠিক। কিন্তু পাটের বাজারে এখনও একচেটিয়া আধিপত্য সেই ফড়ে-ফাটকাবাজদেরই।[৫৪] গরিব পাটচাষিদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাট ওঠার

পরেই এই ফড়ে-আড়তদাররা যোগসাজশ করে সব চেয়ে কম দামে পাট কিনে আড়তে মজুত করে রাখে। সরকারি সংস্থা 'জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের কারিগর এবং শিল্পীদের ওপরেও। তাই এই কথা বলা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না যে অন্যান্য সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও পাট শিল্প ততক্ষন কিছুতেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না যতক্ষণ পাটচাষের সংকটমোচন না হয়।

বিপন্ন পাটশিল্প

স্বাধীনতা লাভের সময় পশ্চিমবঙ্গে পাটকলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। একের পর এক সেগুলি বন্ধ হতে হতে সংখ্যাটি বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৭১-এ। এরই সাথে তাল মিলিয়ে কমেছে শ্রমিক সংখ্যা।[৫৫] কিন্তু পাটশিল্পের উৎপাদনের অনেকটাই দেশিয় বাজারের চাহিদা মেটাতে কাজে লেগে যায়। প্রধান ক্রেতা হল দেশের সরকার। তাহলে সংকটটা কোথায়? বড়োসড়ো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাট শিল্প এগোচ্ছে না কেন? একের পর এক পাটকলে কেনইবা পড়ছে তালা! পাটকলগুলি কখন যে চালু, আর কখন যে বন্ধ, তার যেমন কোন স্থির থাকে না, ঠিক তেমনই চালু থাকা পাটকলেও কখন যে কার কাজ আছে, আর কখন যে 'গেটবাহার' – তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।[৫৬] এর উত্তর পেতে যেতে হবে পাটশিল্পের মালিকানার বিষয়ে। ব্রিটিশ আমলে পাটশিল্পের বেশির ভাগ মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের হাতে। অবশ্য তখনও যে পাটকলগুলি খুব শিল্পসম্মত ভাবে চলত, তাও নয়। স্বাধীনতার উত্তর কালে পাটশিল্পের মালিকানা প্রায় পুরোটাই চলে এল দেশিয় মালিকদের হাতে। এর ফল কী হল? ব্রিটিশদের হাত থেকে পাটকলগুলির মালিকানা যাদের হাতে এল, তারা ছিল মূলত পাটের ফড়ে ব্যবসায়ী। এরা পাটশিল্পে ফাটকা কারবার ফেঁদে চটজলদি অনেক বেশি মুনাফা কামানো এবং তা

অন্য জায়গায় খাটিয়ে আরও বেশি 'মুনাফা' করার নেশায় মেতে উঠল। ফলে এই শিল্পে আরও বেশি টাকা ঢেলে গবেষণা আর উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর হল না। উপরন্তু ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার থেকে নেওয়া ধারের টাকা শোধ না করে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না মিটিয়ে, এরা শিল্পটাকে আপাদমস্তক ঋণে ডুবিয়ে দিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ব্রিটিশ জামানার শেষে প্রথমবার পাটকলগুলির মালিকানা বদল এর পর থেকে যতবার মালিকানার হাত বদল হয়েছে, ততই বেশিকরে পাট শিল্প জুড়ে ফড়ে – ফাটকাবাজ- মজুতদারেরা জাঁকিয়ে বসেছে। এমনকি, দেশিয় মালিকানাধীন পাটকলের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এমনটি হচ্ছে। বর্তমানে বহু পাটকলেরই বৈধ মালিকানার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে।[৫৭]

পাট শ্রমিকের অবস্থা

বর্তমানে এই অতিমারি পরিস্থিতিতে কাঁচা পাটের অভাবে বহু পাটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজ হারিয়েছে ২১,৫০০ শ্রমিক।[৫৮] পাটশিল্পের সার্বিক সমস্যা নিয়ে বৈঠকে বসে ২১টি ইউনিয়ন। রাজ্যে কাঁচা পাটের অভাব মেটানোর জন্যে প্রধানমন্ত্রী , কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, জুট কমিশনার এবং শ্রম কমিশন কে চিঠি দেওয়া হয়। এই করোনা আবহে বন্ধ চটকল ও কর্মহীন হয় বহু মানুষ।

সমীক্ষা রিপোর্ট (আনন্দবাজার পত্রিকা ২০২১)

• মিলের নাম	• কর্মহীন শ্রমিক সংখ্যা
• ডেলটা জুট মিল (হাওড়া)	• ৪০০০
• হনুমান জুট মিল (হাওড়া)	• ৪০০০
• ওয়েলিংটন জুট মিল (হুগলি)	• ৪০০০
• বজবজ জুট মিল (দঃ ২৪ পরগণা)	• ৪৫০০
• রিলায়ান্স জুট মিল (উঃ ২৪ পরগণা)	• ৫০০০

২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে পাটের উৎপাদন তার আগের বারের তুলনায় ৪০% কম হয়েছে।[৫৯] পাটকলগুলিতে কাজের পরিবেশ খুবিই শোচনীয়। বহু ক্ষেত্রেই পাটকলগুলি জরাজীর্ণ রুগ্ন প্রায়। মাঝে মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে দুর্ঘটনার নজিরও রোজমেলে। বৃষ্টি বাদলের দিনে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত শ্রমিকেরাই ভিজতে থাকে। মেঝেতে জমা জলে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। বহু পাটকলে মেশিনের অবস্থা লজঝরে। স্পেয়ার পার্টস এর জোগান নেই। কাঁচা মালের জোগানও অনিয়মিত। পাটকল মালিকদের মধ্যে মধ্যে পাটকলের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী কাজে লাগানোর উদ্যোগ দেখা যায় না। শ্রমিকদের ওপরে বাড়তি কাজের বোঝা চাপানোর জন্য শ্রমিকদের জুলুমবাজি সইতে হয়।[৬০] অনেক পাটকলেই শ্রমিকদের বস্তিগুলি ভাঙ্গাচোরা। লকডাউন ও করোনার প্রকোপে এই শ্রমিকবস্তির শ্রমিকদের কাজ বন্ধ থাকার ফলে ভিক্ষার ঝুলি হাতে দেখা গেছে রাস্তায়!

পাট শিল্পের এই দুরবস্থা দূর করতে সময় মতো রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সামগ্রিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। অল্প কয়েকটি পাটকলের জাতীয়করণ হল বটে, তবে এগুলিকে 'মডেল পাটকল' হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা তো হলই না, বরং চরম অব্যবস্থা আর সীমাহীন লুটপাটের ফলে এই পাটকলগুলিও রুগণ শিল্পের খাতায় নাম তুলে ডুবে গেল। অন্যদিকে বেসরকারি পাটকল মালিকদের বেপরোয়া ফড়ে-ফাটকাবাজির তোষণই প্রকারান্তরে করে গেছে সরকার। সরকারের তৈরি 'রুগণ শিল্প আইন' (সিকা) এর মধ্য দিয়ে এই সব লুটেরারা তাদের সাতখুন মাপ এর ছাড় পত্র পেল।[৬১] এসবের নিট ফল আজ পাট শিল্পের করুন দশা। নামমাত্র যান্ত্রিকীকরণ ছাড়া প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় কায়দায় জুলুমবাজি করে, শ্রমিকদের ঘাড়ে বাড়তি কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, উৎপাদন বাড়ানোর পথটিও তার শেষ সীমা

অতিক্রম করেছে। নানা ধরণের অস্থায়ী শ্রমিককে পাটকলগুলিকে এখন ভর্তি করে ফেলায় উৎপাদনের পরিমাণ ও গুনমানে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ফলে পাটজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা বর্তমান অবস্থায় বাংলার পাটশিল্পের আর নেই। সে কারণেই প্লাস্টিক ব্যাগ ও পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। যে পথে পাটকলগুলি এতদিন চলেছে, সেই পথে আর এগুনো সম্ভব নয়। নতুন গবেষণা আর উন্নয়নের মাধ্যমে এই শিল্পটাকে এগিয়ে না নিয়ে যেতে পারলে তার পরিনাম ভয়ঙ্কর। [৬২]

বিকল্প দ্রব্য

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৭০ এর দশকে পৃথিবী জুড়ে পাটের পাটের ব্যবহার কমে আসার অন্যতম প্রধান কারণটি হল বিকল্প হিসেবে সিন্থেটিক বা কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার।[৬৩] ১৯৬০ সালের শেষ ভাগ থেকেই পাটের বদলে সিন্থেটিক জিনিসের বহুল ব্যবহার দেখা গেল বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মোড়কের কাজে, শিল্প ক্ষেত্রে, এমনকি কার্পেট তৈরিতেও। সিন্থেটিক ও পাটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ আছে।[৬৪] সিন্থেটিকের উপাদান পলিপ্রপিলিন কাপড় তৈরি এবং বস্ত্র বয়ন এই দু'রকম কাজেই ব্যবহার করা যায়। পাটের থেকে পলিপ্রপিলিন এর সংশক্তি অনেক বেশি। এটি অপচনশীল। সহজে নষ্ট হয় না। এমনকি অ্যাসিড লাগলেও চট করে গলে বা ক্ষয়ে যায় না। পলিপ্রপিলিন রাসায়নিকভাবেও নিষ্ক্রিয়। পাটের বিকল্প হিসেবে এটির বহুল ব্যবহারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি অনেক হালকা। একটি বড় পাটের বস্তার মাত্র এক চতুর্থাংশ ওজনেই এটি অনেক বেশি শক্ত ও টেকসই। এই সব কারণে ১৯৮০ এর দশক থেকেই পাটের বিকল্প জিনিস হিসেবে পেট্রোলিয়ামজাত এই তন্তুর

ব্যবহার ক্রমাগত যত বাড়তে থাকল, ততই পাটজাত জিনিসের চাহিদা কমল। বর্তমানে পেট্রোলিয়ামজাত এই তন্তু ছাড়াও তিসির ছাল, কেনাফ, রোজেলা, ম্যানিলা হেম্প বা শন, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারও পাট শিল্পকে সমস্যায় ফেলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত সিমেন্ট উৎপাদন কারখানাগুলি সিমেন্ট মোড়কের ক্ষেত্রে চটের বস্তা ব্যবহার করত। কিন্তু তারা এখন সিন্থেটিক ব্যবহার করে। একই কথা বলা যায় বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও আলুর মোড়কের বেলায়।[৬৫]

পাটের বিকল্প জিনিসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার পাট শিল্পের সংকট গভীর করে তুলেছে। রুগণ পাট শিল্পকে বাঁচাতে মোড়কের ক্ষেত্রে পাটকে আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে 'জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট' চালু হয়েছিল।[৬৬] এই আইনের ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার পাটকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নানা প্রযুক্তির মাধ্যমে পাটজাত বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের পথ খোঁজার জন্য 'স্টিয়ারিং কমিটি ফর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ টেকনিক্যাল টেক্সটাইল' গঠন করে। এই কমিটি পাট থেকে সাতরকম কাপড় বা বস্ত্র উৎপাদনের উপর জোর দেয়, যেমনঃ ১) অ্যাগ্রোটেক – ছোট গাছ লাগাবার জন্য নার্সারি ব্যাগ হিসাবে , ২) বিল্ডটেক – নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য, ৩) জিওটেক – মাটির ক্ষয় ও ধস রোখার জন্য, ৪) ওয়িকোটেক – খাবারের প্যাকেট ও ময়লা ফেলার ব্যাগ তৈরি ও জঞ্জাল ঢাকা দেওয়ার জন্য, ৫) প্যাকটেক – উন্নত ধরণের মোড়কের জন্য, ৬) প্রোটেক – সম্পদ, সম্পত্তি ও দামই জিনিস সুরক্ষার জন্য, এবং ৭) ইন্ডাটেক – গ্লাভস, অ্যাপ্রন ও জুতোর বাইরের আবরণ তৈরির জন্য। [৬৭]

'জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট – এ পাটকল মালিকরা কিছুটা সুবিধা অবশ্যই পেল। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই

আইনে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে পাটের মোড়কের ব্যবহার স্থায়ী ভাবে বাধ্যতামূলক করা হল না। আবার, প্রতি বছর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পাটের তৈরি ব্যগ এর ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দিলেও তা কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখার কোন ব্যবস্থা এই আইনে ছিল না। এখানে বলা দরকার যে এই আইন সত্ত্বেও পেট্রোলিয়ামজাত সিন্থেটিকের মোড়ক পাটজাত মোড়কের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বাজার ছেয়ে ফেলল। দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থান্বেষী ভুবনীকরণ নীতি, উদার অর্থনীতি ও 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র হুকুমের কাছে আমাদের দেশের সরকার ক্রমাগত মাথা নোয়াল। এইসব নীতির লক্ষ্যই হল দেশিয় শিল্প, কৃষি এবং তার বাজারকে ধ্বংস করা। যেমন, ২৫ কিলোগ্রাম ছোট প্লাস্টিক ব্যাগে খাদ্যশস্য, আলু, চিনি ইত্যাদি মোড়কজাত করে অপেক্ষাকৃত বেশি দামের ৫০ কিলোগ্রামের পাটের বস্তা বা থলেকে কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছে।[৬৮] উপরন্তু, 'জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট' এর যেটুকু সুবিধা আছে, পাটের ফড়ে-ফাটকাবাজরা সব সময় সেই সবের পুরো সদ্ব্যবহার না করে ক্ষেত্রবিশেষে এদের অনেকেই প্লাস্টিকের কারবারে ভিড়ে গেল। তাই ক্রমবর্ধমান পাটের বস্তার মোড়কের চাহিদা পূরণের জন্য পাট শিল্পের সম্প্রসারণে এদের তরফে কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের মত ৫, ১০, ২০ বা ২৫ কিলোগ্রাম এর পাটের তৈরি থলে বা বস্তা তৈরি করে প্লাস্টিকের মোকাবিলা করার মত কোন উদ্যোগ এদেশে পাটশিল্পের ফড়ে- ফাটকাবাজরা নেয়নি। উল্টে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তারা প্লাস্টিকের বাজার দখলকে একটা স্থায়ী বাহানা হিসেবে খাড়া করেছে।[৬৯]

এখানে একটি কথা বলা বিশেষ ভাবে দরকার যে পাটের তৈরি ব্যাগ বা থলের থেকে প্লাস্টিকের মোড়ক বেশ সস্তা এরকম এক প্রচার আছে। সামগ্রিকভাবে সামাজিক

ব্যয়ের (Social Costing) দৃষ্টিভঙ্গিতে হিসেব করলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ায়। পাটগাছের বিপুল পরিমাণ কার্বন শোষণের বিপরীতে পলিপ্রপিলিন তৈরির সময় উৎপন্ন কার্বন এর তুলনা করলে, বা প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য দেশের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক ক্ষতির সঙ্গে পাটের বর্জ্যের প্রকৃতিতে মিশে যাওয়ার স্বাভাবিক গুনকে তুলনা করলে বিষয়টা অনেকটাই স্পষ্ট হয়।[৭০] পাট ও পাটজাত জিনিসের ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির যুক্তিসম্মত অগ্রগতি, সর্বোপরি ফড়ে-ফাটকাবাজ মালিক এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা শিল্পবিরোধী ও জনবিরোধী কার্যকলাপে যে বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি পাটশিল্পকে প্রতিনিয়ত বইতে হচ্ছে, তা বন্ধ করতে পারলে পাটজাত জিনিসের দাম এমনিতেই অনেকটা কমবে। চাহিদার ক্রমবৃদ্ধি অনুযায়ী ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটলেও দাম কমার কথা। এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে পাটের থেকে প্লাস্টিকের মোড়ক সস্তা, এই যুক্তি স্বভাবতই ধোপে টেঁকে না।

এখানে অবশ্যই বলা দরকার যে এ দেশে প্লাস্টিক ব্যাপক ভাবে ঢুকে পড়ার ফলে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে তার ক্ষতিকারক ভূমিকা ভয়ানক বিপদ ডেকে আনছে। প্রথমটি হল খাদ্যদ্রব্যে প্লাস্টিকের বিষক্রিয়া, যার থেকে ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য যেখানে সেখানে থেকে যাবার ফলে তা খেয়ে প্রতি বছর বেশ কিছু গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে। তৃতীয়ত, জল নিকাশি ব্যবস্থার বাধা সৃষ্টি করে প্লাস্টিক অনেক জায়গাতেই ফি-বছর বন্যা ডেকে আনছে। এমন ধরণের সমস্যা চলতে থাকার পাশাপাশি পরিবেশের সংকটও ক্রমশ বাড়ছে। পরিবেশ সুরক্ষার দিক দিয়ে বর্তমানে পাটের থলে বা বস্তার বিকল্প হিসেবে বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিক বা কাগজের ব্যাগের এক তুলনামূলক বিচার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বনের গাছ কেটে মন্ড তৈরি করে কাগজ তৈরি হয়। ১ টন কাগজ তৈরি

করতে ১৭টি গাছ কাটতে হয়।[৭১] পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে ১০ লক্ষেরও বেশি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগের মূল উপাদান সিন্থেটিক পলিমার তৈরি হয় অপুনর্ভব শক্তি পেট্রোলিয়াম থেকে। এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কাঁচামালের প্রয়োজনে প্রতি বছরে পৃথিবী জুড়ে মোট খনিজ তেলের ৪% ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ পচনশীল নয়। ১ টন পাট থেকে তৈরি থলে বা বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগা জুল তাপ এবং ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বনডাইঅক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে।[৭২] অন্যদিকে ১ টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগা জুল তাপ ও ১৩৪০ টন কার্বনডাইঅক্সাইড মেশে। এই সব ক্ষতিকারক দিক বিবেচনা করে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' খাদ্যশস্য ও চিনি মোড়কজাত করার জন্য পরিবেশ-বান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে।

এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে মানতেই হয় যে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার মানবিক দাবি মেনে পরিবেশ-বিনাশী প্লাস্টিকে খাদ্যদ্রব্য মোড়কজাত করা পুরো নিষিদ্ধ করা দরকার। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এর বদলে পাটের তৈরি ব্যাগ ফিরিয়ে আনা ও তার ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে। কাজটি করা গেলে পাট চাষ ও পাটশিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। পাটজাত জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা যে অত্যন্ত অনুকূল অবস্থা তৈরি করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্লাস্টিকের আগ্রাসনকে যতই কমানো যাবে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ-বান্ধব পাটের সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল ও বাস্তব হয়ে উঠবে।

৪.৩. প্রসঙ্গ বাংলার পাটশিল্পের শ্রমিক আন্দোলন

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস গবেষণা করতে গিয়ে প্রথম আলোচনায় উঠে আসে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য শ্রী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। শ্রমিক আন্দোলনের

সাথে যার সংযোগ ছিল ভীষণ ওতপ্রত ভাবে। বাংলার সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রোণেতা শশিপদ ব্যানার্জী'র অবদান গুরুত্বপূর্ন।

কলকাতার বরানগরে জন্মগ্রহ করেন শশিপদ ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে।[৭৩] পিতা ছিলেন রাজকুমার ব্যানার্জী। শশিপদর যখন চার বছর বয়স, তখন তিনি তাঁর পিতাকে হারান। একটি হিন্দু যৌথ পরিবারে কাকা-কাকিমাদের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও শশিপদর মা তাঁর সন্তানদের শিক্ষালাভের বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন। শশিপদর জীবনে তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল অসীম। শশিপদরা চার ভাই ছিলেন। এঁদের মধ্যে শশিপদ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তাঁর মা প্রায়ই বলতেনঃ 'আমার সন্তানরাই হচ্ছে আমার ধর্ম, তাদের ঠিক ঠাক দেখভাল করার অর্থই হচ্ছে ঈশ্বর সেবা'।[৭৪] ন'বছর বয়সে শশিপদর উপনয়ন হয়। একটা ইংরেজি বিদ্যালয়ে তাঁর পঠন-পাঠন চললেও তিনি ম্যাট্রিকুলেট হওয়ার পর আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেননি মূলত স্বাস্থ্যের কারণে। ম্যাট্রিক স্তরের পড়ে তাঁর প্রথাগত শিক্ষা আর না এগোলেও নিজের উদ্যোগ ও চেষ্টায় তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়াশুনা চালিয়েছিলেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সে বিনাপণে তেরো বছর বয়স্কা রাজকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারীও ছিলেন নিরক্ষর। বিয়ের পরের বছর থেকেই তিনি তাকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন। ছেলে আলবিয়ান রাজকুমার ব্যানার্জী 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'-এ কচিনের (Cochin) 'দিওয়ান' (Diwan) যুক্ত ছিলেন।[৭৫] (১) (Kumar 2004)

শশিপদ ব্যানার্জী ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হোন ১৮৬১ সালে।[৭৬] বাংলার সামাজিক সংস্কার(The Social Reform Movement) আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েন। Mary Carpenter-এর সাথে দেখা করেন ১৮৬৬ সালে।[৭৭]

সুশিক্ষিত একজন ব্রিটিশ নাগরিকের আমন্ত্রণে কালাপানি পাড়ি দিয়েছিলেন। যতদূর জানা যায় তিনিই হয়তো প্রথম হিন্দু সস্ত্রীক সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে পৌঁছান। এই সময়ে মহিলাদের সমুদ্র পাড়ি দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম ব্রাহ্মণ মহিলা রাজকুমারী ব্যানার্জী জল পথে পৌঁছলেন ব্রিটেনে ভারতের চিরাচরিত প্রথাকে উপেক্ষা করে ১৯ এপ্রিল ১৮৭৭ সালে।[৭৮] (২) (Benoy 1978)

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী ছিলেন মূলত ধনী অভিজাত শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গ তাঁদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনের যে পরিসর নির্মিত হয়েছিল, তা তার বিকাশের পর্যায়ে প্রথাগত ধারার গন্ডি অতিক্রম করে ষাটের দশকের প্রত্যুষলগ্ন থেকে ব্যাপ্তির এক নতুন দিশায় অভিযোজিত হয়েছিল। ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার যে বীজ নিহিত ছিল, তা তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কোনরকম ভাবে ঘরবন্দিত্বকে সে মেনে নিতে পারেনি। এই বিকাশের প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের সংঘাত অবধারিত হয়েছে, তেমনই অবধারিত হয়েছে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের সংঘাত, কেশবচন্দ্র-শিবনাথ শাস্ত্রীদের সংঘাত। আবার একইসঙ্গে দেখা গিয়েছে ব্রাহ্ম ধর্মীয় সংস্কারের সীমায়িত পরিক্ষেত্রের বাইরে এসে সমাজের কুলি-শ্রমিক-কৃষক স্বার্থ-সচেতনতায় অগ্রসর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তরুণ ব্রাহ্ম নেতারা। নিছক কুসংস্কার বিরোধিতা এবং শিক্ষাবিস্তারের অনুকূল সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের যে প্রচলিত রূপরেখা বর্তমান ছিল, তা তার বিকাশের অবধারিত পর্যায়ে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের স্বার্থমনস্কতায় নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের ধারায় মিশে গিয়েছিল। আন্দোলনের এই নতুন ধারায় ব্রাহ্মধর্মের অস্তিত্বই লোপ পেয়েছিল। তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে শশিপদ

ব্যানার্জী ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি প্রচলিত সংস্কার আন্দোলনকে আরও গভীরতাদানে প্রয়াসী হন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিক স্বার্থের প্রতি মমত্ববোধের জায়গা থেকে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের চিন্তা ও মনকে, ঔপনিবেশিক ভারতে, অনুশীলন ও প্রয়োগবদ্ধ করেছিলেন। নতুন ধরণের বলছি এই কারণেই যে, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা রাধানাথ শিকদার একটা সময় শ্রমিকদের প্রাপ্য আদায় ও শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার কথা বললেও, তাকে স্বচিন্তা থেকে কার্যকরী করার ব্যাপারে শশিপদ ব্যানার্জীই সম্ভবত প্রথম পথপ্রদর্শক। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ভারতে শশিপদ ব্যানার্জীর এই চিন্তার অনুশীলন ও প্রয়োগ-প্রচেষ্টাকে ঐতিহাসিক কর্ম হিসেবে সম্মান জানাতে হয়।[৭৯] (৩) (Shibnath 1993)

চিন্তাশীল ভারতীয়দের অভিপ্রায় ছিল তাদের দেশের সমাজকে আধুনিক বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনানুগ করে তুলবেন। সেই কাজে তারা কোন বাধাকেই আসতে দেবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞও ছিলেন। সেইরকমই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা পরম্পরাগত ধর্মীয় সংস্কারের কাজে নামেন। কারণ তখনকার দিনে ধর্ম মানুষের জীবনের মূল অংশ ছিল। ধর্মীয় সংস্কার ব্যতিরেকে সমাজ সংস্কার কিছুই হত না। ধর্মের মূল ভিত্তির প্রতি অবিচল থেকে ভারতীয়দের নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মের ভিতকে তারা পুনর্গঠন করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ঐতিহ্যকে ১৮৪৩ সালের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এগিয়ে নিয়ে যান। বৈদিক শাস্ত্র যে অভ্রান্ত তা তিনি প্রকাশ্যেই অস্বীকার করেন। ১৮৬৬ সালের পরে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান।[৮০] ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করার চেষ্টা করে। এর কুপ্রথাগুলিকে দূর করে। একে এক ঈশ্বরের ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। বেদ ও উপনিষদের শিক্ষার ওপরে

ভিত্তি করেই হিন্দু ধর্মকে গড়তে চেয়েছিল। যদিও বেদ অভ্রান্ত এই মত তারা অস্বীকার করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনার সবথেকে ভালো দিকগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা হত। সর্বোপরি মানুষের যুক্তির উপরেই নির্ভর করতো ব্রাহ্ম সমাজ। কারণ বর্তমান বা অতীতের ধর্মীয় নীতিসমূহ ও আচার আচরণের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি অর্থহীন তার বিচার একমাত্র মানুষের যুক্তিই করতে পারে- এরকমই মত ছিল। সেই কারণেই ব্রাহ্ম সমাজ পুরোহিত শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। ধর্মীয় লেখাপত্রকে ব্যাখ্যা করার কাজে তাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একটি ধর্মীয় গ্রন্থে বা নীতির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক কোনটি বেঠিক বিচার করার অধিকার ও ক্ষমতা দুইই আছে। এইভাবে মূলত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল।[৮১] বিরোধিতা করতো সংস্কার প্রথাপ্রকরণ আচরণ। বস্তুত সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থাটিকে তারা মানতো না। তারা পুরোহিত বিনা এক ঈশ্বরকেই আরাধনা করতে পারতেন।

ব্রাহ্মরা মহান সমাজ সংস্কার ছিলেন তারা সক্রিয়ভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন। তারা বাল্য বিবাহেরও বিরোধিতা করেন। মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকে সমর্থন করেন। তারা বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন। তারা চাইতেন আধুনিক শিক্ষা পুরুষ ও নারী উভয়েরই কাছে পৌঁছাক।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অভ্যন্তরীন গোলমালের কারণে ব্রাহ্মসমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে অধিকন্ত এর প্রভাব কেবলমাত্র শহুরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও বাংলার, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মননশীলতার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভারতের বাকী অংশেও এর প্রভাব পড়ে।

শশিপদ ব্যানার্জী সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ অনলস কর্মী ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুরে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়।[৮২] শশিপদ সে সময় আর্ত মানুষের ত্রাণের জন্য জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহ করে সেই সংগৃহীত অর্থ আর্তত্রাণের জন্য দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় পাঠিয়ে ছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে বন্যা হলে শশিপদ জনসাধারণ ও সরকারের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহ করে ত্রাণের কাজে সাহায্য করেন।[৮৩] ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেয়ো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পৌরসভা গঠনের চিন্তাবিন্যাস ঘটালে, শশিপদ বরানগরে এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়সমূহকে খতিয়ে দেখে এই সুযোগকে কাজে লাগান এবং বরানগর পুরসভা গঠন করেন।[৮৪] তিনি এই পুরসভার অনারারি সেক্রেটারিও হয়েছিলেন।

শশিপদ তাঁর সমাজসংস্কার আন্দোলনকে সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরা নগরে 'সাধারণ ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৫] এই সভাটি ছিল বাস্তব অর্থে একটি মিলনকেন্দ্র, একটি মঞ্চ। এখানে ক্রিশ্চিয়ান, হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রাহ্ম সবাই সমবেত হতে পারতেন। এখানকার সাপ্তাহিক সভাগুলোতে চিরায়ত সত্য (Universal truth) প্রচার করা হতো। যে কোন ধর্মের প্রচারক অন্য কোন বিশ্বাসকে আক্রমণ না করে নিজের দর্শন বা বক্তব্য প্রচার করতে পারতেন। তবে এই সভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বছর কয়েক পরেই এর অবলুপ্তি ঘটে।

শশিপদর চিন্তাভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে 'ক্লাব' গড়ে তোলা। আগস্ট ১, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শশিপদ গড়ে তোলেন 'শ্রমজীবী সংঘ' (Working Men's Club)।[৮৬] এই সংগঠনের 'প্রত্যেক সদস্যের' বাড়িতে 'আলোচনাচক্র' অনুষ্ঠিত হতো এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলতো। কলকাতা

থেকে প্রথিতযশ 'শিক্ষাবিদরা' এখানে এসে বক্তৃতা করতেন। এখানে যাঁরা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীশংঙ্কর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি। যে সদস্যের বাড়িতে আলোচনা সভা বসতো সেই সদস্য ছাড়াও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও (যেমন মা, বোন, স্ত্রী প্রভৃতি) উপস্থিত থাকতেন।

জুটমিলের শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার পরিজনদের দুরাবস্থার সঙ্গে শশিপদর সম্যক পরিচয় ছিল। নভেম্বর ১, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি জুট মিলের শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে ঘোরেন এবং তাদের দুর্দশা সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৮৭] এইসব শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্য বাংলা মাধ্যমে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্নিয়ো কোম্পানির কলকাতা অফিসে গিয়ে তিনি তার মালিক মি. আলেকজান্ডারকে শ্রমিকদের নৈশ বিদ্যালয় নির্মাণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জায়গা দিতে অনুরোধ করেন। সব শুনে মি. আলেকজান্ডার শশিপদর সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হন। বর্নিয়ো কোম্পানির জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার মি. মেয়ার তাঁর মিলের এলাকায় একটা ছোট ঘরে নৈশ বিদ্যালয় চালাবার অনুমতি দেন।[৮৮] খড়ের চালের এই ঘরটি দু'সপ্তাহের মাথায় পুড়ে যাওয়ায়, কোম্পানি নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেন। এই নবনির্মিত নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই তারিখে। এর পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়ের শাখা খোলা হয় কামারপাড়া, আড়িয়াদাহ এবং কুঠিঘাটায়।[৮৯] এছাড়া শ্রীরামপুরে শ্রমিকদের সন্তানের জন্য একটা মিডল বাঙলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শশিপদ 'বরানগর সমাজ উন্নয়ন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক উন্নতিসাধনই ছিল এই সমিতির মূখ্য কাজ।[৯০] ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে নভেম্বর তারিখে এই সমিতির এক সভায় বর্নিয়ো কোম্পানির

স্থানীয় জুটমিলের সহকারী ব্যবস্থাপক মি. এ.এম ব্রাডলে শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থে সচিবদের কৃতকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই ব্র্যাডলে সাহেব ছিলেন তৎকালীন ২৪ পরগনা জেলার সহকারী জেলা সমাহর্তা এবং এই 'বরানগর সমাজ উন্নয়ন সমিতি'র সভাপতি ছিলেন ড. ডেভিড ওঅলডি।[৯১]

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে শশীপদ শ্রমজীবী সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষজনের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ এবং তাঁদের সংগঠিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে জাতি-ধর্মের কোন ভেদাভেদ শশিপদ মানতেন না। হিন্দু বা মুসলিম শ্রমজীবীর সন্তানকে তিনি হিন্দু বা মুসলিম এর নয় শ্রমজীবী মানুষের সন্তান বলেই মনে করতেন। মুসলিম ছেলেমেয়েদের সমস্যাজর্জর অবস্থা সম্পর্কে তিনি যথার্থই অবহিত ছিলেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর তারিখে মুসলিম শ্রমিকদের সঙ্গে এক আলোচনায় তিনি তাঁদের বিদ্যালয় এবং শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বোঝান এবং তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।[৯২] এর ফলশ্রুতিতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই ডিসেম্বর শশিপদ মুসলিম ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।[৯৩] এই মুসলিম সম্প্রদায়ের গরিব শ্রমজীবী মানুষরা শশিপদকেই বরানগরে তাঁদের একমাত্র সুহৃদ বলে মনে করতেন এবং তারা স্বীকার করেছিলেন যে এই শ্রমজীবী সংঘ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শশিপদ তাঁদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন।

শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা, তাদের উপচিকীর্ষা, তাঁদের নিয়ে সংগঠন করার প্রক্রিয়ায় শশিপদর কাছে শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থে সংবাদপত্র প্রকাশ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। আর এই উপলব্ধির বাস্তব রুপায়ন ঘটাতে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন সচিত্র মাসিক পত্রিকা

'ভারত শ্রমজীবী'।[৯৪] আট পৃষ্ঠার একটি অক্টেডো সাইজের এই পত্রিকার দাম ছিল কপি প্রতি এক পয়সা মাত্র। প্রকাশের পর থেকেই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মূলত শিক্ষামূলক এবং শ্রমজীবী মানুষের নৈতিক ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ১৫০০০-এ পৌঁছেছিল। পত্রিকাটির চির শিরোদেশে লেখা থাকতো "শ্রমেই মনুষ্যত্বের মহত্ব"।[৯৫]

'ভারত শ্রমজীবী'র প্রথম সংখ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পঁয়তাল্লিশ পঙ্কতের পুংক্তির 'শ্রমজীবী' শীর্ষক এই কবিতায় ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন...

"ওঠো জাগো শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারীনর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
ওঠো জাগো ডাকিতেছি তাই।
ওই দেখ সাগরের পারে
শ্রমজীবী শত শত
কেমন সংগ্রামরত
এই ব্রত রবেনা আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।"[৯৬]

শশিপদর 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : মফস্বলের জমিদাররা পুলিশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে প্রজাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে পার পেয়ে যায়। ওপরঅলার গোচরে আসবে-না-জেনে দারোগারাও গরিব মানুষের ওপর অত্যাচার করে

থাকে। সাহেব এবং এদেশীয় বাবুরাও কিছু কিছু জুট মিল, সুরকি মিল প্রগতিতে সেখানকার কর্মীদের ওপর নিপীড়ন চালান। এর ৫ বছর পর এক সংখ্যায় লেখা হয়...

"প্রিয়তম শ্রমজীবী গণ! বহুকাল হইতে তোমাদের দুঃখ
আরম্ভ হইয়াছে আজিও তাহার শেষ হইল না।
তোমাদের যে দুঃখ তাহা আর দূর হইল না।
আমরা গরীব। তোমরা লেখাপড়া জান না, তাই যে
যত পারিল তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া
পার পাইল...।
রাজাকে যে বিধাতার সৃষ্টি করিয়াছেন
তোমাদিগকেও সেই বিধাতার সৃষ্টি করিয়াছেন।...
তোমরা শরীরের রক্ত জল করিয়া যাহা উপার্জন কর,
বড়লোকে তাহা দ্বারা বিনা পরিশ্রমে কত আমোদ ও
আহ্লাদে দিন কাটায় কেন? তোমরা লেখাপড়া জান
না সেই জন্যই তোমাদের সকল দুঃখ।... দেশের
বড়লোক কয়জন? তোমরাই সকল, তোমাদেরই দেশ।
তোমরা যদি লেখাপড়া শিখ সহজেই তোমাদের দুঃখ
ঘুচিবে দেশের মঙ্গল হইবে। যাহাতে তোমাদের
কষ্ট দূর হয় আমরা তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব।
তোমরা পাঠ করিয়া উপকার লাভ কর ইহাই আমাদের
নিবেদন"।[৯৭]

এখানে সবিশেষ লক্ষণীয় যে শ্রমজীবী মানুষেদের দুঃখকষ্টের কথা বলে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে সমব্যথী হয়েও তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য শশিপদ কোন কোন সংগ্রামী কর্মসূচি হাজির করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরং তাদের লেখাপড়া শেখার প্রক্রিয়ানুবর্তী করতে চেয়েছেন। লেখাপড়া শিখলেই তাদের 'দুঃখ ঘুচিবে'। এ জাতীয় কথা আপ্তবাক্যের মতো বলেছেন। তাঁদের লড়াইয়ের মন্ত্রে দীক্ষা দেননি।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে শশিপদ যে নজির সৃষ্টি করেছিলেন এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ নিয়ে চিন্তাচর্চার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, উত্তরকালে সেখান থেকে তার হিন্দুধর্মীয় ভাবধারায় নিপতন আপতিক না হলেও কিছুটা বিস্ময়কর বটে।

একটা বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, শশিপদর সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় জমিদার এবং ইউরোপীয় সাহেব। বর্নিয়ো কোম্পানি থেকে তিনি প্রভূত সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ইন্ডিয়ার ডেইলি নিউজ ও অন্য একটি সংবাদপত্রের ইউরোপীয় সম্পাদক যথাক্রমে জেমস ইউলসন এবং মিস্টার কেইন শশিপদর প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর 'বরানগর সমাজ উন্নয়ন' সমিতির সভাপতি ছিলেন ড. ডেভিড ওঅলডি। শশিপদর ভূয়সী প্রশংসা করে সমিতির সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন মিস্টার ব্রাডলে। এসবের কারণ কি? ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ড থেকে দেশে ফিরেই শশিপদ 'নর্থ সুবারবান অ্যাসোসিয়েশান' গঠন করেন।[৯৮] এই ঘটনাটিও মনোযোগের দাবি রাখে। মিস মেরি কার্পেনটার তো শশিপদর অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শশিপদ তো কার্পেনটারের আমন্ত্রণেই ইংলন্ডে গিয়েছিলেন তাঁর অতিথি হয়েই। কার্পেনটারের কাছে লেখা এক চিঠিতে শশিপদ তাঁর সামাজিক সংস্কার কর্মের জন্য 'বিদেশি সাহায্যের' প্রয়োজনীয়তার কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি কেশবচন্দ্রের পথানুসারী। আর এই বিদেশি

সাহায্য-এর অর্থই ছিল ইংলন্ডের সাহায্য। এদেশে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যথাক্রমে স্যার জন ফিয়ার, তাঁর 'বরানগর সমাজ উন্নয়ন' সমিতির সভাপতি ড. ওঅলডি যিনি, একইসঙ্গে 'সালফিউরিক অ্যাসিড ম্যানুফ্যাকচারার' ছিলেন, চব্বিশ পরগনা জেলার জেলা সমাহর্তা ও অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা যথাক্রমে মিস্টার ককরেল এবং মিস্টার ব্রাডলে প্রমুখের সঙ্গে।

স্যার জন ফিয়ার এবং তাঁর স্ত্রী শশিপদর 'সর্ব্ববিধ সংস্কার' কর্মে সর্বদা সাক্ষাৎভাবে নানা প্রকারে সাহায্য করতেন। তিনি শশিপদকে একবার লিখেছিলেন...

"তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, প্রয়াস বলিষ্ঠ এবং
দিকনির্দেশী। আর এই কাজে তোমার ওপর
চেপে-বসা আর্থিক বোঝা কিছুটা হালকা করা আমার কর্তব্য"।[৯৯]

বরানগর ইনস্টিট্যুট-এর (যার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মিস্টার ওঅলডি) আয়ের প্রধান উৎসই ছিল। ইউরোপীয়দের নিকট থেকে পাওয়া এককালীন দান। ইংলন্ডে থাকাকালীন শশিপদ ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। মিস মেরি কার্পেনটার ও তাঁর বন্ধুরা মিলে শশিপদকে দিয়েছিলেন ১০০০ টাকা। ড. ওঅলডি, চব্বিশ পরগনা জেলার বিচারক মিস্টার বুফোর্ট এবং জে.বি.ফিয়ার-এর নিকট থেকে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। এ ছাড়া ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান দিয়েছিল ২৫০ টাকা। শশিপদ সম্ভবত সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সহযোগিতা পেয়েছিলেন বর্নিয়ো জুট কোম্পানির মালিক মিস্টার আলেকজান্ডারের নিকট থেকে। এছাড়া সংস্থা হিসেবে বর্নিয়ো জুট কোম্পানি শশিপদকে যথেষ্ট কার্যকরী সাহায্য যুগিয়েছিল।" - এসবের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠে আসে ঔপনিবেশিক ভারতে সামাজিক সংস্কারসাধন এবং শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণকামিতায় বিদেশি ইংরেজদের এই উদার

সাহায্য-সহযোগিতা কেন? এর উদ্দেশ্য কী ছিল? ইংলন্ড থেকে ফিরে এসে এই সব বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত এভাবে বিদেশিদের সাহায্য-সহযোগিতাপ্রাপ্তির বিষয়াবলী প্রশ্নাতীত হতে পারে না। পাশাপাশি একথাও বাস্তব সত্য যে শশিপদ শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই করেন নি, তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন যা কোনরকম সংগ্রামী কর্মসূচি গ্রহণ করার পরিবর্তে কিছু ভ্রামণিক প্রকল্পের রূপদান করেছিল।[১০০]

ইংলন্ড থেকে দেশে ফিরে আসার পরবর্তীতে শশিপদ 'ভারত শ্রমজীবী' প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকায় তিনি কী বক্তব্য প্রচার করতেন। 'ভারত শ্রমজীবী'র এক বছরের যে সংখ্যাগুলির সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে...

১. ‘পাঠকগণ। প্রিপ এলবার্ট কে তাহা তোমরা জান না। আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামীর নাম প্রিন্স এলবার্ট।... প্রিন্স এলবার্ট যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন সেই বৎসরে আমাদের মহারাণীরও জন্ম হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে... আমাদের মহারাণীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এখানে শশিপদ বারবার ব্রিটেনের মহারাণিকে তাঁর ‘ভারত শ্রমজীবী’ পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় ‘শ্রমজীবী ভাই’ এবং পাঠকদের ‘আমাদের মহারানী’ বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১০১] ঔপনিবেশিক ভারতে বিদেশি শাসকদের তিনি কী চোখে দেখতেন তা এখানে স্পষ্ট। এবং এভাবে তিনি ব্রিটিশ শাসন ও ‘আমাদের মহারাণী’ সম্পর্কে একটা দৃষ্টি আচ্ছন্নতা ‘শ্রমজীবী ভাইদের’ চিন্তা ও মননে গ্রথিত করেছেন।

২. 'আমাদের প্রজাহিতৈষী গবর্নমেন্ট প্রজাদিগের অবস্থা ভাল করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন। এখানেও শশিপদ পরাধীন দেশে বিদেশি ব্রিটিশ শাসনকে শংসাপত্র দিয়ে প্রজাহিতৈষী সরকার আখ্যা দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠিত করে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামে উৎসাহ দিতে নারাজ, তা এখানে পরিস্ফুট। শশিপদর শিক্ষা চিন্তা বা সামাজিক পেছনে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল।[১০২]

৩. শশিপদ আফগানিস্তানে ব্রিটিশ অভিযান, ইংরেজের সাফল্য এবং সেখানে ইংরেজদের অনুগত একজনকে রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসাবার ব্রিটিশ অভিপ্রায়কে সমর্থন করে নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন তার পত্রিকায়। এখানেও আফগানিস্তানে ব্রিটিশ আগ্রাসনকে তিনি যথার্থ্যদান করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি রাজা-প্রজা-ধনী-দরিদ্র-মূর্খ-মানী সবাইকেই 'সমান' হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১০৩] এবং এঁদের সবাইকেই 'এক ঈশ্বরের সন্তান' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং কোনরকম শ্রেণিবিরোধের বিপরীতে শ্রেণিসমন্বয়ের শিক্ষার প্রচার করেছেন তাঁর প্রিয় শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে।

৪. তিনি গরিবের সন্তানদের ‘পরিশ্রমের বলে’ বড়লোক হওয়ার গল্প শুনিয়েছেন এবং বলেছেন... ‘তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত দুঃখে দিন কাটাইতেছ তাহারাও যত্ন করিলে বড়লোক হইতে পার’।[১০৪] –এভাবে তিনি গরিব জনসাধারণকে চেষ্টার মাধ্যমে বড়লোক হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। পরাধীন দেশে গরিবি হটানো তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনরকম লড়াইয়ের শিক্ষা তিনি দেননি।

৫. শশিপদ শ্রমজীবী মানুষদের লেখাপড়া শেখানো এবং 'সৎস্বভাব' বিশিষ্ট করে তোলার প্রক্রিয়ায় তাঁদের ‘সম্পূর্ণরূপে ভদ্রলোক’ বানাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় শ্রমজীবীরা নৌকাপথে ভ্রমণ করে, গঙ্গার তীর ধরে পতাকা উড়িয়ে সুমধুর গান গেয়ে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে যাবে, তাদের গান শুনে ‘চারিদিকের লোক’ তাদের প্রশংসা করবে; এইসব শ্রমজীবীরা ‘ঈশ্বরের উপাসনা’ করবে।[১০৫] ব্রাহ্মনেতাদের উপদেশ শুনে ‘অত্যন্ত’ সন্তুষ্ট হবে – এসবই ছিল শশিপদর আকাঙ্খা। শশিপদ চেয়েছিলেন দেশের শ্রমজীবীরা স্থিতাবস্থা বজায় রেখে ভদ্রলোক হয়ে উঠুক। বিদেশি শাসনমুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যাকার বিষয় নিয়ে তারা যেন না ভাবে।

৬. একদিকে যেমন মানুষ রাম, যুধিষ্ঠির, চৈতন্য এইসকল মহাত্মাদিগের নাম লইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতেছে, অন্যদিকে লোকে সিরাজউদ্দৌলার নাম লইতে ভয়ে কম্পিত হয়। তাহার নাম স্মরণ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অহঙ্কার, তাহার নিষ্ঠুরতার কথা মনে হয়, এবং আজিও লোকে তাহাকে গালি দিয়া থাকে। এমনকি একজন নিষ্ঠুর, অসচ্চরিত্র, অত্যাচারী লোককে গালি দিতে হইলে লোকে বলিয়া থাকে যেন নবাব সিরাউদ্দৌলা। বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া সিরাজ সম্পর্কে ব্রিটিশ-পোষিত এই বক্তব্য প্রচার করে এদেশে বিদেশি শাসনের পক্ষে যুক্তি হাজির করতে চেয়েছেন শশিপদ।[১০৬]

৭. শশিপদ দেখিয়েছেন, 'সুখ ধর্মের, সুখ পবিত্রতার, সুখ পূণ্যে, সুখ দায়দাক্ষিণ্যে।” – স্বাধীনতার সুখ তাঁর চর্চিত বিষয় ছিল না। শ্রমজীবীদের শৃঙ্খলমোচনের স্বপ্নজনিত সুখ তাঁর বিবেচ্য বিষয় বলে গণ্য হয়নি।[১০৭]

শশিপদ তাঁর 'ভারত শ্রমজীবী' শীর্ষক পত্রিকার মাধ্যমে এই ধরনের বক্তব্য তথা শিক্ষা হাজির করতেন। তিনি এই পত্রিকাটি কেন প্রকাশ করেছেন, তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছেন...

"তোমরা যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে পার,
তোমাদের চক্রের জল যাহাতে দূর হয় সেই জন্যই
আমরা এই কাগজখানা প্রকাশ করিয়াছি। -----
তোমরা পাঠ করিয়া উপকার লাভ কর ইহাই
আমাদের নিবেদন"।[১০৮]

স্বভাবতই বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা এবং শশিপদর এহেন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধেয় পরিসর থেকেই যায়। আর একারণেই দেখা গিয়েছে যে, শশিপদ ভারতসভা বা রায়তসভার আন্দোলন কর্মসূচিতে বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত থেকেছেন। শশিপদ এদেশে ব্রিটিশ শাসন অবসানের সপক্ষ মানসিকতাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। তাঁর চিন্তা-মনন-কর্ম অনুশীলনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মোহান্ধতা অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে কোনরকম অমিত্র সুলভ আচরণে তিনি কখন অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করেননি। বরং এই বিদেশি শাসনকে অব্যাহত রেখেই সমস্যার সমাধান-প্রয়াসী হয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বিধবা আশ্রম, মদ্যপান নিবারণী প্রয়াস প্রভৃতি বিষয়ে শশিপদর আন্তরিকতাকে প্রশ্নাতীত রাখা গেলেও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ না থাকলেও – একথা স্বীকার করতেই হবে যে শশিপদ বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের নিরিখেই।[১০৯]

তাঁর দুই বিধবা ভাইঝি ও বোনকে শশিপদ আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁদের বিবাহ দিয়েছেন। এর পরিণতিতে তিনি বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। গোঁড়া হিন্দু বন্ধুদের দুর্নীতি ও ভন্ডামির বিরুদ্ধাচরণ করে জেল খেটেছেন, পাঁচশ টাকা জরিমানা পর্যন্ত দিয়েছেন।

এহেন শশিপদ তাঁর সামাজিক সংস্কার আন্দোলনকে বন্ধনবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে পারেননি। শ্রমজীবীদের নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করলেও তাঁদের শ্রম ও তার মূল্য সম্পর্কে শিক্ষিত করার প্রয়াস তিনি পাননি। তাঁদের সংগঠন গড়ে তুলে কোন লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচির চিন্তাভাবনা করেননি। শশিপদ আন্তরিকভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন নিপীড়িত নির্যাতিত ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নয়, তাঁর আন্তরিক দায়বদ্ধতা ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেনির প্রতিই। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের নীল আন্দোলনের সূত্র ধরে ব্রিটিশ শাসনকে অব্যাহত রেখে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের যে নতুন ধারা মধ্যবিত্ত শ্রেনির নেতৃত্বে উঠে এসেছিল – শশিপদ, বাস্তবিক, সেই ধারার অনুবর্তী থেকেছেন।[১১০] বিদেশি শাসন কায়েম রেখে সংস্কারের মাধ্যমে কিছু সামাজিক সমস্যার একটা আপাত-নিরীহ সমাধানের যে নতুন রাজনীতি উনিশ শতকের ষাটের দশকের পর থেকে দৃশ্যমান হচ্ছিল, শশিপদ সেই ধারায় তাঁর দর্শন-মনন-চিন্তা-অনুশীলনকে একসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত আচ্ছন্নতা, বিদেশি শাসনের প্রতি মোহান্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে শশিপদর সীমাবদ্ধতা প্রকট রূপে চিহ্নিত হলেও, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা আশ্রম, শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে ভাবনা এবং সর্বোপরি শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর চিন্তাচর্চা এবং তার আন্তরিক অনুশীলনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতেই হবে। কাদম্বিনী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র দৈনিক ভারত' পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র লিখেছেন...

"শশিপদবাবু নারীকল্যাণ যজ্ঞে আপনাকে
নিয়োজিত রাখিয়া বাংলার নারী আন্দোলনের
একজন বন্দনীয় নেতারূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত
করিয়া গিয়াছেন"।[১১১]

তথ্যসূত্র:

১. K. C. De, N.N Law et all. 'Report of the Bengal provincial Banking Enquiry Committee 1929-30', Bengal Government Press, Calcutta – 1930, p. 178

২. D. H Buchanan. 'The Development of Capitalistic Enterprise in India', Augustus M. Kelley Publishers, August 26th 1966, p.119

৩. তদেব, পৃষ্ঠা. 153

৪. Bipan Chandra, 'The Indian Capitalist Class and British Imperialism' In R.S Sharma (ed.) Indian Society: Historical Probing, p. 391

৫. তদেব পৃষ্ঠা – ৩৯২

৬. আব্দুল সামেদ মিঞা।

৭. আবেদ আলি মিঞা।

৮. তদেব পৃষ্ঠা.

৯. Bipan Chandra. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩

১০. তদেব পৃষ্ঠা. ৪০৪

১১. Omkar Goswami. 'The Jute Economy of Bengal 1900 – 1947: A Study of interaction between the industrial, trading and agricultural sector, University of Oxford, 1982

১২. তদেব পৃষ্ঠা. ১৪৮

১৩. Omkar, Goswami. Collaboration and Conflict: European and Indian Capitalists and the Jute Economy of Bengal, 1919-39, . IESHER XIX (2), 141, 1982.

১৪. অজিত নারায়ণ বসু। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৮

১৫. তদেব পৃষ্ঠা. ১০৭

১৬. তদেব পৃষ্ঠা. ১৫৭

১৭. তদেব পৃষ্ঠা. ১৬০

১৮. তদেব পৃষ্ঠা. ২১৪

১৯. তদেব পৃষ্ঠা. ২১৫

২০. তদেব পৃষ্ঠা. ২১৬

২১. তদেব পৃষ্ঠা. ২১৭

২২. তদেব পৃষ্ঠা. ২৩৫

২৩. John Maynard Keynes, 'The General Theory of Employment Interest and Money' Volume-VII, Macmillan, Cambridge University Press for the Royal Economik Society. http://public.econ.duke.edu/~kdh9/Courses/Graduate%20Macro%20History/Readings/Keynes%20General%20Theory%20(excerpts).pdf

২৪. Paul Einzig, 'History of the Bank of England 1640 to 1903', Frank Cass & Co. Ltd. 1966,

file:///C:/Users/user/Downloads/10.4324_9780203041499_previewpdf.pdf

২৫. Rosa Luxembourg, 'L'accumulation du Capital Contribution a'l'explication e'conomique de l'imperialisme' 1913

২৬. Stiglitz, Joseph.E,. *Globalization and Its Discontents, .* New Delhi: Penguin Book India, 2003.

২৭. শ্রম মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০০০

২৮. Majumdar, R.C. The Mughul Empire, Bharatiya vidya Bhavan, p-5, 2007 Mumbai.

২৯. তদেব পৃষ্ঠা – ৬

৩০. তদেব পৃষ্ঠা – ১৭

৩১. তদেব পৃষ্ঠা - ২৯

৩২. Chakrabarti S. K. Carbon credit of jute; Indian Industries Research Assocition, May 6, 2010, Kolkata.

৩৩. তদেব পৃষ্ঠা – ১১৮

৩৪. তদেব পৃষ্ঠা – ১৬৭

৩৫. তদেব পৃষ্ঠা –১৭২

৩৬. সেন, সুকোমল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০০০), এন. বি. এ., কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭. বাগচী, অমিয়কুমার। ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন (১৯০০-১৯৩৯), কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭.

৩৭. তদেব পৃষ্ঠা – ৫৬

৩৮. তদেব পৃষ্ঠা –৫৭

৩৯. তদেব পৃষ্ঠা –৬৭

৪০. তদেব পৃষ্ঠা –৭৮

৪১. দাস, অমল। ভারতের ইতিহাসের নিম্নবর্গের নারী শ্রমিকঃ এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক, গ্রন্থমিত্র, এপ্রিল ২০১৩, কলকাতা.

৪২. দাস, অমল। 'সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১।

৪৩. বসু, নির্বাণ। 'বাংলার চটকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট (১৯৩৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৪৪. কলকাতা, ১৯৮৮।

৪৫. তদেব পৃষ্ঠা – ৩৪

৪৬. তদেব পৃষ্ঠা – ১৫৬

৪৭. তদেব পৃষ্ঠা –১৫৭

৪৮. তদেব পৃষ্ঠা – ১৮৭

৫০. বসু, চন্দন। 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্প আর্থনীতি (১৯৪৭-১৯৭০)- একটি পর্যালোচনা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১

৫১. Chakraborty, Dipesh. Rethingking Working Class History : Bengal 1890-1940. Kolkata, 1989.

৫২. Dasgupta, Ranajit. Labour and Working Class in Eastern India Studies in Colonial History. Kolkata, 1994.

৫৩. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৩

৫৪. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৪

৫৫. তদেব পৃষ্ঠা – ১২৭

৫৬. Ghosh, Parimal. Communalism and Colonial : Experience of Calcutta Jute Mill Workers 1880-1930, Kolkata, 1990.

সংবাদপত্র ও সাময়িকী

৫৭. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা – ৬

৫৮. Hindusthan Standard

৫৯. The Statesman

৬০. Census of India 1951, District Handbook, 24 Parganas, A. Mitra, Writer's Building, Kolkata.

৬১. Labour in West Bengal 1967, Department of Labour, Gov. of West Bengal Writer's Building, Kolkata, Chapter-XIII, p.143

৬২. রায়, স্বপনকুমার। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারি উদ্যোগ, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৬।

৬৩. চক্রবর্তী, প্রণবেশ। শ্রমিকের নয়, নিজের স্বার্থে শ্রমিক নেতারা 'বিপ্লবী'; দৈনিক বসুমতি, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৫, ন্যাশনাল লাইবেরি, কলকাতা।

৬৪. কর, সুমিত। বিশ্বায়ন, আধুনিকতা ও পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতা, ২০১২।

৬৫. ঘোষ, অলক। ভারতীয় অর্থনীতি। কলকাতা, ১৯৭৩।

৬৬. ঘোষ, শিবদাস। শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। কলকাতা, ২০১২।

৬৭. চক্রবর্তী, মধুসূদন। অর্থনীতির প্রথম পাঠ। কলকাতা, ২০১২।

৬৮. ভট্টাচার্য, হরশঙ্কর। ভারতের অর্থনীতি। কলকাতা।

৬৯. তদেব পৃষ্ঠা – ৪৬

৭০. তদেব পৃষ্ঠা – ৪৭

৭১. শিকদার, শুভেন্দু। 'চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯। কলকাতা -২০০৫।

৭২. International Jute Study Group: Carbon Credit of jute and Sustainable Environment; 1, issue 7, June, 2013.

৭৩. Singh L K P: Raw Material Base of Jute Industry in India.

৭৪. Worldjute.Com

৭৫. texmin.nic.in

৭৬. website of jute Corporation of India.

৭৭. website of Office of the Jute Commissioner.

৭৮. পাট চাষ, জুট শিল্প ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন প্রস্তুতি কমিটি'–র প্রতিবেদন, ২০০৯।

৭৯. Benoy Ghosh: Editorial: Selections from English periodicals of Nineteenth Century Bengal. Vol... VII. Papyrus, Calcutta – 1978 Edn. P- XII-XIII.

৮০. Shibnath Sastri: History of the Brahma Samaj. Sadharan Brahma Samaj. Calcutta – 1993 Edn. P- 15.

৮১. Shibnath Sastri: Ibid. p- 95-96.

৮২. তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৬

৮৩. তদেব, পৃষ্ঠা. ১০১-১১১

৮৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ১১৩

৮৫. Kanailal Chattopadhyay: Brahmo Reforms Movement some social and Economic Aspects. Papyrus. Calcutta – 1983 Edn. P-99

৮৬. Shibnath Sastri: Ibid. p-26.

৮৭. Sir Albion Rajkumar Banerjee: An Indian Pathfinder Memoirs of Sevabrata Sasipada Banerjee. The Devalay Trust. Kolkata-1971 Edn. P – 84-85

৮৮. Kanailal Chattopadhyay: Ibid. P – 87

৮৯. তদেব, পৃষ্ঠা. ৯০-৯১

৯০. তদেব, পৃষ্ঠা. ১০৪

৯১. তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৯

৯৩. Sitanath Tattvabhusan: Social Reform in Bengal. Papyrus. Calcutta – 1982 Edn. P-65

৯৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৪ – ২৫

৯৫. 'ভারত শ্রমজীবী' প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। কবিতাটির সম্পূর্ন পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'ভারত শ্রমজীবী' (প্রাগুক্ত) এর পরিশিষ্ট। পৃষ্ঠা. ১৬০

৯৬. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৬১

৯৭. ভারত শ্রমজীবী। ৬ষ্ঠ খন্ড। পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ। নবম সংখ্যা।

৯৮. তদেব, পৃষ্ঠা.

৯৯. সঞ্জীবনী, ২৬ চৈত্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

১০০. তদেব, পৃষ্ঠা. ১০৭

১০১. তদেব, পৃষ্ঠা. ১১১

১০২. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫৮

১০৩. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৪২

১০৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৭৭

১০৫. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৮১

১০৬. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৮২

১০৭. তদেব, পৃষ্ঠা. ৬৩

১০৮. প্রাগুক্ত। ৬ষ্ঠ খন্ড, পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ ৯ম সংখ্যা।

১০৯. প্রাগুক্ত। ৬ষ্ঠ খন্ড, মাঘ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ ১০শ সংখ্যা।

১১০. প্রাগুক্ত। ৬ষ্ঠ খন্ড, অগ্রহায়ণ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ ৮ম সংখ্যা।

১১১. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'বাংলার নারী জাগরণ'। সাধারণ ব্রহ্মসমাজ। কলকাতা – ১৯৯৭। পৃষ্ঠা. ৯৫

পঞ্চম অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন

হস্তশিল্প ও প্যাকেজিং ক্ষেত্রে পাটশিল্প ও উৎপাদিত পাট বরাবরই একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আগামী দিনেও অন্যতম নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই শিল্প যদি তার পরিচালন পদ্ধতির দুর্বলতাগুলিকে দূর করা যায় ও নানা ভাবে তৈরি হওয়া ও করা কৃত্রিম বাজারের সঙ্কটকে দূরীভূত করে তাকে তার পুরনো মহিমায় ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায়। এই প্রতিবেদনে আগেও বলা হয়েছে যে পাটের চাষ প্রত্যক্ষ ভাবে ৪০ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারকে আয়ের সাথে যুক্ত করে এবং প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিককে কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়। এর বাইরে আরও প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে পাটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুসারী শিল্পে নিযুক্ত করে। এই সুবিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বোঝা সম্ভব যে পশ্চিমবাংলায় পাট চাষ ও পাটশিল্পের সামগ্রিক গুরুত্ব কী পরিমাণে নিহিত আছে।

প্লাস্টিক ও অন্য স্বল্প মূল্যের ও মানের পণ্যের সাথে যে তীব্র প্রতিযোগিতা বিগত দশকগুলিতে পাটশিল্পকে করতে হয়েছে, তার ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে এই শিল্প বেশ কিছুটা পিছু হটেছে। যদিও বর্তমানে গোটা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ আন্দোলন ও প্রকৃতি ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক সচেতনতার বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ বান্ধব শিল্প হিসাবে নবরূপে জুটশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বহু উত্থান পতনের সাক্ষী হলেও এই সোনালি তন্তু আজও তার পুরনো মর্যাদা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন এক একর জমিতে পাটচাষ প্রায় ৬ মেট্রিকটন

কার্বনডাই অক্সাইড ধারণ করে এবং ৪.৪ মেট্রিকটন অক্সিজেন নির্গমন করে তার বৃদ্ধি ও বিকাশের ১২০ দিনের মধ্যেই; অন্য যে কোন গাছের থেকে যা বহুগুণ বেশি।

৭০ এবং ৮০ -র দশকে যখন প্লাস্টিক কার্ড বোর্ড ইত্যাদি বিকল্প প্যাকেজিং মেটেরিয়াল হিসাবে তার নিম্নমূল্যের কারণে জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং দেশের প্লাস্টিক লবি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে ঠিক তখন থেকেই জুটশিল্পের ক্রমাবনতির পর্যায় শুরু হয়। বর্তমানে যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন যে খাদ্যশস্যের প্যাকেজিং মেটেরিয়ালের ৯০% জুটকে কেন্দ্র করে হতে হবে; চিনির প্যাকেজিং এর ১০% পাটজাত ব্যাগের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।এই পর্যায়েই বহু রাজ্য সরকার প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করায় জুটশিল্প বিকাশের সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে।

ফল স্বরূপ পাট চাষের ক্ষেত্রেও গতি এসেছে। বিগত ৩০ বছরের পাট চাষের উত্থান পতনের সামগ্রিক রেখাচিত্রটি নীচে দেওয়া হল:

সারণী **:-** ৫.১ : পাটের রাজ্য ভিত্তিক প্রতি ৫ বছরের উৎপাদন

State	1970-71 to 1974-75		1975-76 to 1979-80		1980-81 to 1984-85		1984-85 to 1989-90	
	Area	Crop	Area	Crop	Area	Crop	Area	Crop
West Bengal	2024.2	15145.6	2295.7	17526.7	2553.4	21008.9	2515	25512
Tripura	293	262.9	134	104.2	17.8	1274	15	112
Assam	690.2	5144.4	5296	1755.8	551.4	4500	516	4478
Bihar	653.2	331.6	698.2	38116	674	4103	345	5843
Orissa	241.3	1063.5	227.8	1874	224.2	1726.4	180	2102
U.P	543.1	227.8	388.6	40.4	381.7	21	210	2229
Meghalaya	-	-	-	-	-	-	-	-

Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India

পাট চাষের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে ওঠাপড়া তা মোটামুটি ভাবে তিনটি কারণের উপর নির্ভরশীল...

- বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টিপাতের অনুপাত ও বৃষ্টির হারের মধ্যে পার্থক্য
- অঞ্চলভেদে পাটের চাহিদা পার্থক্য
- পাট চাষের সময়ে অন্য চাষের তুলনায় পাটের দামের ওঠা পড়া

যদি আমরা পাট চাষের উৎপাদনের অন্যতম রাজ্যগুলি যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ার দিকে তাকাই তবে এই ওঠাপড়ার চিত্রটি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। নিম্নের (পরিশিষ্টঃ) রেখাচিত্রটি যা প্রতিফলিত করে।

এই চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৯৯৫-৯৬ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন যেখানে ছিল ১৪.৩৩ লক্ষ টন তা ১৯৯৭-৯৮ সালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েই হয় ১৬.৭৮ লক্ষ টন; ২০০৬-০৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৩.৫৬ লক্ষ টন, ২০০৭-০৮ সালে উৎপাদন হয় ১৭.৫৬ লক্ষ টন, যে বৃদ্ধি পরবর্তীকালে হ্রাস পায় এবং ২০১৫-১৬ সালে রেকর্ড অনুযায়ী পাটজাত দ্রব্যের সামগ্রিক উৎপাদন ছিল ১২.১৭ লক্ষ টন। দেশীয় বাজারে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহারের সামগ্রিক চিত্রটি নিচে (পরিশিষ্টঃ) দেওয়া হল।

সারণী :- ৫.২ : **পাটের রাজ্য ভিত্তিক উৎপাদন**

00/ লাখ বেল

(A=Area IN '000 Hect; P=Prod. In '000 Bales Of 180 K.G Per Bales; PY=Productivity In QTLS/Hect												
April/Mach	**2000-2001**			**2001-2002**				**2002-2003**			**2003-2004**	
	A	**P**	**PY**	**A**	**P**	**PY**	**A**	**P**	**PY**	**A**	**P**	**PY**
State												
Assam	82	1000	22	86	100	21	90	100	20	72	800	20
Meghalaya	7	50	12.8	6	3	12	7	50	13	6	40	13
West Bengal	617	7200	21	518	604	21	552	7720	21	546	6370	21
Bihar	108	1100	18	108	95	16	120	1200	18	90	900	18
Orissa	24	250	18	22	21	17	35	250	18	2	200	18
Andhra Pradesh	82	650	14	72	56	14	82	640	14	71	550	14
Tripura	3	3	18	4	2	16	4	40	18	4	40	18
Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uttar pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Others	63	220	6.28	57	19	6	30	100	6.28	30	100	6.28
Total	986	10473	130.08	873	900	123	920	10100	128.28	821	9000	128.28

Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India

এই চিত্রটি থেকে পরিষ্কার যে ১৯৯৬-৯৭ সালে পাটজাত দ্রব্যের সামগ্রিক ব্যবহার যেখানে ছিল ১৩.৩৬ লক্ষ টন; ২০১৫-১৬ সাল নাগাদ তা কমে দাঁড়ায় ১১.৪৩ লক্ষ টন।

একই সাথে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির চিত্রটি নিম্নে রাখা হল। ১৯৯৬-৯৭ সালের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যেখানে ৫৭২.২৩ কোটি টাকা, তা ২০১৩-১৪ সাল নাগাদ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে হয় ১৮৮০.৬৩ কোটি টাকা, যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে যদিও পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পরিমাণ ধারাবাহিক ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে। উন্নত দেশগুলির পরিবেশ সচেতনতা এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করে প্রাকৃতিক তন্তু

হিসাবে পাটকে বেছে নেওয়া এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।আমাদের দেশে নাগরিক ও জনসচেতনতার নিম্নমান এর ঠিক বিপরীত যাত্রার জন্যে দায়ী।

মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সারা দেশ জুড়ে ৭৭ টি জুটমিল অবস্থিত। এর মধ্যে ৬০ টি পশ্চিমবঙ্গে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭ টি, বিহার ৩ টি, উত্তরপ্রদেশ ৩ টি, আসাম ১ টি, ওড়িষা ১ টি, ছত্রিশগড় ১ টি, ত্রিপুরায় ১ টি অবস্থিত। এছাড়া সম্পূর্ণ ভাবে রপ্তানিকেন্দ্রিক ৮ টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বা উৎপাদনক্ষেত্র রয়েছে যা বিভিন্ন প্রকারের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করে। ২০০৬ সালে 'Jute Manufacture Development Counsil' (JMDC) কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী এই ধরণের ইউনিটের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে এই প্রকারের ইউনিট সংখ্যা যেখানে ছিল ৬৭৩ টি। ২০০৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩২০। অনেকে মনে করেন অভ্যন্তরীণ বাজারে গুণমানের কারণই পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে ৫০ টি জুটমিলকে নিয়ে 'Indian Jute Industry Research Association' যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তার ফলে তারা নিম্নলিখিত ফলাফল সামনে রাখে:-

- জুটমিলের কার্যকরী ক্ষমতার প্রায় ৯০% ব্যবহারযোগ্যতা আছে মাত্র ৩৩টি মিলের
- ৮০% থেকে ৯০% ব্যবহারযোগ্যতা আছে ১৪টি মিলের
- ৭০% থেকে ৮০% ব্যবহারযোগ্যতা আছে ২টি মিলের
- এবং ৭০% এর কম ব্যবহারযোগ্যতা আছে ১ টি মিলের

এর সাথে IJRA যখন মিলগুলির মেশিনের ও যন্ত্রপাতির তৎকালীন অবস্থা নিয়ে সমীক্ষা করে, তা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেশিনের ব্যবহার

যোগ্যতা ছিল ৫০% এর কম। এর কারণ হিশাবে IJRA কতগুলো বিষয়কে চিহ্নিত করেঃ-

- যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বল অবস্থা
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরনো মেশিন ও যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার করা
- অদক্ষ ও অর্ধ প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী দিয়ে কারখানা চালানো
- সঠিক পরিকল্পনার দুর্বলতা ও নিম্নমান এবং মিল প্রশাসনের অদূরদর্শিতা

আলোচ্য এই সকল কারণগুলি যেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রটির অবনমনের জন্য দায়ী; অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে সেখানে পরিচালনা ও উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

পাটশিল্পের একটি সম্ভ্রান্ত ভবিষ্যৎ আছে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে। একদিকে যেমন পরিবেশ বান্ধব শিল্প হিসাবে এর চাহিদা লক্ষ্যণীয় তেমনই প্রতিযোগী সিন্থেটিক ও প্লাস্টিকের তুলনায় এর মূল্যমান বেশী। উৎপাদনী খরচ কমিয়ে পাটশিল্পকে প্রতিযোগিতার প্রথম সারিতে নিয়ে আসার দায় তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উপরই বর্তায়। এর জন্য প্রথমতঃ যা প্রয়োজন তা হল কম জলে উচ্চমাত্রার উৎপাদনী ক্ষমতা সম্পন্ন পাটের চাষ। দ্বিতীয়তঃ জুটশিল্পে আধুনিক ও কার্যকরী যন্ত্রপাতির ব্যবহার যা পাটের উৎপাদন ও গুণমানকে বাড়াতে সক্ষম ও বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় তাঁর নিজস্ব স্থান করে নেওয়ার জন্যে কার্যকরী। তৃতীয়তঃ পরিচালনা সংক্রান্ত/ লিজ সংক্রান্ত যে জটিলতা জুটমিলের কার্যক্ষমতাকে ভঙ্গুর করে তুলেছে প্রতিনিয়ত সঠিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শ্রম সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হওয়া সেই জটিলতাগুলির সমাধান। চতুর্থঃ জুটশিল্প যাতে ব্যাংক ও অন্য আর্থিক সংস্থাগুলির থেকে অত্যন্ত কম সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারে তার কার্যকরী ব্যবস্থা এবং একই সাথে সরকারি ভর্তুকি যাতে

উপযুক্ত লক্ষ্যে সুনিয়োজিত হয় তার তদারকি করা। পঞ্চমতঃ এক বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত শ্রমিক যাতে জুটশিল্পের প্রধান অংশ হিসাবে কাজ করেন তা সুনিয়ন্ত্রিত করা। ষষ্ঠতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নতুন নতুন পণ্য যাতে পাটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা সুনিয়ন্ত্রিত করা। সপ্তমতঃ মিল কর্তৃপক্ষ ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসাবে পাটের গুরুত্ব যে অপরিসীম যা ধারাবাহিক ভাবে প্রচার করা এবং সিন্থেটিক ও প্লাস্টিক দ্রব্যের পরিবর্তে যাতে সাধারণ মানুষ পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহারে সচেষ্ট হন তার জন্য যথার্থ জনসচেতনতা গড়ে তোলা। অষ্টমতঃ পাটকে কেন্দ্র করে শ্রমদপ্তরে আসা যে কোনো বিতর্কের দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানো।

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রটি যে হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করে সেই জেলায় জুটমিলের বিকাশের একটি অন্যতম বড় কারণ পশ্চিমবাংলার জনঘনত্ব এবং পার্শ্ববর্তী বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যা থেকে আগত শ্রমিকদের উপস্থিতি। দেশভাগ পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আসা এক বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা ভিড় জমিয়েছিল জুটমিলে এক নিশ্চিত কর্মসংস্থানের তাগিদে। এছাড়া অশিক্ষা দারিদ্র কৃষিজমির উপর চাপ জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং চাকরীর অন্যান্য সুযোগ কম থাকায় নিশ্চিত ভাবে অন্য সমস্ত জেলার মতো এই জেলাও পাট শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

হুগলী জেলার সামগ্রিক জনসংখ্যা ২০০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৫১৯১৪৫ জন। এই একই সেন্সাস অনুযায়ী জেলার শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ২১৫২৮৭০ জন যা সামগ্রিক জেলার জনসংখ্যার ৩৯%। অবশিষ্ট ৬০.৯৯% মূলত অ-শ্রমজীবী।সামগ্রিক শ্রমসংখ্যার ১২.০৬% কৃষিজীবী, ২৭.১০% কৃষি মজুর, ৫.১৯% স্বনিযুক্ত শিল্প এবং বাকি ৫৫.৬৫% অন্য শিল্প সংস্থার সাথে যুক্ত। সমীক্ষায় প্রমাণিত

হয়েছে জুট শ্রমিকের প্রায় ৫০% OBC জনজাতির; ৩৪.৭৮% জেনারেল কাস্ট; SC ১৩.০৫%, এবং ২.১৭% হল ST সম্প্রদায়ের মানুষ। OBC অংশের মধ্যে ৩/৪ অংশ মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত।

সামগ্রিক জুটশ্রমিকের ৬৪.৭৯% মূলত বাইরে থেকে আসা যাদের শিকড় রয়েছে অন্য রাজ্যের মাটিতে। হুগলী জেলার স্থানীয় শ্রমিক যারা পাট শিল্পে নিযুক্ত সেই অনুপাতটি হল ৩৫.২১% শতাংশ।

হুগলী জেলার সামগ্রিক জুট শ্রমশক্তির ২৫.৬৫% দক্ষ শ্রমিক ৬৩.০৫% অর্ধপ্রশিক্ষিত এবং ১১.৩০% অদক্ষ শ্রমিক। হুগলী জেলার পাট শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমশক্তির ০.৮৫% রোজগার মাসিক ৫০০০টাকা, ১৭.৮৫% রোজগার মাসিক ৫০০০-৭০০০টাকা, ৪০.৪৫% শ্রমিকের রোজগার ৭০০০-৯০০০টাকা এবং ৩২.৬০% শ্রমিকের রোজগার ৯০০০-১১০০০টাকা। ১১০০০-১৩০০০ হাজার টাকা এবং ১৩০০০ হাজারের বেশি রোজগার করে মূলত ৬.৯৫% এবং ১.৩০% শতাংশ।

এই জেলার মিল এলাকার প্রায় ৬২% শ্রমিক কোম্পানির দেওয়া কুলি লাইনের কোয়ার্টারে বাস করেন। ২২% এর নিজস্ব বাড়ী আছে এবং ১৬% অন্যের ভাড়া বাড়ীতে মূলত থাকেন। এই বাড়ী গুলির মধ্যে প্রায় ৫৬% পাকা বাড়ী এবং ৪৪% কাঁচা বাড়ী হলেও উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিম্নমানের পরিবেশের মধ্যে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। মিল এলাকায় এই বাড়ীগুলির মধ্যে ৬৬% প্রত্যক্ষ পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে, যে সুবিধা তাঁরা মূলত মিল কর্তৃপক্ষের থেকে পেয়ে থাকেন, ২২% এর নিজস্ব পানীয় জলের পরিকাঠামো রয়েছে এবং ১২% মূলত সাধারনের জন্য যে সরকারী পানীয় জলের ব্যবস্থা তার থেকেই মূলত জল সংগ্রহ করে থাকেন।

চিত্র - ৫

শ্রমিকদের বসতি এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা

এই এলাকায় শৌচের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই মিল এলাকার বেশীর ভাগ শ্রমিক সাধারণত জীবন ধারণ করে থাকেন। প্রায় ৭০% পাট শ্রমিক সাধারণত গণ শৌচালয় যা কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত তাই ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া মিল এলাকায় শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের অন্তর্গত "সুলভ শৌচালয়"কে সাধারণত গড়ে তোলার রেওয়াজ রয়েছে।

চিত্র - ৬

শ্রমিক বসতির সার্বোজনিন শৌচালয়

যে ধরণের শ্রমের মধ্যে দিয়ে জুটমিল শ্রমিককে সাধারণত যেতে হয় এবং ভারী মেশিনপত্র ও মাল ওঠা নামার যে ধরণের কাজ সাধারণত জুটমিলে থাকে এতে প্রায় অর্ধেক পাটকল শ্রমিকই পিঠের সাধারণ ব্যথা ও আর্থারাইটিস জাতীয় সমস্যার ভুক্তভোগী। এছাড়া পাটের ডাস্ট অন্যান্য ধুলো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফুসফুস, চর্মজনিত রোগ ও অন্যান্য শ্বাস প্রশ্বাসের দুর্বলতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাবকে সুগম করে। অপুষ্টিজনিত সমস্যা মহিলা ও শিশুদের নিত্যসঙ্গী। অস্বাস্থ্যকর শৌচের পরিবেশ ডাইরিয়াকে নিত্যসঙ্গী করে তোলে। যদিও সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্যণীয় বিষয় COVID-19 মহামারীতে যখন গোটা দেশ আক্রান্ত তখন অন্য শ্রমজীবী এলাকার মতোই হুগলী শিল্পাঞ্চলের পাট শ্রমিকেদের মধ্যে COVID-19 এর সংক্রমণ অস্বাভাবিক রূপে কম থেকেছে।

পাটশ্রমিকদের দারিদ্রের ইতিহাস পাটশিল্পের মতোই সুপ্রাচীন। যার বহু সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে জুটমিল এলাকা ও কারখানার শ্রমসম্পর্কের মধ্যে। সংক্ষেপে এগুলিকে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হল।

প্রথমতঃ কম মজুরী। এটি সেই কারণ যা জুট শ্রমিককে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে আজও আবদ্ধ করে রেখেছে। সময়ের সাথে সাথে তার কিছু পরিবর্তন হলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নিরিখে ও সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের নিরিখে যদি এই মজুরিকে বিচার করা হয় তবে তা মুষ্টিভিক্ষা মাত্র। নিম্নমানের মজুরী এবং কাজের অনিশ্চয়তাই হল দারিদ্রের সূতিকাগৃহ। বর্তমানে পাটকলে কোন ধরণের চাকুরি স্থায়ী নয়। বৃহদাংশ শ্রমিক মাসিক ৫০০০-৭০০০ টাকার মধ্যেই রোজগার করে থাকেন। বদলী শ্রমিকের মজুরী ২৭৫-৩৪৫ টাকা। কাজের নতুন সুযোগ সব ক্ষেত্রে অস্থায়ী চরিত্রের এবং এই ভাসমান অস্থায়ী শ্রমিক দিন প্রতি ২৫৬ টাকা রোজগার করে থাকেন। পাটকলের ২/৫ অংশ শ্রমিক এই বদলী এবং 'যুগাড়' চরিত্রে উপার্জন করেন।

শিক্ষাগত পরিকাঠামো খুবই অপ্রতুল এবং যদিও সাক্ষর নিরক্ষরের হার ৬০%-৪০%। উচ্চপ্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ধারাবাহিকতা রাখা কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়। জুট শ্রমিকের পরিযায়ী চরিত্র একদিকে যেমন মিলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে আবার এই পরিযায়ী চরিত্রের কারণে তাঁদের দরকষাকষির ক্ষমতা কম থেকেছে ও স্থায়ী শ্রমিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করার যে সুযোগ তাও থেকেছে দুর্বল। বহু ক্ষেত্রে এই পরিযায়ী স্বভাব ও স্থানীয় পরিচিতি সত্বার মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেছে এবং জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব কি ভাবে সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাতিয়ার হয়েছে তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

শ্রমিকের রাজনৈতিক সত্বার অন্যতম পরিচিতি হল তার সংগঠন বা ইউনিয়ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে প্রত্যেকটি জুটমিলে অসংখ্য ইউনিয়নের উপস্থিতি শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের যে সত্ত্বাকে ভঙ্গুর করে দেয় তা তার রাজনৈতিক সত্ত্বা। সে জন্যই বিগত বেশ কিছু দশক ধরে পাটকলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় হরতাল হোক বা শ্রমিক স্বার্থে সর্বভারতীয় ধর্মঘট প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসংগঠিত পাটশ্রমিকের আত্মিক উপস্থিতি প্রায় শূন্যের পর্যায়ে।

সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্যে তাই প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন। পরিচালনা সংক্রান্ত জটিলতা থেকে শুরু করে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের মান বাড়ানো এবং পাটচাষকে লাভজনক করে তোলার পাশাপাশি উপরিউক্ত আলোচনায় যে সকল সমস্যাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটির নিষ্ঠাবান সমাধানের উপরেই নির্ভরশীল পাটশিল্পের সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হওয়া। একাজে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনই জুটমিল কর্তৃপক্ষের আসু মুনাফা কেন্দ্রিক যে মনোভাব তার পরিবর্তন সাধন ও জুটশ্রমিকের সাংস্কৃতিক চৈতন্যের পরিবর্তন ও তার সংগঠনের বিকাশের সাথেও প্রশ্নটি জড়িত। সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী তাই সমাধানকেও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য রেখেই এগোনো জরুরী।

চটকল শ্রমিকের চৈতন্য ও তাঁর সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে ‘Rethingking Working Class History’ গ্রন্থে দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন.....

“Most observers of labor conditions in the jute industry agreed that there was an urgent need for working-class organization. Even the government of Bengal, which could hardly be suspected of prolabor sympathies, was moved to remark in 1929 that the industry

was ‘full of anomalies, which could never exist were there a properly organized jute workers’ union’. Besides, with the jute mills situated in close proximity to one another, the industry often seemed to provide an ideal basis for a strong trade union movement. The government described this labor force in 1933 as “perhaps the largest and the most compact group of workers with identical interests in the world”. The Bengal labor commissioner wrote in the same vein in 1935; “Nowhere in the world are there better territorial conditions for Labour organisation than round about Calcutta. The jute mills are concentrated in a narrow range of, say, 20 miles north and south of Calcutta..... (and) employ about 300,000 persons.”[১১৬]

Yet a striking feature of the history of the jute workers’ movement was the absence, relatively speaking, of strong and enduring trade unions. A government inquiry in 1945 revealed that only about 18 percent of the workers some 47,697 of a total of 267,193 –were members of unions. This was an uncertain estimate: “it is important to remember,”cautioned the author of the report, “that membership figures of Trade Unions are not always very reliable.” An important trade union leader was to sound an even more cautionary note a few years later. Speaking to a convention of

the All India Trade Union Congress (AITUC) held in Calcutta in 1952, Indrajit Gupta, the general secretary of the communist-dominated Bengal Chatkal Mazdoor Union, reminded his comrades of "the harsh reality that the overwhelming majority of them (the jute mill workers), perhaps 95%, (were) not organized in any trade union" at all. Both Gupta's conclusion and that drawn in the official report of 1946 were the same. "There is no doubt," the latter said, "that Trade Union in the jute mill industry.... is in an extremely weak condition." "No healthy tradition of trade unionism has yet developed among the jute workers" was the view put forward by Gupta".[১১৭]

১৮৮০ থেকে ১৯৪০-এর পর্যায়কে যেমন দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন তেমনই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের চিত্রটি তুলে ধরেছেন অধ্যাপক অজিত নারায়ণ বসু বস্তুনিষ্ঠ মুনশিয়ানায় শ্রমিক সংগঠনের দুর্বলতার কারণ গুলিকে উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রী বসু লিখেছেন...

১. প্রায় প্রতিটি কারখানায় যে কয়টি রাজনৈতিক দল আছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা 'শ্রমিক' ইউনিয়ন থাকা। ফলে, শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ নিজস্ব শ্রেণীসংগঠনের বদলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দ্বারা পরস্পর বিরোধী অনেকগুলি পার্টিনির্ভর শ্রমিকগোষ্ঠী সৃষ্টি হওয়া।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধুনিক বড় কারখানা এলাকায় এক এক জন মালিকের অধীনে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূতভাবে কয়েক শত থেকে

কয়েক হাজার শ্রমিকের উপস্থিতি যেমন তাদের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগঠন গড়ার বাস্তব বনিয়াদ সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করে পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী গঠনেরও সুযোগ সৃষ্টি করে।

২. সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের দিকে তাকিয়ে চলতি সমাজকাঠামো অর্থাৎ চলতি মালিকানা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের দিকে এগুনোই যে সব রাজনৈতিক দলের মূল কাজ হবার কথা, দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে ঐ সব লক্ষ্যের কথা ভুলে যাওয়া এবং অনেক সময় হয়তো অর্দ্ধচেতন ভাবে বাস্তবে সরকার নির্ভর হয়ে গিয়ে ঐ দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের বিরোধীতা করা। প্রায় সব কটি দলের ঘোষিত লক্ষ্যে এবং এমনকি আমাদের দেশের গঠনতন্ত্রে (Constitution) ও ঐ সব দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কথা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের কথা অন্তত আনুষ্ঠানিক ভাবে লিখিত আছে।

আশু স্বার্থের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের সংঘাত হলে আশু স্বার্থের ক্ষতি করেও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের লক্ষ্যে স্থির থাকার জন্য যে ধরণের শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন তার দুর্ভাগ্যজনক অভাবের জন্য আমরা এখনও 'বর্তমানকে দয়া দেখাতে গিয়ে ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি' দিয়ে চলেছি মনে হয়।

৩. শ্রমিকদের নিজস্ব নেতৃত্বে নিজেদের সংগঠনের প্রায় অনুপস্থিতিও ঐ সব অন্যায়ের প্রতিরোধ করার অক্ষমতা সৃষ্টি করছে।

আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় দেশের আদর্শবাদী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানুষদের শ্রমিক-কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়ান; তাদের সংগঠিত হতে সাহায্য করা, তাদের স্থানীয় স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভের সঙ্গে সমস্ত দেশের এবং দুনিয়ার অবস্থার সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করা; ঔপনিবেশিক আমলে স্বাধীনতা আন্দোলনে

এবং স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের ও পুনগঠনের সঠিক পথ নির্দ্ধারণের ও সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবার আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করা ইত্যদি হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ শুভ দিক আমাদের দেশের রাজনীতিতে।

কিন্তু এই সমস্ত শুভ দিকও যে আবার এর উল্টো দিকে, অশুভ দিকে, রূপান্তরিত হতে পারে তার নজিরও আমাদের সামনেই রয়েছে। শ্রমিককে সংগঠিত হবার জন্য তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এক শুভ দিক; আর শ্রমিকরা যাতে ঐ সাহায্যের হাতের উপর চিরদিন পুরো নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয় বাস্তবে তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঠিক এর উল্টো দিক, একটা অতি অশুভ দিক।

এই অশুভ দিকেরই একটা প্রকাশ হচ্ছে অনেকগুলো ট্রেডইউনিয়নেই নীতি বা কর্মপন্থা নির্দ্ধারণের আলোচনায় যাতে শ্রমিক সভ্যরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করা। অনেক সময়েই সমস্ত সিদ্ধান্তটা ঐ শ্রমিক সংগঠনের পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দলেই নেওয়া হয়ে যায়। পরে বড়জোর কোন আনুষ্ঠানিক সভা করে ট্রেডইউনিয়নে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে নেওয়া হয়। ফলে ট্রেড ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজ আর 'শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্র শিখবার বিদ্যালয়ে' পরিণত হয়না। বরং কতখানি অন্ধভাবে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে মেনে চলা যায় তার একটা শিক্ষাস্থল হয়ে ওঠে ঐ সব ট্রেডইউনিয়ন। এই ধরণের ট্রেডইউনিয়ন শ্রমিক-শ্রেণীকে তৈরি করে না ব্যক্তিগত মালিকানার বিকল্প হিসাবে শ্রমিকদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে কারখানা চালাবার এবং দেশ চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে, যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা ও অভ্যাস সৃষ্টি করতে। গণতন্ত্রকে দৈনন্দিন জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে।

একই কথা কৃষক সংগঠন, ক্ষেতমজুর সংগঠন সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এই ধারার ব্যতিক্রমী কোন সংগঠনের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ফলে বহু বছর অস্তিত্ব আছে এমন শ্রমিক বা কৃষক ট্রেডইউনিয়ন সংগঠনেও নেতৃত্ব প্রধানতঃ শ্রমিক বা কৃষককের হাতে নয়। ফলে এদের মধ্য থেকে রাজনৈতিক নেতা হবার সুযোগই সৃষ্টি হয় না। তাদের সাহস এবং দক্ষতা সৃষ্টি হয় না"।

মজুরী বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সার্বিকভাবে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে সুযোগ পাটশ্রমিকের ছিল তা চটকলের মেহনতি কিভাবে হারিয়েছে তার আনুপূর্বিক ধারণা রয়েছে শ্রী দীপেশ চক্রবর্তীর ও অজিত নারায়ণ বসুর লেখায়। সংগঠিত শ্রমিকের আরও আরও অসংগঠিত হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার ইতিহাসও এখানে নিহিত আছে।

২০০৫ সালে 'জাতীয় পাট নীতি' ঘোষিত হয়। এখানে ভারতের অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক অর্থনীতিতে, বিশেষ করে পেশাগত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, পাট চাষ ও পাট শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যবহারের জন্য পাটজাত দ্রব্যের উপযোগিতা আরও বাড়ানো হবে। ফলে রপ্তানি বাড়বে / রপ্তানি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'ভারত পাট শিল্প উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের পাটকে ক্রেতাদের কাছে আরও ভাল করে তুলে ধরতে এবং পাট শিল্প ও তার গবেষণার কাজে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের উপর নির্ভর করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন কাঁচা পাটের মানের উন্নতি ঘটানো যাবে, অপরদিকে তেমনই পাটজাত জিনিসও উন্নত হবে।

আইন 'স্টিয়ারিং কমিটি'র সুপারিশ এবং 'জাতীয় পাট নীতি' থাকা সত্ত্বেও আফশোসের কথা এগুলি মূলত কাগজে-কলমে থেকে গেছে। ১৯৮৭ সালের পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ৪০% চাল, গম, চিনির মতো খাদ্যবস্তু চটের বস্তায় মোড়কজাত করা আবশ্যিক করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ২০১৩ সালে পরিমাণটিকে ২০% এ নামিয়ে এনেছে। ফলে প্লাস্টিক বা সিন্থেটিক পলিমারে তৈরি ব্যাগ খাদ্যশস্যের মোড়ক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে পাটশিল্প ধুঁকছে। চটের বস্তার চাহিদা কমে যাওয়ায় পাটকলগুলিতে চটের বস্তার উৎপাদনও যথেষ্ট মার খেয়েছে। অনেক পাটকলে এর ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে বা পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। চটের বস্তা তৈরির বরাত কমে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সেই সুযোগে পাটকল মালিকেরা কোন নিয়ম নীতি না মেনে শ্রমিকদের অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি বা অন্যান্য ন্যায্য আর্থিক সুবিধা দিতে অস্বীকার করেছে। বেশ কিছু মালিক আবার পাটকলে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ১৯৭২ সালে ভারত সরকার 'পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি' আইন চালু করে। এটি শ্রমিকদের পক্ষে একটি সামাজিক সুরক্ষা বিধি। কিন্তু পাটকলের মালিকদের অনীহা এবং সরকারি শ্রম দপ্তরের অতি গা-ছাড়া মনোভাবের ফলে গরিব শ্রমিকেরা অবসর-পরবর্তী টাকা না পেয়ে ভয়ঙ্কর মানসিক অবসাদে ভুগছেন। অর্থাভাবে এমন ভাবে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন যেখানে কোন মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে না।

পাটকল মালিকেরা ভারত সরকারের কাছ থেকে চটের বস্তা তৈরির অর্থমূল্য কী হবে সেটিও ভারত সরকার ঠিক করে দেন যার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য আইনি আর্থিক সুবিধার হিসেবও ধরা থাকে। এর পরেও শ্রমিকদের অবসরের পর

তাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয় না। পাটকল মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বেআইনিভাবে বঞ্চিত করে। এমনকি, শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত সামাজিক সুরক্ষা বিধি এড়াতে মালিকরা ঠিকা কর্মী ও চুক্তি-ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে। কারণ এই ধরণের অস্থায়ী শ্রমিকদের বেলায় অবসরকালীন দেনা-পাওনা মেটানোর ঝক্কি নেই।

বর্তমানে বিশ্ব-পুঁজির প্রবল দাপটে যখন উন্নয়নের নামে দেশের জমি, জল, জঙ্গল সব কিছুর উপর বহুজাতিকের লোভাতুর দৃষ্টি, তখন পশ্চিমবঙ্গের এই একান্ত নিজস্ব সম্পদ সম্বল করে কৃষি এবং শিল্প দুটিরই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। সম্ভব এমন একটি বিকল্প শিল্পভাবনাকে নির্মাণ করা, যার মূল লক্ষ্য হবে মুনাফার পেছনে দৌঁড়ানো নয়, সামাজিক প্রয়োজন মেটানো।জনমুখী এমন একটি উদ্যোগ ক্রমশ গতি পেলেই দেখা যাবে শ্রমনিবিড় এই কৃষিজ শিল্পের কেন্দ্রে চলে আসছেন শ্রমিক ও চাষি। এই উদ্যোগ গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি ঘটিয়ে, পাটচাষ ও পাটশিল্পকে যেমন নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করবে, তেমনই এই ক্ষেত্রে শ্রমিক, কারিগর এবং চাষি-খেতমজুরদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়াবে বহুগুণ। শিল্প ও কৃষির বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারদের এবং কর্মচ্যুত শ্রমিকদের রুটিরুজির সুযোগ অনেকখানি বেড়ে যাবে। শিল্প ও কৃষির বিকাশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনার দরজা খুলবে, তাতে নানাভাবে মধ্যবিত্ত মানুষেরও লাভ হবে। পাটের বিপণন থেকে পরিচালন, পাট সংক্রান্ত গবেষণা-অনুশীলনে নিজেদের জীবিকা সংস্থান-এর পাশাপাশি মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি সহ বিভিন্ন শ্রেণির উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষারত ছাত্রছাত্রীরা। এই ধরণের আর্থিক বিকাশ ঘটলে দেশিয় ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের বাজার বাড়বে। ছোট ও

মাঝারি পুঁজিপতিদের এই শিল্পক্ষেত্রে শিল্পোদ্যগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। গণআন্দোলনের মাধ্যমে পাট ব্যবসায়ে রাঘববোয়াল ফড়ে-ফাটকাবাজ-মজুতদারদের হটিয়ে চাষি, বেকার আর ছোট ব্যবসায়ীদের সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আরও নতুন কর্মসংস্থান ও আর্থিক সুযোগ বাড়বে। এরই পাশে, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পাটজাত থলে বা বস্তার দাম আরও কমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পাটজাত মোড়কের সমস্ত ধরনের জিনিস রপ্তানির সম্ভাবনা অনেকখানি বাড়ানো যেতে পারে।

একথা পরিষ্কার বলা চলে যে পাট চাষ ও পাট শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে একদিকে ফড়ে-ফাটকাবাজ-মজুতদারদের দুষ্টচক্রকে ভাঙার, আর অন্যদিকে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির পেট্রোলিয়াম লবির আগ্রাসন ঠেকানোর মতো অপরিহার্য দুটি কাজ করতেই হবে। স্পষ্টতই এই জন্য দরকার এক বিরাট গণআন্দোলন, যার মূল শক্তি হয়ে উঠবে পাটশ্রমিক এবং পাটচাষি। কারণ পাটের সংকট তাদের জীবন জীবিকাকে বিপন্ন করেছে সব চেয়ে বেশি। পাটশ্রমিকদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পাশাপাশি পাটচাষিদেরও ক্রমশ যোগ দিতে হবে সংগঠিত আন্দোলনে।পাটের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে, পাটশ্রমিক এবং পাটচাষির জোটবদ্ধ এই আন্দোলনের পাশে অতি অবশ্যই চাই অন্যান্য সমস্ত চাষি, শ্রমজীবী, আধা-শ্রমজীবী, ছোট-মাঝারি শিল্পোদ্যোগী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী সহ মধ্যশ্রেণির প্রায় সমস্ত অংশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এককথায় পাট শিল্পকে বাঁচাতে চাই এক বিরাট সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক উদ্যোগ।

ফড়ে- ফাটকাবাজ- মজুতদারদের দখল থেকে গোটা পাটশিল্প এবং পাটচাষ আজ শেষের পথে। দেশের বড় পুঁজিপতিরা পাটশিল্পের সম্ভাবনা ও পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে এযাবৎ মোটেই শিল্পসম্মত ভূমিকা পালন করে নি। অনেকে তো পাটশিল্প থেকে সরে গেছে। তাই পাটশিল্পের সংকট মেটাতে বড় পুঁজিপতিরা আদৌ এগিয়ে আসবে কিনা তার ঠিক নেই। এই সংকট মোকাবিলার প্রশ্নে সরকারের ভূমিকার কথাও এসে পড়ে। পাটশিল্প এবং পাটচাষের সংকট মোকাবিলা করে নতুন সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বেলায় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের সেরকম সক্রিয় ভূমিকা খুব একটা আশা জাগাতে পারেনি। পাটশিল্পে ফড়ে-ফাটকাবাজ- মজুতদারদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কোনও সরকারের সেরকম সক্রিয় ভূমিকা চোখে পড়েনি। বিকল্প প্লাস্টিকের অনুপ্রবেশকে রোখার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা চোখে লাগে। পাটশিল্পকে রক্ষা করার জন্য যে 'জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন প্যাকেজিং কমোডিটিজ) অ্যাক্ট' আছে সেটা এমনই দুর্বল, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও বিধানই নেই সেই আইনে। ফলে আইন না মানাটাই নিয়মে দাঁড়িয়েছে।

নূন্যতম সহায়ক মূল্যে পাট কেনা-বেচা করে পাটচাষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গঠিত 'জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'র হালও একই রকম। প্রতি বছর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে 'জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'র তরফ থেকে পাট কেনার আগেই অনেক কম দামে চাষিরা ফড়েদের হাতে পাট তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য হয়। তাই কাগজে-কলমে পাটশিল্পের রক্ষা ও উন্নতির জন্য সরকারি বহু ব্যবস্থা থাকলেও আসলে সে সব কাজে বড় একটা আসে না। এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয় গত ২০১৫ সালে প্যারিসে 'বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন' এর সময়। পরিবেশবাদীদের পক্ষ থেকে বারবার

আবেদন সত্ত্বেও ভারত সরকারের তরফে পরিবেশ-বান্ধব পাটের গুরুত্ব বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। উল্লেখযোগ্য যে, ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ কিন্তু পাটের সপক্ষে ইতিবাচক বক্তব্য পেশ করেছিল। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের উদাসীনতাও চোখে পড়ে। এখানে এ কথাও বলার যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ ও পাটশিল্প নিয়ে কোন ইতিবাচক ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে কোনও রাজনৈতিক দলই পা বাড়ায়নি।

পাটচাষ ও পাটশিল্পের সংকটমোচন ও সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়নের বেলায় আর একটি বিষয় নিয়েও আলোচনা জরুরী। পাটশিল্প এখন পুরোপুরি ফড়ে- ফাটকাবাজদের দখলে চলে গেলেও, একটা সময় বিশেষত ব্রিটিশরা চলে যাবার পরে পাটশিল্প গোয়েঙ্কা, সিংহানিয়া-র মতো দেশিয় বড় পুঁজির মালিকানাধীন ছিল। কিন্তু বড় পুঁজির মালিকানা মানেই যে শিল্পসম্মত পরিচালনা, এমনটা এদেশে প্রায়ই নিশ্চিত নয়। যেমন শ্রমিকদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পভিত্তিক মজুরি দেওয়ার ভয়ে বিড়লা–র মতো দেশের অন্যতম বৃহৎ পুঁজি যেভাবে এক সময় ‘হিন্দুস্তান মোটরস’ কারখানাকে ‘গ্যারেজ’ বলে দেখিয়েছিল, তাতে পাটের মতো শিল্প যে তারা শিল্পসম্মত ভাবে চালাবে, এ কথা ভাবার তেমন যুক্তি নেই। যাই হোক, পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় সমস্ত বড় পুঁজি পাটশিল্প থেকে বিদায় নেয়। তারপর এই পর্যন্ত দেশি- বিদেশি কোন বড় পুঁজি পাটশিল্পের বিষয়ে আর আগ্রহ দেখায়নি।

এই অবস্থায় একটা প্রশ্ন খুব সহজেই উঠে আসে যে পাটশিল্পের এত সম্ভাবনার কথা যেখানে বলা হচ্ছে, তাহলে পাটশিল্পে বড় পুঁজি নেই কেন? বা আসে নাই বা কেন? উত্তরে এটাই বলার, পাটচাষ ও পাটশিল্পের সংকটমোচন তথা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রশ্নকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে, বড় পুঁজি বিনিয়োগ হওয়া-না হওয়ার

বিষয়টি গভীর ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। তবে এটাও অদেখা নয় যে পুঁজি, বেশি থেকে আরও বেশি মুনাফার কড়ি গোনা ছেড়ে কখনোই নিছক জনস্বার্থে বা সামাজিক স্বার্থে বিনিয়োগ হয় না। তাই বিকল্প বিনিয়োগ ছাড়া উপায় কি? তাই পাটের মত এমন এক সামাজিক তথা জনমুখী কৃষি ও শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ তো সমাজ থেকেই আসতে হবে। এক্ষেত্রে তাই সরকারের প্রসঙ্গ আপনি ওঠে। কারণ সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানুষের অর্জিত সম্পদ সরকারের হাতেই থাকে। তাই এই সামাজিক বিনিয়োগের জোগানদার সরকারকেই হতে হবে।

অতি সাম্প্রতিক কালে বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে এক নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। জুটশিল্পের এক বড় সমস্যা হল প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব ও পুরনো ধরনের যন্ত্রপাতির প্রাবল্য। ধাপে ধাপে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ করে প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে পাটশিল্পকে পরিচালনার জন্যে বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রায় এক লক্ষ কর্মী নিয়োগ করার। যাদের প্রথম পর্যায়ে ২৮০ টাকা রোজ ভাতা দেওয়া হবে। এক বছর বাদে তাদের পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হবে। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা শুধু শহরাঞ্চলে নয় গ্রামীণ বেকারদের মধ্যে এক আশা সঞ্চার করে।

যদিও ব্যক্তিগত স্তরে এই গবেষণার প্রয়োজনে হুগলী জেলার জুট শ্রমিকদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তা মোটেও সুখকর নয়। কারণ হিসাবে শ্রমিকরা জানালেন যে সরকার নির্ধারিত ২৮০ টাকা রোজের বদলে বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন মিলে শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ১৫০ টাকা এবং কন্ট্রাক্টরি প্রথার সুবাদে তা অবাধে চলেছে। এছাড়া প্রত্যেকটি জুট মিলে যে পরিমাণ পি.এফ গ্রাচ্যুইটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে ও ২০-২৫ বছর কাজ করার পরও যেখানে বর্তমান শ্রমিকেরা

স্থায়ী নয় সেখানে নতুন শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি আদৌ কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে বড় সংখ্যক শ্রমিক সন্দিহান।

এই সকল অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে পাটের সংকট মুক্তি বা সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বেলায় সরকারের তাই আরও অনেক কিছুই করার আছে। আইন এবং প্রশাসনিক সাহায্যে পাটকল ও পাট ব্যবসায় ফড়ে-ফাটকাবাজির দাপট বন্ধ করা, শ্রমিকদের কাজের শর্ত, স্থায়িত্ব, ও পরিবেশ থেকে শুরু করে উন্নত জীবনমানের উপযুক্ত মজুরি সহ যাবতীয় প্রাপ্যের নিশ্চয়তা দান, পাট চাষিদের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে উপযুক্ত দামে পাট বিপণনের ব্যবস্থা, প্রয়োজনে কৃষক সমবায় গঠন, পাটশিল্প ও পাটচাষে শ্রমনিবিড়, দেশজ, স্বনির্ভর কৃষিতে উৎসাহ দান, পাটচাষ ও শিল্পে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিপ্রকরণের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর কৃষিতে উৎসাহিত করা, পাটশিল্পের সম্ভাবনাময় সমস্ত দিক নিয়ে গবেষণা ও প্রয়োগ, খাদ্যদ্রব্যে প্লাস্টিকের মোড়ক নিষিদ্ধ করা। এমন অনেক কিছুই করার আছে সরকারের। প্রসঙ্গত অবস্থার বিচারে এ কথা বললেও বেশি বলা হয় না যে শেষ পর্যন্ত হয়তো সমগ্র পাটশিল্পটাকেই জাতীয়করণ করার দরকার হয়ে পড়বে আর সেজন্যই চাই পাটের সপক্ষে এক সার্বিক জনমুখী সরকারি নীতি ও কার্যক্রম। এই জনমুখী নীতি বাস্তবায়িত হলে ও যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট শ্রম সংক্রান্ত তাঁর প্রত্যেকটি ঘোষণায় সমকাজে সমবেতনের নীতি প্রয়োগ করার কথা বলেছে তা রূপায়িত হলে পাটশিল্পে অসংগঠিত শ্রমিক আর অস্থায়ী ও অসংগঠিত থাকবে না- পাবে জীবিকার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি ও শ্রমের পূর্ণ মর্যাদা।

পরিশিষ্ট – ১

চটকলের নাম	প্রতিষ্ঠা	পুরনো মালিকানা	বর্তমান মালিকানা	অবস্থা	অবস্থান	শ্রমিক সংখ্যা (অন রোল)	বকেয়া পি.এফ (লাখে)	বকেয়া ই এস আই (লাখে)
আগরপাড়া জুট মিল	১৯২৭	ডি আই আব্রাহাম, এস সিল. এম আই ওয়াসলে, জি গোয়েঙ্কা	গোবিন্দ সারদা	লীজ	কামারহাটি, উঃ ২৪ পরগনা	২১৯৬	৪৪৪.৫৪	১৫৪.৫২
অম্বিকা জুট মিল	১৯২৭	রাধাকৃষ্ণ মোর, এম আর মোর, ধনরাজ বাগাড়িয়া, এম. পি. গোয়েঙ্কা	এ সি কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া	লীজ	বেলুড়মঠ, হাওড়া	১৫৩৯	২৩৮.৫২	২৩৮.৮৪
অ্যালায়েন্স জুট মিল	১৮৯৫	ডি সি আম্বানা, বি সি জৈন, আর কে জালান	এ কে লোহিয়া	মালিকানা	ভাটপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা	৫৪৫০	১.৬৫	১০২.২৩
আলেকজান্দ্রা জুট মিল	১৯০৪	-	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (এন জে এম সি)	সরকারি	জগদ্দল, উঃ ২৪ পরগনা	১৮৩২	১০৮.৬৮	৩২০.১৮

অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল	১৯১৭	কে পি গোয়েঙ্কা, আর এন বাঙ্গুর, জে. এম. গোয়েঙ্কা, জ. বি. গয়েঙ্কা	চাঁপদানি গ্রুপ : ডি জে ওয়াধয়া, বি ওয়াধয়া	টেকওভার	ভাটপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা	৩৫৬০	-	-
অ্যাঙ্গাস জুট মিল	১৯১৮	থমাস ডাফ গ্রুপ, এম এল হেলা	সঞ্জয় ওস্তায়ল, আর কে পোদ্দার	লীজ	ভাদ্রেশ্বর, হুগলী	৩৯৭৯	৭৭৫.৩৮	৪২১.৬৫
অকল্যান্ড জুট মিল	১৯০৮	ডি সি কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া, এস এন হাদা	এ কে কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া	মালিকানা	জগদ্দল, উঃ ২৪ পরগনা	১৬৪৪	২৩৮.৫২	৫.৯৬
বরানগর জুট মিল	১৮৭২	জার্ডিন হেন্ডারসন, মেহেতা এরপর বি গুপ্তা, জালান, দুগার	জৈন, জালান, কমিটি গোবিন্দ সারদা	টেকওভার	বরানগর, উঃ ২৪ পরগনা	৩০৩১	৬৫২.৪	৫৫৮.৬১
বিড়লাপুর জুট মিল	১৯১৯	এম পি বিড়লা, জি ডি কোঠারি	বিড়লা গ্রুপ	মালিকানা	বিড়লাপুর, বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা	২০১০	-	৭০.৫৬

বালি জুট মিল	১৯১৮	এম পি বিড়লা, আর এন বাঙ্গুর, বি পি পোদ্দার	এ সি কাংকারিয়া, এইচ সি কাংকারিয়া, মোতি কেজরিয়াল	মালিকানা	বালি, হাওড়া	৩৪২৭	-	-
বাউড়িয়া জুট মিল	-		এ কে বাজোরিয়া	ম্যালিকানা	বাউড়িয়া, হাওড়া	২৩৭৮	৩১৫.৪	৭.০৭
বজবজ জুট মিল	-	পোদ্দার	এ কে পোদ্দার	মালি্কানা	বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা	৩৪০০	২৯৬.৯৬	৭৭.০৮
ভারত জুট মিল	১৯৩৪	আলামোহন দাস, নরসিংহ পাল, রবি দাস, চন্দ্রকুমার দাস	পশ্চিমবঙ্গ সরকার (সহযোগিতায় : বি সি জৈন)	সরকা্রি	দাশনগর, হাওড়া	-	-	২৩.৬১
ক্যালকাটা জুট মিল	১৯২৯	ডি পি পোদ্দার, কে পি পোদ্দার, আর কে মোর	বি কে পোদ্দার	মালিকানা	নারকেলডাঙা, কলকাতা	৯২৩	-	৭৬.১৪

ক্যালিডোনিয়ান জুট মিল	১৯১৫	এস কে জেটিয়া, ডি বি গয়েঙ্কা, আর এন বাঙ্গুর	জৈগদীশ পোদ্দার ওয়াই পি তা	মালিকানা	বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা	২৪৯০	২৪০.১৪	১৫৮.৪৮
চিভিয়ট জুট মিল	-	বি ডি কানোরিয়া, এরপর এন ও পি কে কেজরিওয়াল	এইচ বি কানোরিয়া	মালিকানা	বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা	৪২৭৪	-	-
ডালহৌসি জুট মিল	১৯০৩	প্রাণপ্রসাদ	রঘু মোদি	ম্যালিকানা	বৈদ্যবাটি, হুগলী	৩৪৬০	-	-
ডেল্টা জুট মিল	-	-	সুনীল ঝুনঝুনওয়ালা	মালিকানা	মাণিকপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া	২৪৩২	২১.১৬	১৪৫.০০
এম্পায়ার জুট মিল	১৯১২	কে পি কানোরিয়া, এন কে ঝুনঝুনওয়ালা	গোবিন্দ সারদা	লীজ	টিটাগড়, উঃ ২৪ পরগনা	২১৫১	২৪৬.১৩	-
ইস্টার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং	১৯২৭	-	গোবিন্দ সারদা	লীজ	টিটাগড়, উঃ ২৪ পরগনা	-	-	৩৩৬.১৩
ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিল	১৮৯০	ব্রিয়ারলি গ্রুপ পি এল সি	বি জি বাঙ্গুর	মালিকানা	বাউড়িয়া, হাওড়া	৩৯৬১	-	৫০.০৭

ফোর্ট উইলিয়াম জুট মিল (বিজয়শ্রী)	১৯১১	বি.ডি বাঙ্গুর, ডি.পি গোয়েঙ্কা	এ কে বাজোরিয়া	মালিকানা	শিবপুর, হাওড়া	১৫৪২	৩৬.৫৬	২৩.১৫
গৌরীপুর জুট মিল	১৮৯৫	বি এম খৈতান, এইচ ডি ওহাহি	এইচ এস পি পোদ্দার	মালিকানা	নৈহাটি, উঃ ২৪ পরগনা	৩৪৯৫	৫৪৮.১৫	৫৬৩.৭৪
গ্যাঞ্জেস জুট মিল	১৯১৬	জি এল বাঙ্গুর, খৈতান, সংহানিয়া	আর কে পোদ্দার, ওস্তাওয়াল	টেকওভার	বাঁশবেড়িয়া, হুগলী	৪৩৬০	৩৮.৯৬	২০.৪৩
গোন্দলপাড়া জুট মিল	১৮৯২	জি ডি কোঠারি	এ কে বা্জোরিয়া	মালিকানা	গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী	২২৭৭	৬৮৬.৩৯	-
গৌরিশংকর জুট মিল	-	এস এন ডালমিয়া, ভি এন ভগত	ছত্তর সিং ছাজার	মালিকানা	শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা	১৩৮৩	-	১৭৩.১৮
হনুমান জুট মিল	-	সুরজ নাগরমল গোষ্ঠি, হাত বদলে মহাবীর জালান	বি সি জৈন	মালিকানা	জে এন এম রোড, ঘুসুড়ি, হাওড়া	৩৩১৫	৩৫.৫৯	৫১.৩৫
হেস্টিংস জুট মিল	১৯১৫	সি. সি বাঙ্গুর, আর সি বাঙ্গুর	মুরলী কাজোরিয়া	টেকওভার	রিষড়া, হুগলী	২৭৪০	-	-

হুকুমচাঁদ জুট মিল	১৯১৯	জি ডি কোঠারি	এ কে বাজোরিয়া	মালিকানা	নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা	৩৯৫১	১৩০৩.৩৬	১৪২.৯১
হাওড়া জুট মিল	১৮৯০	শ্রী লাল মেহতা	রামবাবু মল	মালিকানা	রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, হাওড়া	২০৯০	১৮১.২৮	১৫০.৪২
হুগলী জুট মিল	১৮৮২	আর বাজোরিয়া	এ কে বাজোরিয়া	মালিকানা	গার্ডেনরীচ, কলকাতা	২৮৫৯	২৬২.৮৩	৬৬.৬১
ইন্ডিয়া জুট মিল	১৯১৬	টি আর জালান, এস এস কানোরিয়া	এ কে বাজোরিয়া	মালিকানা	শ্রীরামপুর, হুগলী	২৮০৪	২০৬.৭৯	১৫.৭৯
জগদ্দল জুট মিল	-	-	এ কে বাজোরিয়া, এস বি বাগারিয়া	মালিকানা	জগদ্দল, উঃ ২৪ পরগনা	২৬৯৩	-	৯৪.০৪
কানোরিয়া জুট মিল	-	এস এস কানোরিয়া্	এস এস পাসারি	টেকওভার	ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া	২৬৬০	৯৩২.৪১	৩৫৭.৯১
কাঁকিনাড়া জুট মিল	১৮৮২	শ্রী লাল মেহতা	বি সি জৈন, ডি আর পাটনি	মালিকানা	কাঁকিনাড়া, উঃ ২৪ পরগনা	১৮০৩	১৮৮.৯৯	২০০.৭৬
কামারহাটি জুট মিল	১৮৭৭	এস এস কানোরিয়া্ এসে এস আগরওয়াল	বি পি আগরওয়াল	মালিকানা	কামারহাটি, উঃ ২৪ পরগনা	২৪৫৩	৩৫.৫৭	১৭৪.৫৯

কেলভিন জুট মিল	১৯১৭	সি হকলে, পি আগরওয়াল, হাত বদলে মোহনলাল	ভি পি নাথানি	টেকওভার	তালপুকুর, টিটাগড়, উঃ ২৪ পরগনা	২৪০২	৪৮৩.০৬	৪৭৫.০৪
কিনিসন জুট মিল	১৮৯৯	-	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (এন জে এম সি)	সরকারি	টিটাগর, উঃ ২৪ পরগনা	৪৩৭৮	১৯৮০.৮৯	৭৪৮.৪১
খড়দা জুট মিল	১৮৯০	-	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (এন জে এম সি)	সরকারি	খড়দা, উত্তর ২৪ পরগনা	৩৮০৩	১৪৯৬.০৬	৫৫৩.৪১
লাডলো জুট মিল	-	-	এস এস কানোরিয়া	মালিকানা	চেঙ্গাইল, হাওড়া	৪৯৩৫	-	-
মেঘনা জুট মিল	১৯২০	ফাদারিং, বি. কে. কক্কর	গোবিন্দ সারদা	লীজ	জগদ্দল, উঃ ২৪ পরগনা	৩২৬৮	৫৪৮.৮৪	২৬৪.০৪
মহাদেব জুট মিল	-	-	এস বি বাগারিয়া	লীজ	বালি, হাওড়া	৯৮৬	-	৩.৫৪
নৈহাটি জুট মিল	১৯০৫	কে সি ভগৎ, ডিপি গোয়েঙ্কা	যুগল ভগৎ	মালিকানা	নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা	৪২৯২	-	৮.২৯

নৈদীয়া জুট মিল	১৯২০	বি এম খৈতান, এইচ ডি ওহাহি	হেমরাজ মহাবীর প্রসাদ	মালিকানা	নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা	৪১২৯	২৩২০.১১	১০৯০.২৮
ন্যাশনাল জুট মিল	১৯১৭	-	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (এন জে এম সি)	সরকারি	সাঁরাইল, হাওড়া	৬২৯০	৩২৪২.৫১	১১০৭.৮৯
নফরচাঁদ জুট মিল	-	নফরচাঁদ কোলে	চাপঁদানি গ্রুপ, ওয়াধয়া	লীজ	কাঁকিনাড়া, উঃ ২৪ পরগনা	৬১৫	-	১০৩.৮২
নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল	১৯১৫	এ কে জানি, বি পি আগরওয়াল পরে সমবাস			বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা	৬৬৫১	২২৯৭.৫৫	১২১৩.৭৭
নর্থ ব্রুক জুট মিল	-	এস কে আগরওয়াল এম পি পোদ্দার (এইচ এম পি গোষ্ঠি	হেমরাজ মহাবীর প্রসাদ	টেকওভার	বৈদ্যবাটি, হুগলী	২৯৫৫	১৩৬.৪৩	১২৯.১৩
প্রবর্তক জুট মিল	১৯৩৫	জিে কে ভট্টর, জে এন মল	বি এম মল. বি এম ভট্টর	লীজ	কামারহাটি, উঃ ২৪ পরগনা	১৫০০	-	২৩.৩৭
প্রেমচাঁদ জুট মিল	-		রামনা ট্রেডিং	লীজ	চেঙ্গাইল, হাওড়া	৬২০	১৩০.৪০	১৪৯.৮২

রিলায়েন্স জুট মিল	১৯০৬	পি কে কানোরিয়া	ভি কে চৌখানি	লীজ	ভাটপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা	৩৩৬১	-	১.৩১
শ্যামনগর জুট মিল	১৮৭৪	ডি. কে ব্রাউন	ওস্তাওয়াল, পোদ্দার	লীজ	ভদ্রেশ্বর, হুগলী	৩৬৯৪	৯৩৮.০৩	৪৭৮.১৩
শুড়া জুট মিল	-	-	বিড়লা গ্রুপ	মালিকানা	নারকেলডাঙা, কলকাতা	১৯৭৭	-	৪.০৩
টিটাগড় জুট মিল	১৮৮৩	ব্রিয়ারলি পি এল সি	গোয়েল	টেকওভার	টিটাগর, উঃ ২৪ পরগনা	৪০৯৬	১২৭১.০৮	৯৭৫.৯৪
তিরুপতি জুট মিল (নস্কর পাড়া)	-	-	মল ও নাওয়ার	লীজ	ঘুসুরি, হাওড়া	১৩৫৫	-	
ইউনিয়ন জুট মিল	১৮৮০	-	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (এন জে এম সি)	সরকারি	কনভেন্ট রোড, কলকাতা	১৩৯৯	৮৫৮.৮১	
ভাি্ক্টোরিয়া জুট মিল	১৮৮৩	সার হে ডি কে ব্রাউন	ওস্তাওয়াল, ওসনিওয়াল পোদ্দার	টেকওভার	ভদ্রেশ্বর, হুগলী	৩০৮৫	৮৮৮.৬৫	
ওয়েলিংটন জুট মিল	১৮৫৪	জি জে ও জি আর সি ওয়াধয়া	বি ওয়াধয়া	মালিকানা	রিষড়া, হুগলী	২৭১১	-	

ওয়েভারলি জুট মিল	১৯১৬	এ সি ফাদারিনহাস, গোয়েঙ্কা	এ কে বাজোরিয়া	মালিকানা	শ্যামনগর, উঃ ২৪ পরগনা	১৭৫৫	১৭.১১	
আসাম:								
আসাম কো অপারেটিভ জুট মিল লিমিটেড	-	-	-			৬৮৫	-	-
ওড়িশা:								
কোনারক জুট মিল লিমিটেড	-	-	-			১৩১৯	-	-
ত্রিপুরা:								
ত্রিপুরা জুট মিল লিমিটেড	-	-	-			১৬০৬	-	-
বিহার :								
কাটিহার জুট মিল লিমিটেড	-	-	বিহার স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন			১৩০০	-	-

আর বি এইচ এম	-	-	রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা (এন জে এম সি)			১০১১	-	-
উইনসম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	-	-	-	-		১১৯৩	-	-
উত্তরপ্রদেশ:								
জুমিলাল কমলপোত জুটমিল	-	-	-	-	কানপুর, উত্তরপ্রদেশ	৩৩৯১	-	-
জয়পুর উদ্যোগ (কানপুর জুট)	-	-	-	-	কানপুর, উত্তরপ্রদেশ	১০৪০	-	-
মহাবীর জুট মিলস লিমিটেড	-	-	-	-	গোরক্ষপুর, উত্তরপ্রদেশ	৭৫১	-	-
মধ্যপ্রদেশ:								
মোহন জুট মিলস লিমিটেড	-	-	-	-	রায়গড়, মধ্যপ্রদেশ	-	-	-
অন্ধ্রপ্রদেশ:								

চিতাভালস জুট মিলস (উইলার্ড ইন্ডিয়া লি-র ডিভিশন)	-	-	-	-	বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৭৫১	-	-
ইস্ট ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল কোম্পানী (শ্রীকৃষ্ণ জুটমিলস)	-	-	-	-	এলুরু, অন্ধ্রপ্রদেশ	২৮৫৪	-	-
হুগলী জুট মিলস প্রোজেক্ট লিমিটেড (বিবলি জুট মিলস)	-	-	-	-	বিবলি, অন্ধ্রপ্রদেশ	-	-	-
হুগলী জুট মিলস প্রোজেক্ট লিমিটেড.	-	-	-	-	ভিজিয়ানা গ্রাম ক্যান্টনমেন্ট, অন্ধ্রপ্রদেশ	-	-	-
নেল্লিমার্লা জুট মিলস কো লি:	-	-	-	-	নেল্লিমার্লা, অন্ধ্রপ্রদেশ	২২৫৭	-	-
শ্রী বজরঙ্গ জুট মিলস লিমিটেড	-	-	-	-	গুন্টুর, অন্ধ্রপ্রদেশ	১৪৫০	-	-

****

পরিশিষ্ট – ২

Table 6.3: State Wise Production & Raw Jute Qty: In Lakh Bales

(A=Area IN '000 Hect; P=Prod. In '000 Bales Of 180 K.G Per Bales; PY=Productivity In QTLS/Hect

April/Mach	2004-2005			2005-2006			2006-2007			2007-2008		
	A	P	PY	A	P	PY	A	P	PY	A	P	PY
State												
Assam	63.1	435.8	6.9	62.7	603.6	9.6	63	583.3	9.2	65	683.7	10.52
Meghalaya	8.2	39.2	4.7	8.4	55.7	6.63	8.4	55.1	6.6	8.4	54.9	6.53
West Bengal	577.6	7934.9	13.7	569.3	8114.5	14.2	605.6	8506	14	617.2	8293.5	13.44
Bihar	150	1180.2	7.9	147.5	1386.6	9.4	141.2	1389.8	9.8	154.2	1464.9	9.5
Orissa	30.1	145.9	4.9	25.7	141.5	5.5	26.7	132.4	4.9	27.9	151.1	5.42
Andhra Pradesh	53	458	8.6	50	455	9.1	62	544	8.8	57	501	8.79
Tripura	2.8	22.5	8	2.8	23.3	8.3	1.6	11.8	7.3	1.5	10.5	7
Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uttar pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Others	31	55.9	1.8	31.3	59.4	1.9	26.6	50.6	1.9	29.1	50.9	1.13
Total	915.8	10272.4	56.5	897.7	10839.6	64.63	935.1	11273	62.5	960.3	11211	62.33

Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India

Table 6.4: State Wise Production & Raw Jute Qty: In Lakh Bales

(A=Area IN '000 Hect; P=Prod. In '000 Bales Of 180 K.G Per Bales; PY=Productivity In QTLS/Hect

April/Mach	2008-2009				2009-2010			2010-2011			2011-2012	
	A	P	PY	A	P	PY	A	P	PY	A	P	PY
State												
Assam	65.4	674.3	10.31	62	638	10.29	67.3	650.7	1710	67	795	2136
Meghalaya	8.4	54.6	6.5	0	0	0	8	82.6	1194	12	86	1290
West Bengal	592.1	7965.5	13.45	623.6	8893.3	14.26	580.8	8214.3	2386	608	8800	2605
Bihar	150.9	1220.1	8.09	141.8	1181.7	8.33	145	1310.4	1580	158	1930	2199
Orissa	22.5	114.7	5.1	20.2	85.4	4.23	19.2	113.5	1456	24	193	1448
Andhra Pradesh	37	295	7.97	23	188	8.17	25	224	1613	0	0	0
Tripura	1.1	8.7	7.9	0	0	0	1.3	10.7	1541	2	9	810
Nagaland	0	0	0	0	0	0	3	5.4	324	0	0	0
Uttar pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Others	23.5	32.4	7.12	42.1	117.5	2.97	36.8	568	388	30	96	576
Total	900.9	10365.3	66.44	912.7	11103.9	48.25	886.4	11179.6	12192	901	11909	11064

Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India

Table 6.5: State Wise Production & Raw Jute Qty: In Lakh Bales

(A=Area IN '000 Hect; P=Prod. In '000 Bales Of 180 K.G Per Bales; PY=Productivity In QTLS/Hect

	2012-2013			2013-2014		
	A	**P**	**PY**	**A**	**P**	**PY**
State						
Assam	70	823	2166	81	823	1829
Meghalya	12.6	86.31	1236	0	0	0
West Bengal	577	8349	2605	0	0	0
Bihar	139.1	1690	2182	0	0	0
Orissa	22.4	177.7	1427	578	8522	2654
Andhra pradesh	25	225	1620	133	1540	2084
Tripura	1.3	11	1523	22	176	1440
Nagaland	4.63	40.2	1564	15	142	1704
Uttar Pradesh	0.4	4.5	2025	1.2	9.8	1470
Others	20	0	0	36.3	203.6	1010
Total	872.43	11406.71	16348	866.5	11416.4	12191

Table 6.6 State Wise Production & Raw Jute Qty: In Lakh Bales						
(A=Area IN '000 Hect; P=Prod. In '000 Bales Of 180 K.G Per Bales; PY=Productivity In QTLS/Hect						
	2014-2015			2015-2016		
	A	P	PY	A	P	PY
State						
Andhra Pradesh	7	50	1286	6	0	0
Assam	75	795	1908	76	767	1917
Bihar	111	1500	2428	113	0	0
Chattisgarh	1	2	360	0	0	0
Jharkhand	0	0	0	0	0	0
Karnataka	0	0	0	0	0	0
Madhya pradesh	0	1	480	0	0	0
Maharastra	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	0	0	8	0	0
Nagaland	0	0	0	3	0	0
Odisha	13	68	946	14	0	0
Tamilnadu	0	4	3870	0	0	0
Tripura	0	0	0	1	0	0
Uttar Pradesh	0	0	0	0	0	0
West Bengal	576	8969	2802	519	8075	2801
Others	19	105	989	2	0	0
Total	802	11494	15069	742	8842	4718
Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India						

Table 6.7 Production of Jute Goods

Qty: 000' M. Tons

(April/March)	Hessian	Sacking	CBC	Others	Total
1995-96	413.9	676.3	30.5	5312.3	1433
1996-97	368.7	666.6	25.2	340.4	1400.9
1997-98	392.4	864.6	19.8	401.6	1678.4
1998-99	344.1	903.3	18.5	330.3	1596.2
1999-00	344.5	909.2	8	328.5	1590.2
2000-01	337.9	952.9	6.6	327.5	1624.9
2001-02	275.3	1034.3	5	286.2	1600.8
2002-03	338.3	1000	5.4	278.1	1621.8
2003-04	305.2	979.3	4.7	281.1	1571.3
2004-05	310.3	992	4	306.8	1613.1
2005-06	320	1007.5	6.2	248.5	1582.2
2006-07	250.3	874.7	2.9	228.4	1356.3
2007-08	350.3	1143	6	279.7	1776
2008-09	297.8	1071.4	4.5	260	1633.7
2009-10	206.5	921.6	2.4	192.6	1323.3
2010-11	244.4	1076.9	4.7	239.7	1565.7
2011-12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012-13	210	1218.2	2.9	160.2	1591.3
2013-14	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2014-15	211.3	901.8	3.6	150.5	1267.2
2015-16	196.5	891.9	0.9	127.8	1217.1
2016-17(till Feb 2017)	15.4	72.4	0	8.2	96

Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India

Table 6.8 Domestic Consumption of Jute Goods					
Qty: In 000' M. Tons					
(April/March)	**Hessian**	**Sacking**	**CBC**	**Others**	**Total**
1996-97	259.8	652	1.7	222.5	1336
1997-98	285.8	842.4	1.5	257.5	1387.2
1998-99	286.2	8863	1.3	230.5	1404.3
1999-00	287	907.4	1.4	230.9	1426.7
2000-01	269.7	935.2	0.8	229.4	1435.1
2001-02	243	1021.4	0.9	195.5	1460.8
2002-03	251.3	954.5	1.9	167.7	1375.7
2003-04	253.3	910	0.3	179.3	1342.9
2004-05	244.8	972.4	0.5	176.5	1394.2
2005-06	237.6	974.2	0.7	165.3	1378.8
2006-07	209.1	854.4	0.5	152.7	1216.2
2007-08	271.4	1102	1.2	168.2	15427
2008-09	249.8	1043	0.3	142.5	1435.6
2009-10	182.6	879.8	1.2	141.9	1205.5
2010-11	182.3	1034.4	0.9	133.9	1351.5
2011-12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012-13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399
2013-14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014-15	171.9	870.4	0	111.3	1153.6
2015-16	164.2	889.1	0	90.2	1143.5
2016-17(till Feb 2017)	11.8	74.5	0	6.7	93
Source: Jute Technology Mission, Ministry of Textiles, Govt. of India					

Table 6.9: Jute & Mesta: All-India Area, Production and Yield			
Area - Million Hectares			
Production - Million Bales (180 kg. each)			
Yield - Kg/Hectares			
Year	**Area**	**Production**	**Yield**
1980-81	1.3	8.16	1130
1981-82	1.15	8.37	1311
1982-83	1.02	7.17	1265
1983-84	1.05	7.72	1320
1984-85	1.13	7.79	1242
1985-86	1.5	12.65	1524
1986-87	1.07	8.62	1454
1987-88	0.96	6.78	1274
1988-89	0.92	7.86	1540
1989-90	0.91	8.29	1646
1990-91	1.02	9.23	1634
1991-92	1.11	10.29	1662
1992-93	0.93	8.95	1658
1993-94	0.89	8.43	1713
1994-95	0.93	9.08	1760
1995-96	0.93	8.81	1712
1996-97	1.1	11.13	1819
1997-98	1.11	11.02	1792
1998-99	1.03	9.81	1722
1999-00	1.04	10.55	1834
2000-01	1.02	10.56	1868
2001-02	1.05	11.68	2007
2002-03	1.04	11.28	1960
2003-04	1	11.17	2008
2004-05	0.92	10.27	2019
2005-06	0.9	10.84	2173
2006-07	0.94	11.27	2170
2007-08	0.96	11.21	2101
2008-09	0.9	10.37	2071
2009-10	0.91	11.82	2349
2010-11	0.87	10.62	2197
2011-12	0.9	11.4	2280
2012-13	0.86	10.93	2281
2013-14	0.84	11.68	2512
2014-15	0.81	11.13	2473
2015-16	0.78	10.52	2421
2016-17	0.76	10.96	2585
2017-18	0.74	10.03	2435
2018-19	0.7	9.82	2508
2019-20	0.68	9.91	2641
Source: Directorate of			
*4th Advance Estimates.			

Table 6.10: India Export of Jute Products						
0000 M.Ton/Crore						
April/March	**Hessian**	**Sacking**	**CBC**	**Others**	**Total**	**Value**
1996-97	76.3	6.7	15.4	6	155	572.3
1997-98	103.5	17.9	13.5	9.7	240	694.7
1998-99	65.3	8	15	12.9	171	582.3
1999-00	57.4	5.6	6.3	15.8	169	571.5
2000-01	61.4	17.3	5.9	11.5	181	646.3
2001-02	36.8	12.2	4.4	13.7	146.1	567.5
2002-03	77.4	37.5	3.8	23	229.2	916.6
2003-04	157.1	33.4	5.2	24.1	310.4	1051.88
2004-05	153.7	31.2	1.5	15	321.8	1146.9
2005-06	171.6	33.2	0.9	11	285.8	1186.24
2006-07	122.2	31.6	0.1	10.6	242.8	1055.16
2007-08	67.8	30	NA	14.4	204.3	1143.57
2008-09	53	53.2	NA	10.7	199.8	1216.16
2009-10	31.3	26.5	NA	8.3	110.5	859.46
2010-11	53.9	40.6	NA	10.4	199.3	1363.29
2011-12	58.3	81.1	NA	8.2	201.1	1502.14
2012-13	51.2	103.8	NA	59	214	1598.05
2013-14	51.4	109.4	NA	53.3	216	1880.63
2014-15	27	31.1	NA	7.4	88.6	1006.4

(Data Source: Indian Jute Mill Association)

পরিশিষ্ট – ৩

INDIAN JUTE - AT A GLANCE

1. Average land area under raw jute & mesta cultivation (Average of last four years)	: 799 thousand hectares		
2. Average production of raw jute & mesta (Average of last four years)	: 31300 thousand bales : In lakh of bales.	2019-20	68.0
		2020-21	60.0
		2021-22	90.0
		2022-23	95.0
3. Number of composite jute mills	: 101 (23 closed Jute mills)		
4. State-wise distribution of composite jute mills	: West Bengal	73	
	Andhra Pradesh	13	
	Bihar	4	
	U.P.	3	
	Assam	2	
	Orissa	3	
	Chhattisgarh	2	
	Tripura	1	
5. Number of workers employed in composite jute mills (as on 31st March 2021)	: 1,15,846 approx (permanent workers) 1,29,876 approx (other workers)		
6. Average production of jute goods in complete jute mills (Average of last four years)	: 1092.3 thousand tonnes per annum		
7. Average export of jute goods (Average of last four years)	: 119 thousand M.T. per annum with value of Rs.23250 million per annum		
8.Average domestic demand for jute goods (Average of last four years)	: 1037.1 thousand tonnes per annum		
9. Government of India-owned jute mills under control and management of National jute manufactures corporation Ltd.	: Alexander, Khardah, Kinnision, National RBHM, Union		
10. 100% export-oriented units (as on April 2022)	: There is one 100% EOU in jute sector Producing broadly high jute Decorative fabrics, fine hessian cloth, jute Bags and blended fabrics. i) Cheviot Co.Ltd. (Falta SEZ)		
11. installed looms in jute mills (as on April 2022)	: 46203	Hessian	14654
		Sacking	22417
		C.B.C	537
		Others	8595
12. Installed spindles in jute mills other than 100% export-Oriented units (as on April 2022)	: 760058	Fine	619496
		Coarse	140562
13. Installed capacity of composite jute mills other then 100% Export oriented units. (on the basis of 305 working days per Year & JMDC (Productivity Norms)	: 2767 thousand tonnes per annum.		

Footnote: The number of workers figures relate to 67 out of 97 composite jute mills. Thirty jute mills were either under suspension of work /closer or did not submitted information on the date of report .

Mill wise list of Installed Looms & Spindles reported as on 01.04.2020			
Sl No.	MILL NAME	Total Looms	Total Spindles
1	Agarpara	491	8054
2	Alliance**	874	11290
3	Anglo-India	689	10982
4	Angus	734	12888
5	Auckland	834	10696
6	Assam Co-operative**	172	2360
7	Ambica	971	13122
8	Bally	886	12192
9	Budge-Budge	647	9940
10	Birla**	873	15216
11	Baranagar**	942	12000
12	Bharat **	124	2204
13	Bowreah	916	18388
14	Calcutta	132	3020
15	Caledonian	727	11834
16	Cheviot	576	13984
17	Delta**	610	9632
18	Dalhousie	766	11904
19	East India (Sri Krishna Hessain Kothuru)	380	7632
	East India (Sri Krishna Jute Mills, Eluru)	403	6704
20	Empire	452	6152
21	Gloster	685	13058
22	Ganges jute pvt	202	2270
23	Ganges Manufacturing	818	10714
24	India jute	796	10256
25	Hastings	1032	14184
26	Hooghly	348	6118
27	Howrah/Premier **	630	11386
28	Hukumchand	1742	22900
29	Jagatddal	594	9088
30	Kakinnarah	870	12724
31	Kamarhatty	395	10664
32	Gourishankar	374	5788
33	Kelvin**	430	7860
34	Ludlow	901	15510
35	Mahabir	304	3440
36	Loomtex (Titagarh) **	808	11056
37	Janakalyan (Megna)**	604	10246
38	Prabartak	234	4252
39	North-Brook	739	9316
40	Naihati	794	10986
41	Goyal Merchants	164	2274
42	Gondalpara	910	10778
43	Jutex	112	2476
44	Jaikishandass	104	2388
45	Sunbeam (Eastern)	337	4784

46	HSB Agro jute	166	2814
47	Reliance	940	14084
48	Aditya Translink	919	12632
49	RDB Textiles (Victoria)	780	11544
50	Winsome (Rameswara)**	360	6324
51	Mahadeo	218	3838
52	Nellimarla **	540	9496
53	Tepcon	637	8482
54	Kaliyaganj Agro **	94	2004
55	Wellington (Champdany)**	709	10880
56	Chattisgarh jute ,Raipur	254	4556
57	Premchand**	606	10188
58	Kalinga**	172	3364
59	Vijayshree	530	5464
60	Weaverly **	708	10416
61	Tripura **	45	1320
62	Tirupati **	260	3814
63	Kamakshi	270	4446
64	Atlanta **	126	1916
65	A.P Fibres	193	4194
66	A.S Fibres**	104	2330
67	Keshava jute	170	3140
68	G.S jute**	42	1322
69	Lakskmi ganapati**	130	2088
70	Barshul Tex (Shaktigarh)	362	6134
71	Sri Sitaram Lakshmi**	74	1320
72	Uma Spinners**	144	1470
73	Naffarchandra	450	8478
74	Sarada**	120	1720
75	Maa Annapurnna	132	2852
76	Maheswari	36	1626
** Not yet sumitted the machinery returns,so last position reported as on 01.01.2019 has been considered			

Mill wise list of Installed Looms and Spindles as on 01.04.2021

Sl No.	Mill Name	Total Looms	Total Spindles
1	Agarpara	470	8054
2	Alliance	914	12874
3	Anglo-India	530	11138
4	Angus	734	12936
5	Auckland	644	10716
6	Assam Co-operative**	172	2360
7	Ambica	894	12722
8	Bally	758	10248
9	Budge-Budge	661	10100
10	Birla	700	15536
11	Baranagar	860	11740
12	Bharat **	124	2204
13	Bowreah	980	18388
14	Calcutta	134	3020
15	Caledonian	727	11834
16	Cheviot	576	13984
17	Delta	702	10020
18	Dalhousie	786	12696
19	East India (Sri Krishna Hessain Kothuru)	380	7832
	East India (Sri Krishna Jute Mills, Eluru)	403	6704
20	Empire	308	6048
21	Gloster	717	13058
22	Ganges jute pvt	232	8796
23	Ganges Manufacturing	688	10202
24	India jute	768	10016
25	Hastings	945	12024
26	Hooghly	346	4748

27	Howrah/Premier	656	11116
28	Hukumchand	1155	22920
29	Jagatddal	594	9088
30	Kakinnarah	846	12728
31	Kamarhatty	292	10664
32	Gourishankar	374	5820
33	Kelvin	523	8880
34	Ludlow	929	15446
35	Mahabir	304	3440
36	Loomtex (Titagarh)	804	10756
37	Janakalyan (Megna)	582	9954
38	Prabartak	234	4356
39	North-Brook	739	9316
40	Naihati	794	10914
41	Goyal Merchants	164	2274
42	Gondalpara	876	10718
43	Jutex	118	2580
44	Jaikishandass	104	2388
45	Sunbeam (Eastern)	337	4784
46	HSB Agro jute	138	2814
47	Reliance	940	14084
48	Aditya Translink	919	12632
49	RDB Textiles (Victoria)	544	11564
50	Winsome (Rameswara)	364	6324
51	Mahadeo	234	3838
52	Nellimarla **	540	9496
53	Tepcon	637	8482
54	Kaliyaganj Agro	146	2200
55	Wellington (Champdany)**	709	10880
56	Chattisgarh jute ,Raipur	254	4556
57	Premchand	606	10408
58	Kalinga	172	3364
59	Vijayshree	356	5464

60	Weaverly **	708	10416
61	Tripura **	45	1320
62	Tirupati	260	3794
63	Kamakshi	238	4446
64	Atlanta	176	3580
65	A.P Fibres	225	4194
66	A.S Fibres (Sri Ganesh)	114	2330
67	Keshava jute	172	3156
68	G.S jute	64	1482
69	Lakskmi ganapati	130	1792
70	Barshul Tex (Shaktigarh)	362	6416
71	Sri Sitaram Lakshmi	74	1320
72	Uma Spinners	144	1470
73	Naffarchandra	470	9186
74	Sarada	120	3456
75	Maa Annapurnna	156	2852
76	Maheswari	36	1626
77	Mansha	64	1512
Total		**36695**	**608594**

** Not submitted the return , so last position taken as on 01.04.2020.

MONTH WISE INDENT OF B.TWILL JUTE BAGS FOR KMS:2017 (MAY-2017 - MAR-2018)								
Sl. No.	Agency	May Indent	Jun Indent	Jul Indent	Aug Indent	Sep Indent	Oct Indent	Nov Indent
1	Punjab	200052	199918	193664				
2	Haryana			60060	58500			9880
3	Food Corporation of India-INFCI		34512	6960	1500	2544	2976	
4	Uttar Pradesh-UPFCS					99970		
5	Odisha-OROSC	16500	15000				15500	200
6	Madhay Pradesh-MPSCS					24960		
7	Bihar-BRFCS							
8	Chhattisgarh-CGMFD			29910	34980	55008	72504	
9	Uttrakhand-UKFCS						10032	
10	Jharkhand-JHSFC							2000
11	Tamil Nadu-TNCSC							
12	Andhra Pradesh-APSCS				25000		30000	
13	Telengana-TGTSC				30000	43360		20000
	Report Total:	216552	249430	290594	149980	225842	131012	32080

MONTH WISE INDENT OF B.TWILL JUTE BAGS FOR RMS:2016-17 (NOV-2016 - MAY-2017)								
Sl. No.	Agency	Nov Indent	Dec Indent	Jan Indent	Feb Indent	Mar Indent	Apr Indent	May Indent
1	Punjab		150020	100100	38090	11700		
2	Haryana		19110	149890			6110	
3	Food Corporation of India-INFCI			49968	25728	40560		9456
4	Uttar Pradesh-UPFCS					46930		22880
5	Odisha-OROSC	15000	25000	33000		15000	10000	
6	Madhay Pradesh-MPSCS			110040		49580		
7	Bihar-BRFCS		10790	10920	10400			
8	Chhattisgarh-CGMFD		33162					
9	Uttrakhand-UKFCS							
10	Jharkhand-JHSFC							
11	Tamil Nadu-TNCSC							
12	Andhra Pradesh-APSCS		40000				20000	
13	Telengana-TGTSC		29000		60000	52000	20000	20000
	Report Total:	15000	307082	453918	134218	215770	56110	52336

পরিশিষ্ট – ৪

চিত্র : পাট ওয়েভিং এবং স্পিনিং মেশিন

চিত্র : পাট আঁশ প্রস্তুতি

চিত্র : গোন্দোল পাড়া জুটমিল মেন গেট

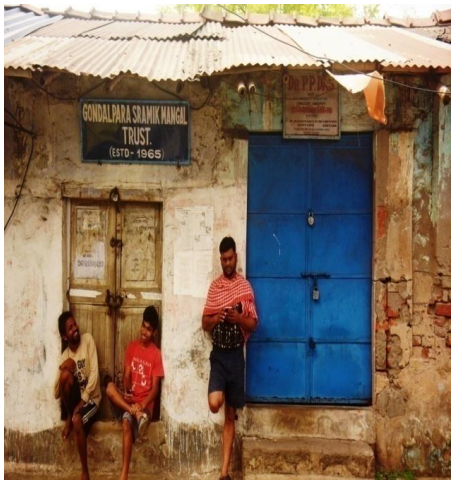

চিত্র : শ্রমিক মঙ্গল ট্রাস্ট

চিত্র : গোন্দোল পাড়া জুটমিল সংলগ্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

চিত্র : গোন্দোল পাড়া শ্রমিক লাইন ও রেশন ব্যবস্থা

সহায়ক রচনা পঞ্জি

প্রাথমিক উপকরণ (মহাফেজ খানা, লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত দলিল)

১। অপ্রকাশিত নথিপত্র

(Records section, home (Political) Department, Government of West Bengal, Writers Building, Calcutta)

i) File No- 1R-2 (C) , Dec ' 51/B.2055-56, Sub-Industrial Dispute

ii) File No- 5B-4 (C) , June' 51/B.7-56, Sub- Housing for industries

iii) File No – 3C – 13, May' 51/B.189 – 195, Sub – Jute Industry

iv) File No – 5M – 22, Jan' 51/B.1835 – 49, Sub – INTUC / AITUC

v) File No – 4P – 3, Jan' 51/B.1732 – 34, Sub – Five year plan

vi) File No – 3C-7, Jan' 51/B.1188 – 1202, Sub – Industry policy

vii) File No – 3C – 17 (J), Jan' 51/1688 – 692, Sub – Labour policy

২। প্রকাশিত সরকারি দলিল ও নথিপত্র

(Secretarial Library Govt. of West Bengal, Writers Buildings, Kolkata; National Library, Kolkata)

i) The census of India 1951, Volume – VI, Part – IV, The Calcutta Industrial region

ii) The census of India 1951, Volume – VI, Part – 1(A) Report, West Bengal, Sikkim & Chandernagar

iii) The census of India 1951, District Census Handbook, 24 parganas

iv) The Calcutta Gazette, October to December 1948 (Union north jute mills, India jute mills)

v) The Calcutta Gazette, July to September 1948. (Jute textile industry in West Bengal)

vi) Labour in West Bengal, Department of Labour, Govt. of West Bengal. Year – 1975, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, & 86

৩। সংবাদপত্র ও সাময়িকী

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত

i) আনন্দবাজার পত্রিকা – ১৯৮৫ - ২০২০

ii) যুগান্তর পত্রিকা – ১৯৫৪ – ১৯৭৭

iii) দৈনিক বসুমতী – ১৯৫৩ – ১৯৭৮

iv) স্বাধীনতা পত্রিকা – ১৯৫৪ – ১৯৬৪

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত

i) Hindustan Standard – 1946 -1979

ii) The Statesman – 1960 – 1967

iii) Amrita Bazar Patrika – 1947- 1951

প্রকাশিত গ্রন্থাদি

গৌণ উপকরণ

বাংলা ভাষায় রচিত

১) সেন, সুকোমল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা। কলকাতা, ২০১২।

২) সেন, রঞ্জিত (সম্পা.)। বাংলার শ্রমশক্তি : আঠারো থেকে বিশ শতক। কলকাতা, ২০০৮।

৩) সেন, সুকোমল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস : ১৮৩০ – ২০০০। কলকাতা, ২০০৭।

৪) সাহা, নারায়নচন্দ্র; ঘোষ, অলক। অর্থবিদ্যার রূপরেখা। কলকাতা।

৫) রায়, স্বপনকুমার। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারি উদ্যোগ। কলকাতা, ১৯৯৬।

৬) ভট্টাচার্য, হরশঙ্কর। ভারতের অর্থনীতি। কলকাতা।

৭) ভুক্ত, অনিন্দ্য। শিশুর অধিকার বনাম শিশুশ্রম। কলকাতা, ২০১০।

৮) ভুক্ত, অনিন্দ্য। ভারতীয় পরিকল্পনার চারদশক। কলকাতা, ২০০১।

৯) বাগচী, অমিয়কুমার। ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন : ১৯০০ – ১৯৩৯। কলকাতা, ১৯৭০।

১০) প্রধান, সুধী। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাত দশক (স্মারক রচনা সম্ভার)। কলকাতা, ২০০২।

১১) দাস, গোকুলচন্দ্র। চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কলকাতা, ২০০৪।

১২) দাস, অমল। ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক : এদের সংকট ও সংগ্রামে : উনিশ থেকে বিশ শতক। কলকাতা, ২০১৩।

১৩) ডিমিট্রি, জজি। শ্রমিক ঐক্য। কলকাতা, ২০১২।

১৪) জি.ভি. প্লেখানভ। শিল্প ও সমাজ জীবন। কলকাতা, ২০১২।

১৫) চৌধুরী, কমল। চব্বিশ পরগনা : উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন। কলকাতা, ১৯৯৯।

১৬) চক্রবর্তী, মধুসূদন। অর্থনীতি প্রথম পাঠ। কলকাতা, ২০১২।

১৭) ঘোষ, শিবদাস। শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে। কলকাতা, ২০১২।

১৮) ঘোষ, শিবদাস। শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। কলকাতা, ২০১২।

ইংরেজি ভাষায় রচিত

১) Bagchi, Amiya & Benerjee, Nirmala. Change and Choice in Indian Industry. Kolkata, 1981.

২) Basu, Nirban. The Working Class movement : A Study of jute mills of Bengal, 1937 – 1947, Kolkata, 1994.

৩) Chakrabarty, Dipesh. Rethinking Working class History : Bengal 1890 -01940. Kolkata, 1989.

৪) Ghosh, Parimal. Communalism and Colonial: Experience of Calcutta Jute Mill Workers 1880-1930. Kolkata, 1990.

৫) Das, Amal. Urban politics in an Industrial Area (Aspects of Municipal and Labour politics In Howrah – West Bengal 1850 – 1920)

৬) Dasgupta, Ranajit. Labour and Working Class in Estern India Studies in Colonial History, Kolkata, 1994.

৭) Gupta, Indrajit. Capital and Labour in Industry : AITUC, Publication, 1953.

৮) Bagchi, Amiya Kumar. *''Private Investment in India 1900-39'' Cambridge University press, London 1972, ''Economy, Society, and Polity: Essays in the Political Economy of Indian Planning''.* Calcutta: Oxford University Press, 1988.

8) Banerjee, N. *The Unorganized Sector and the Planner.* Calcutta: Oxford University Press, 1978.

৯) "Bengal Provincial Banking Enquiry Committee." Annual, Calcutta, 1929-30, Vol-I, 22 .

১০) Boyce, J.K,. "Jute, Polypropylene, and the Environment: A Study in International Trade and Market Failure,." *The Bangladesh Development Studies, Vol. 33(1-2),*, 1995.

১১) Chakraborty, Chandan,. "Jute Industry On The Way To Recovery From Technological Stagnation, What Awaits Jute Growers In Bengal vol. U5 (29) 1997, PP-13,." *New Age Vol 46(12),*, 1998: PP-4.

১২) Chattopadhyay, Sarat Chandra. *Mahesh .* Calcutta: Sarat Sahitya Sangraha volume 1, 1988.

১৩) Chaudhari, Sudhakar K And Agrawal, Sarvesh C,. "Economics Implications of Jute Cultivation of Case Study of West Bengal,." *India Ground of Agriculture Economics, Vol 47(3).*

১৪) Dutta, Ruddar,. "New Textile Policy Anti SSI,." *New Age Vol.48(53),*, 2000: PP-8.

১৫) Fanon, Frantz. *The Wretched of the Earth.* London: MacGibbon & Kee, 1965.

১৬) Fernandes, Leela,. *Producing Workers The Politics of Gender Class And Culture In Calcutta Jute Mills,.* New Delhi : Vistaar publisher, 1999.

১৭) Ghosh, Parimal. *Colonialism, Class and History of the Calcutta Jute Millhands 1880-1930.* Chennai: Orient Longman Limited, 2000.

১৮) Guha, Dr Srabani. *Agricultural Statistics at a Glance.* 2020. https://www.agricoop.nic.in/.

১৯) *'Chokh'.* Directed by Utpalendu Chakrabarty. Performed by Anil Chatterjee, Shyamanand Jalan, Sreela Majumdar Om Puri. 1982.

২০) Omkar, Goswami. *Collaboration and Conflict: European and Indian Capitalists and the Jute Economy of Bengal, 1919-39, .* IESHER XIX (2), 141, 1982.

২১) Patnaik, K.M,. *Rural Industrialisation, .* Calcutta,: Kitab Mahal, 1988.

২২) Prakash, Gyan. *Can the 'Subaltern' Ride? A Reply to O'Hanlon and Washbrook, Journal of Comparative Studies in Society and History, 34(1).* Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

২৩) Said, Edward W. *Orientalism.* New York: Pantheon Books, 1978.

২৪) Saptharishi, L.V. *Indian Jute Vision For The Future.* New Delhi: Contact Communication, 1996.

২৫) Sen, Samita. *Women and Labour in Late Colonial India The Bengal Jute Industry .* Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

২৬) Sharma, Vijay Paul. *Price Policy for Jute 2021-22 Season.* Annual, New Delhi-110 001: Commission for Agriculture Costs and Prices Department of Agriculture, Cooperation Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Krishi Bhawan,, 2020 October.

২৭) Stiglitz, Joseph.E,. *Globalization and Its Discontents, .* New Delhi: Penguin Book India, 2003.

২৮) Sweezy, Paul. *The Transition from feudalism to Capitalism.* London: Fore Publications Ltd, 1954.

২৯) Thorner, Alice. "Semi-Feudalism or Capitalism? Contemporary Debate on Classes and Modes of Production in india."

Economic and Political Weekly, 17 (Economic and Political Weekly, 17, (50), 1982: 50.

৩০) Vyas, Mamta,. "Higher Cost Of Production of And Its Jute Industry ." *Monthly Commentary On Indian Economic Conditions Vol 47 (7),* , 1999: PP-30-32.

বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ

১) বসু, নির্বাণ। 'স্বাধীনতার প্রাক্কালে টাটানগরের শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৫-৪৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১।

২) বসু, নির্বাণ। 'সুর্যোদয়ের শিল্প ও শ্রমিক আন্দোলন : প্রাক-স্বাধীনতা বাংলার ঔষধি ও রাসায়নিক শিল্পের একটি প্রতিবেদন'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৩। কলকাতা, ১৯৯৯।

৩) বসু, নির্বাণ। 'প্রাক-স্বাধীনতা কলকাতার একটি গণকর্তৃক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন : ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন- একটি সমীক্ষা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৯। কলকাতা, ১৯৯৪।

৪) বসু, নির্বান। 'রানীগঞ্জের শ্রমিক আন্দোলন : একটি বিশিষ্ট অধ্যায় (১৯৩৮-১৯৩৯)'।

৫) বসু, নির্বান। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রাক-স্বাধীনতা বাংলার শ্রমিক আন্দোলন'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৫। কলকাতা, ১৯৯০।

৬) বসু, নির্বাণ। কলকাতার কারখানার বহির্ভূত শ্রমিকের আন্দোলন : একটি বিস্মৃত অধ্যায় (১৯৩৭-৪০)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৪। কলকাতা, ১৯৮৯।

৭) বসু, নির্বাণ। 'বাংলার চটকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট (১৯৩৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৩। কলকাতা, ১৯৮৮।

৮) বসু, নির্বাণ। 'সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্প শ্রমিক আন্দোলন'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১। কলকাতা, ১৯৮৬।

৯) পালিত, মধুচ্ছন্দা। 'উনিশ শতকের স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গনারী'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৩। কলকাতা, ১৯৯৯।

১০) দাশগুপ্ত, রণজিৎ। 'শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১০। কলকাতা, ১৯৯৫।

১১) দাস, কিশোর কুমার। 'আধুনিক ভারতের প্রথম ধর্মঘট – একটি সমীক্ষা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮। কলকাতা, ২০০৪।

১২) দাস, অমল। 'ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাসের বর্তমান সংকট ও সম্ভাবনা'। ইতিহাস অনুসন্ধান – ২৩। কলকাতা, ২০০৯।

১৩) দাস, অমল। 'সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা'। ইতিহাস অনুসন্ধান – ১৫। কলকাতা, ২০০১।

১৪) দাস, অমল। 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ –এর দশক থেকে ১৯৯০ –এর দশক)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৯। কলকাতা, ১৯৯৪।

১৫) দাস, অমল। ' হাওড়ার লাডলো চটকলে শ্রমিক আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (১৯৮১)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৫। কলকাতা, ১৯৯০।

১৬) দাস, আমল। 'বাংলার চটকলের প্রযুক্তিকরন ব্যবস্থা ও শ্রমিকের ওপর তার প্রতিক্রিয়া (১৯২৬-১৯৩০)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৪। কলকাতা, ১৯৮৯।

১৭) দাস, অমল। 'চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারী প্রভাব (১৮৭৫-১৯২০)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১। কলকাতা, ১৯৮৬।

১৮) চন্দ, অমিতাভ।'বঞ্চিত মানুষ, অলীক স্বাধীনতা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : ১৯৪৮-১৯৫০ : অসফল বিপ্লব প্রয়াস'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৭। কলকাতা, ২০০৩।

১৯) চ্যাটার্জি, সুপর্না। 'স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শ্রমিক আইনের আলোকে চা বাগানের মহিলা শ্রমিক (১৯৪৭-১৯৭৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৭। কলকাতা, ২০০৩।

২০) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'সুকুমারী চৌধুরী ও বেঙ্গল ল্যাম্প'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৭। কলকাতা, ২০০৩।

২২) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'চটকলে মেয়ে শ্রমিকরা : ৭০ বছর আগে পরে'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৭। কলকাতা, ২০০৯।

২৩) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৩৪) ও কমিউনিস্ট নেত্রী সুধা রায়'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৩। কলকাতা, ১৯৮৮।

২৪) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম মহিলা সংগঠকরা – কিছু প্রশ্ন'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১। কলকাতা, ১৯৮৬।

২৫) ঘোষ, অমিয়। 'প্রবর্তক জুটমিল লি. : একটি স্বদেশী শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা (১৯৩৫-১৯৪১)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১।

২৬) গুহরায়, সিদ্ধার্থ। 'কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : প্রথমযুগ (১৯২৭-১৯৩৯)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-। কলকাতা, ১৯৮৮।

২৭) রায়, রণজিৎ। ১৯৭৭/৮৩। ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতাঃ নিউ এজ পাব. প্রা. লি.

২৮) বসু, সমরেশ। ১৯৮৮। শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯

২৯) বসু, নির্বাণ। ২০১৩। অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, সেতু যৌথ উদ্যোগ। কলকাতা ৯

৩০) বসু, অজিত নারায়ন। ২০০৩। পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি। নাগরিক মঞ্চ (প্রকাশক) পরিবেশ সাহিত্য সংসদ। কলকাতা

৩১) চক্রবর্তী, অনাদি। ২০০৩-২০০৪। "শাসক শ্রেণীর আক্রমণ ও শ্রমিক আন্দোলন সমস্যা" কুলিশ, ১:৪। কলকাতা

৩২) দাস, শংকর। (সাল অনুল্লেখিত)। পাট শিল্পের অগ্রগতি না মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি? প্রথম পর্ব। ১২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট। কলকাতা-৯

৩৩) রায়, রবি (সম্পা.)। ১৯৯৪। কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন কোন পথে? কলকাতা সার্চ

৩৪) (লেখক অনুল্লেখিত)। ১৯৯৩-১৯৪। চটশিল্প-১৯৯৩ : কিছু রটনা, কিছু ঘটনা। কলকাতা নাগরিক মঞ্চ।

৩৫) (লেখক অনুল্লেখিত)। ১৯৯৫। পাট শিল্প হচ্ছেটা কি? কলকাতা নাগরিক মঞ্চ।

৩৬) (লেখক অনুল্লেখিত)। ১৯৯৪। কানোরিয়াঃ জীবনের জয়গান। ফুলেশ্বরঃ কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন।

৩৭) (লেখক অনুল্লেখিত)। পাটশিল্প ২০০১। সংকট ও সমাধানের উৎস সন্ধানে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট। কলকাতা নাগরিক মঞ্চ।

৩৮) এছাড়া সংগ্রামী দিশা, আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, কালধ্বনি প্রভৃতি পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।